

অনুষ্টুপ ছন্দ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই বৈশাখ, ১৩৬২

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
ফাল্গুন, ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি.এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল্ প্রেস,
২, ন্যায়রত্ন লেন,
কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীচরণেষু—



চিঠিখানা হাতে করে সৌদামিনীর বাবা শিবশঙ্কর চাটুজ্যে স্তব্ধভাবে বসে রইলেন। বালাখানার বারান্দায় তক্তপোশে বসে ছিলেন সৌদামিনীর পিতামহ কালীশঙ্কর। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার চিঠি?

—বেয়াই মশায়ের।

—কি লিখেছেন?

—বেয়ানকে নিয়ে বিকেলে তিনি এখানে আসছেন।

—কি ব্যাপার!

—সদুকে নিয়ে রাত্রের মেলে বোম্বাই যাবেন।

—বোম্বাই! সেখানে কি?

—জামাই আসছেন।

এতক্ষণে পিতামহের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হল। বছর চারেক আগে সৌদামিনীর বিবাহ হয় প্রণবকৃষ্ণের সঙ্গে। তার মাস ছয়েক পরে হঠাৎ প্রণব বিলাত চলে যায় ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে। সেই প্রণব ব্যারিস্টার হয়ে ফিরছে।

প্রণবের বিলাত-যাত্রাকে আকস্মিকই বলা যায়। এরকম একটা সম্ভাবনা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তার পিতা প্রসন্নবাবু কলকাতা হাইকোর্টে খুব নামজাদা উকিল ছিলেন না। যে অর্থ তিনি উপার্জন করতেন তাতে ভদ্রভাবে পরিবার প্রতিপালনটাই সম্ভব ছিল। তার বেশি নয়। বস্তুত প্রণব বিবাহের পূর্বে যথারীতি এম-এ ও আইন ক্লাসেই ভর্তি হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাদের পরিবারে অপ্রত্যাশিত শুভগ্রহের মতো আবির্ভাব হল তার মাতামহ বনার্জি সাহেবের।

বনার্জি সাহেব বিলাত না গিয়েও দুর্দান্ত সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। বহুকাল পূর্বে সামান্য কেরানি হিসাবে তিনি ভারত গবর্নমেন্টের সামরিক হিসাব বিভাগে প্রবেশ করেন। কন্যার [illegible]ও সেই অবস্থাই ছিল। তার অল্পদিন পরেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তখন তাঁর একমাত্র কন্যা তরঙ্গিণী ছাড়া সংসারে আর কোনো বন্ধনই রইল না। এবং কর্মসূত্রে যতই তাঁকে দূর-দূরান্তরে ঘুরতে হল, বন্ধনও ততই শিথিল হতে লাগল। ফলে, আহার-বিহার আচার-আচরণ সর্বদিকেই সাহেব হওয়ার তিনি অবাধ সুযোগ লাভ করলেন। তখন

থেকেই কন্যা-জামাতার সঙ্গে তাঁর সংযোগ কয়েকখানা চিঠিপত্র এবং কখনও-সখনও দু'একখানা মূল্যবান উপহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

এই অবস্থায় তাঁর সম্বন্ধে নানা সম্ভব-অসম্ভব গুজবও প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণীর কানে পৌঁছত। তার অল্পই গৌরবের, বেশির ভাগই লজ্জার। বস্তুত যখন বনার্জি সাহেব বর্মায় পদস্থ সরকারী কর্মচারী, তখন সেখানকার লাটসাহেবের কোনো নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহের খবরও কন্যা-জামাতার গোচরে এসেছিল।

এই সমস্ত গুজবের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তা কোনোদিনই যাচাই হয়নি। তিনি অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পরেও না। কন্যা-জামাতার পক্ষে তার অধিকাংশই যাচাই করার মতো প্রসঙ্গও নয়। সে সুযোগও তিনি দিলেন না। কারণ কলকাতা আসার অল্পদিনের মধ্যেই দৌহিত্রকে বিলাত পাঠিয়ে এবং মোটা অঙ্কের কয়েকখানা কোম্পানির কাগজ কন্যা-জামাতার হাতে সমর্পণ করে অকস্মাৎ একদা তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। যেন এইজন্যেই তাঁর কলকাতায় আসা।

মৃত্যুর পরে গঙ্গাতীরে তাঁর দেহ দাহ করা হবে অথবা ক্রিশ্চানমতে কবরস্থ হবে, সে নিয়ে কোলাহল যে বাধেনি তা নয়। কিন্তু প্রসন্নবাবু সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে হিন্দুমতেই তাঁর সমস্ত শেষ কার্য সম্পন্ন করলেন।

প্রণব তখন বিলাতে।

এই সাহেব মাতামহটির সংবাদ সৌদামিনীর পিতৃকুল যথাসময়ে পান নি। পেলে, যেরকম রক্ষণপন্থী হিন্দু তাঁরা, তাতে এ বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে তাঁরা দিতেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত প্রণবের বিলাতযাত্রাও তাঁরা সমর্থন করেন নি।

তবু এতদিন একরকম চলে আসছিল। এখন জামাতা ফিরে আসার পরে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার সম্ভাবনা কল্পনা করে সৌদামিনীর পিতা এবং পিতামহ উভয়েরই টিকি পর্যন্ত কণ্টকিত হয়ে উঠল।

উভয়েই স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসে রইলেন। নানা চিন্তা এলোমেলো-ভাবে তাঁদের 'মাথায় আসতে লাগল। প্রণব বিলাত যাওয়ার পরেই তাঁদের পল্লীসমাজে একটা ঘোঁট প্রধূমিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা নিতান্তই ধোঁয়া এবং দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। কারণ শাস্ত্রীয় সামাজিক যেটা সমস্যা সেটা প্রণব বিলাত থেকে ফিরে আসার পরেই

উঠতে পারে, আগে নয়। গত চার বৎসর সৌদামিনীর পিতৃকুলের নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটেছে। কিন্তু আর বুঝি কাটে না। এইবার সেই সঙ্কট-মুহূর্ত সমাগত।

কালীশঙ্করবাবু অবশেষে বললেন, গুরুদেবের কাছে পালকি পাঠাও। তিনি আসুন। তার পরে

তারপরেই বা কি হতে পারে ভেবে না পেয়ে তিনি অন্যমনস্কভাবে গড়গড়ার নলের দিকে হাত বাড়ালেন।

এতবড় একটা সামাজিক খড়্গ যখন মাথার উপর ঝুলছে, সৌদামিনী তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্দরের বাগানে পাড়ার ক'টি সমবয়সী বান্ধবীর সঙ্গে লবণ সহযোগে কাঁচা আমের সদ্ব্যবহার করছিল। খবরটা তাদের কাছেও এসে পৌঁছল। কিন্তু সৌদামিনী অথবা তার বান্ধবীদের কাছে বিপদটা খুব ভয়াবহ বলে বোধ হল না। তাদের সকলেরই ভিতরটা আনন্দে যেন তরঙ্গিত হয়ে উঠল। এবং সেই আনন্দের আতিশয্যে হাতের নুন এবং কাঁচা আম মাটিতে ফেলে দিয়ে বাগানের নিরিবিলি একটা কোণে গিয়ে তারা ঘনিষ্ঠভাবে বসল।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, তোর কি ভয় করছে সদু?

—করছে।

—আনন্দ হচ্ছে না?

—কি জানি!

—তুই যাবি না তোর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে?

কি ব্যবস্থা হবে তার কিছুই না জেনেও সৌদামিনী সহজ কণ্ঠেই বললে, যাব বইকি।

—দেখা হলে কি বলবি?

—কি জানি!

—কিন্তু সে তো সাহেব হয়ে ফিরছে। বাংলা ভুলেই গেছে নিশ্চয়। তুই তো ইংরিজী জানিস না, কি করে কথা বলবি তার সঙ্গে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সৌদামিনী ওদের দিকে চাইতে লাগল। এ আশঙ্কা তার মনে এতকালের মধ্যে একদিনও জাগেনি। সাহেবের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমটা কী হতে পারে ভেবে না পেয়ে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিব্রত হয়ে পড়ল। তবু বললে, বলব দেখিস।

অর্থাৎ তার কিশোরী মনে এই আশাটা কি করে যেন জাগল যে দুটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি অনুকূল হলে ভাষার অভাব বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

এবং তখনই বললে, বাংলা ভুলবে কেন, আমাকে তো বাংলাতেই চিঠি লেখে।

তাও তো বটে! কিন্তু বাংলা এখনও ভোলেনি শুনে বান্ধবীরা যেন একটু ক্ষুণ্ণই হল। বাংলা ভুলে পুরোদস্তুর সাহেবই যদি না হতে পারল তাহলে কেনই বা জাত খুইয়ে বিলাত যাওয়া!

বললে তাহলে সায়েব হয়নি। তোর বেশ মনে পড়ে?

সৌদামিনী ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, পড়ে বইকি!

কিন্তু চোখ দেখে মনে হল স্মৃতি খুব স্পষ্ট নয়।

হবার কথাও নয়। তখন তার বয়স মাত্র বারো। বিয়ের পরে আর দুবার মাত্র উভয়ের দেখা হয়েছে। তাও অল্পদিনের জন্যে। কিন্তু যত বয়স বেড়েছে, স্বামীর কথা যতই ভেবেছে, ততই স্বামীর ছবি এক রকম ক'রে তার মনের চোখে ভেসে উঠেছে। বাঁদিকের গালে একটা কাটা দাগ ছাড়া তার আর সবই হয়তো কল্পনা। কিন্তু কল্পনাও তো মিথ্যে নয়। সুতরাং স্বামীকে তার মনে পড়ে বইকি! কেন পড়বে না?

এমন সময় অন্দরে তার ডাক পড়ল। গুরুদেব এসেছেন।

এই গুরুদেবের সঙ্গে সৌদামিনীর নাতিনী সম্বাদ। সৌদামিনী গিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিলেন। পাকা দাড়ি নেড়ে বেসুরো গলায় গান ধরলেন:

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল
দেখা না হইত পরাণ গেলে।

সৌদামিনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালাল।

গুরুদেব ডাকতে লাগলেন সদু, শোন্ শোন্। কথা আছে।

দরজার আড়াল থেকে সদু বললে, কি বলুন।

—আমার খাবার আজ তুই তৈরি করবি। কেমন?

—আচ্ছা।

সৌদামিনী গুরুদেবের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচল।

গুরুদেব কালীশঙ্করের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে বললেন, এর মধ্যে চিন্তার কিছু নেই, ভাই। ও-ই ওর স্বামী। ম্লেচ্ছ হোক আর যাই

হোক, ওই ওর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ওর মুখের হাসি দেখে টের পাচ্ছ না, ওর মন কি চাইছে!

—কিন্তু সমাজ?

—সমাজ থেকে বাধা তো আসবেই।

—তা হলে? আমাদের অবস্থা কি হবে?

—কোনো পরিবর্তনই হবে না। তুমি তো সদ্বংশেই কন্যা সম্প্রদান করেছ। পাত্র তার পরে যদি সমুদ্রযাত্রা করে, কি ম্লেচ্ছ হয় সে অপরাধ তোমার নয়।

—কিন্তু আমার নাতনী, আমার নাত-জামাই—তাদের পরিত্যাগ করতে হবে তো?

গুরুদেব মুহূর্তকাল কি যেন চিন্তা করলেন। তারপরে বললেন, সে চিন্তা আজ করে লাভ নেই। শাস্ত্রে এর প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে। কিন্তু সে পরের কথা পরে হওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত সদুকে ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

আবার বললেন, তোমার-আমার যে সমাজ, এ সমাজ আর বেশিদিন এই জায়গায় থাকবেও না। এরও পরিবর্তন আসন্ন। আমরা হয়তো কোনোদিনই সদুর হাতে অন্নগ্রহণ করতে পারব না। আজ তাই শেষবারের মতো ওর হাতের রান্না খেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বাবাজিদের এ ঝামেলা পোয়াতে হবে না দেখে নিয়ো।

বলে বৃদ্ধ আবার তাঁর পাকা দাড়ি নেড়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সুতরাং সৌদামিনী শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বম্বে চলল।

এত লম্বা ভ্রমণ এর আগে কখনও সে করেনি। শস্য-শ্যামলা বাঙলার মেয়ে সে। দেখে এসেছে সবুজ ধানের ক্ষেত, খড়ে-ছাওয়া স্নিগ্ধ গৃহ, জল-থৈ-থৈ পুষ্করিণী। দেখেনি কঠিন রুক্ষ মাটি, আকাশের কোলে মিশে-যাওয়া ধোঁয়াটে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী, ধু-ধু-করা শূন্য মাঠ। দেখতে দেখতে কখন এক সময় তারই মধ্যে ডুবে গেল তার মন। ডুবে গেল প্রণব, ডুবে গেল হর্ষ-ভয়-অধীরতা।

বিহার ..যুক্তপ্রদেশ...রাজপুতানা...মহারাষ্ট্র...। শান্ত প্রভাত... ইস্পাতের মতো শানানো প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন...উদাস গোধূলি...রহস্যভরা, অন্ধকার রাত্রি...।

হঠাৎ এক সময় চুপি চুপি তরঙ্গিণী বললেন, বৌমা, প্রণবকে দেখে এত বড় ঘোমটা না-ই টানলে। বিলেত থেকে ফিরছে, অত লজ্জা হয়তো সে পছন্দ করবে না।

সে কি কথা! শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে...সৌদামিনী ঘেমে উঠল।

তরঙ্গিণীর মনে হঠাৎ এ প্রশ্ন ওঠেনি। অনেক বিলাত-ফেরত পরিবারের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। অন্দরের চাল-চলন সর্বত্রই যে একরকম, তা নয়। কোথাও পরদা একেবারে উঠে গেছে। আহার-বিহারে এসেছে পুরোদস্তুর বিলাতী চাল-চলন : ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-ডিনার, আয়া-বাবুর্চি-বেয়ারা। কোথাও বা বিলাতী হাওয়া বাইরের ড্রইং-রুমেই থমকে রয়েছে, অন্দরের ধারে ধারে একটুখানি তরঙ্গ তুলেছে হয়তো, তার বেশি নয়। নানারকমই দেখেছেন।

কিন্তু প্রণব কেমন হয়ে আসছে কে জানে!

তাকে নিয়ে তরঙ্গিণীর মনেও ভয় যে নেই তা নয়। বরং সে ভয় সৌদামিনীর মতো অস্পষ্ট নয়। অনেক স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। সুতরাং তাঁর চিন্তাও সৌদামিনীর মতো এলোমেলো নয়, অনেক স্পষ্ট।

কিন্তু সৌদামিনীর মনের এই অবস্থা তিনি উপলব্ধি করলেন। তার ভয় এবং সংকোচও। তাই তখন-তখনই আর কিছু বললেন না। কিন্তু বম্বেতে হোটেলে পৌঁছে নিরিবিলি প্রসঙ্গটা আবার তুললেন। এবারে আর শুধু মুখে নয়, সৌদামিনীর ঘোমটাটা নিজের হাতে ভ্রূর উপর পর্যন্ত টেনে দেখিয়ে দিলেন, ঘোমটা কতটা পর্যন্ত নামবে। এবং তাকে দিয়ে কয়েকবার মক্‌শোও করিয়ে নিলেন।

দেখলেন, স্বচ্ছন্দ সৌদামিনী এর ফলে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কষ্ট হল। নিজের মন যে এতে খুব সায় দিলে তাও নয়। কিন্তু উপায় কি! প্রণব কেমন হয়ে ফিরছে কেউ জানে না অবশ্য। কিন্তু যেমন হয়েই ফিরুক, একগলা-ঘোমটা-দেওয়া জবরজং একটা বৌকে বম্বে ডকে দেখা যে কিছুতেই পছন্দ করবে না, এ বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত।

সকালে প্রসন্নবাবু নিয়ে এলেন তরঙ্গিণী এবং সৌদামিনী উভয়ের জন্যেই একজোড়া ক'রে চটিজুতা।

এবারে তরঙ্গিণী নিজেও কম বিপদে পড়লেন না। কিন্তু বধূ কেমন করে পুত্রের সঙ্গে মানিয়ে চলবে এই দুশ্চিন্তা তাঁকে এমনই

পীড়িত করে তুলেছিল যে, কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সৌদামিনীর আগে নিজেই চটি পায়ে দিয়ে ঘরের ভিতর একবার হাসতে হাসতে ঘুরে বেড়ালেন।

সৌদামিনীর দিকে লজ্জিত হাস্যে বললেন, জুতো পায়ে দিলেই আর কিছু মেলেচ্ছ হয়ে যায় না, না মা? যেখানকার যা। কলকাতায় ফিরে কি আর জুতো পায়ে দোব, কি বল?

সৌদামিনীও হেসে সায় দিলে। তরঙ্গিণী তার অবস্থা অনেক সহজ করে দিয়েছেন। সত্যিই তো, যেখানকার এবং যখনকার যা। সাহেব-স্বামীর হাতে শিবঠাকুর নিজেই যখন তাকে দিয়েছেন, তখন একটু-আধটু বেচাল নিশ্চয়ই তাঁকেও সহ্য করতে হবে। কাজটি তো শিবঠাকুরেরই। সে তো আর নিজে ইচ্ছা করে সাহেব বিয়ে করেনি।

বস্তুত জাহাজঘাটে প্রণব যখন হঠাৎ আধুনিকা মা ও বৌকে দেখলে, তখন সে নিজেও কম আশ্চর্য হল না।

সবচেয়ে হাসির কথা, সৌদামিনী প্রণবকে প্রথমে চিনতেই পারেনি। যখন জাহাজ থেকে সিঁড়ি দিয়ে যাত্রীরা নামছে, প্রণবকে দেখেই প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন ওই তো প্রণব! ওই তো খোকা! সৌদামিনীর চোখ তখন দিশাহারার মতো ছটফট করে খোঁজ করছে, কোন্‌টি প্রণব। তার স্মৃতিতে সম্বলের মধ্যে গালের কাটা দাগ। সেইটেই সে প্রত্যেকের মুখে খুঁজছে। কিন্তু এতদূর থেকে সে কি দেখা যায়!

তার মাথার ঘোমটা ভ্রূর কাছ থেকে কখন সীমন্তের কাছে এসে ঠেকেছে। তবু প্রণবকে সে দেখতে আর পাচ্ছে না।

আগ্রহের আতিশয্যে কিশোরী মেয়ের লজ্জা-সরম যেন এক মুহূর্তের জন্যে কোথায় উবে গেল। অধৈর্যের সঙ্গে তার মুখ থেকে কেবল, কই মা! কোন্‌টি মা!

আগ্রহের আতিশয্য তরঙ্গিণীরও কম নয়। সৌদামিনীর কথার অশোভনতা তাঁর চোখেই পড়ল না। বাঁ হাত দিয়ে সৌদামিনীকে পিছন থেকে টেনে সামনে এনে সেই হাতে তার চিবুক তুলে এবং ডান হাতে প্রণবকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওই যে গো, ওই দাড়িওলা কালো মোটা লোকটির পিছনে! আমাদের দেখতে পেয়েছে! দেখো না হাত নাড়ছে কেমন করে!

তরঙ্গিণী স্বামীকে একটা ঠেলা দিলেন।

ফেরবার সময় প্রসন্নবাবু ও তরঙ্গিণীর জন্যে একটা 'ক্যুপে' এবং প্রণব ও সৌদামিনীর জন্যে আর একটা 'ক্যুপে'র ব্যবস্থা হল। তরঙ্গিণীই এই ব্যবস্থার মূলে। এতক্ষণে দু'জনে পরস্পরকে স্পষ্ট করে দেখবার এবং ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাবার সুযোগ লাভ করল।

বম্বে থেকে ট্রেন যখন ছাড়ল, সৌদামিনী যখন চেয়ে দেখলে কামরার মধ্যে আর কেউ নেই, শুধু প্রণব আর সে,—তখন তার বুকের ভিতরটায় কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। একবার মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তা চুলের সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা। অগত্যা বাধ্য হয়ে সামনের বেঞ্চের এক কোণে জড়সড় হয়ে সে বসে রইল।

প্রণব আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে কিছুক্ষণ এই অবস্থা দেখতে লাগল। প্রথমে তার মনে জাগল কৌতুক, তার পরে করুণা। ধীরে ধীরে এসে যখন সে সৌদামিনীর পাশে বসল, ও তখন ঘেমে উঠল। ওর সমস্ত শরীর, বিশেষ করে উন্মুক্ত বাহুযুগলের নিম্নাংশ তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। মাথা একেবারে বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

প্রণব তার অবস্থা বুঝলে কিনা কে জানে। হয়তো বুঝলে, নয়তো বুঝলে না। শুধু তার কম্পিত করতল নিজের করতলে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে, কেমন ছিলে?

সৌদামিনী বলতে চাইল, ভালো। কিন্তু কথা বার হল না, শুধু ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল একবার।

প্রণব বললে, এবারে ফেরবার সময় জাহাজে বড় কষ্ট পেয়েছি। 'সী-সিক্‌নেসে' তিন দিন উঠতে পারিনি।

'সী-সিক্‌নেস' বস্তুটা যে কি সৌদামিনী জানে না। প্রণবও ওর বাংলা প্রতিশব্দ জানেনা বোধ হয়। তবু ওটা যে কোনো-একটা অসুখ এইটে বুঝেই চমকে উঠে সৌদামিনী সমস্ত সংকোচ ভুলে প্রণবের মুখের দিকে বেদনার্ত চোখ মেলে চাইলে।

বললে, এখন সেরে গেছে তো?

দুষ্টুমি করে প্রণব বললে, একটু আছে এখনও। ওইখানে।

ব'লে সৌদামিনীর করতল বুকের উপর রাখলে ঃ বুঝতে পাচ্ছ?

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই সেখানে বোঝবার ছিল না; সৌদামিনী ভাবলে, ওইটেই ব্যাধি।

বললে, কলকাতা গিয়েই ডাক্তার দেখাবে।

—এ সব অসুখ সারানো ও-সব ডাক্তারের কাজ নয়, অন্য ডাক্তার দরকার।

বুকের সেইখানে হাত বুলোতে বুলোতে সৌদামিনী বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে বললে, অসুখ পুষে রাখতে নেই। অন্য ডাক্তারই দেখিয়ো। দেরি কোরো না।

—না। দেরি আর করব না।

ব'লে প্রচণ্ড বলে সৌদামিনীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, রোগ পুষে রাখা ঠিক নয়। চিকিৎসা এখন থেকেই আরম্ভ হোক। মুখ তোলো।

মুহূর্তে মধ্যে সৌদামিনীর সমস্ত দেহে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। গ্রন্থিগুলি শিথিল এবং তনুলতা অবশ হয়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবী যেন চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সময়ের কোনো বোধ রইল না।

কতক্ষণ সৌদামিনী এইভাবে বক্ষোলগ্ন হয়ে ছিল কে জানে। চৈতন্য ফিরতে অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে শুধু বললে, ছাড়।

তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে প্রণবকে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। লজ্জিত ক্ষীণ হাস্যে বললে, অনেক দেরি হয়ে গেল।

প্রণব ওকে নীচে থেকে তুলে পাশে বসিয়ে সহাস্যে উত্তর দিলে, তাতে কি হয়েছে! Better late than never.

সৌদামিনী ওর পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে বললে, ইংরিজী বোলো না। আমি বুঝতে পারি না। কেমন ভয় করে।

প্রণব হেসে বললে, আচ্ছা, আর বলব না। কিন্তু তুমি ইংরিজী শিখবে, সদু?

স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনে সৌদামিনী বিস্মিত হল। বললে, তুমি আমার নাম করছ?

সকৌতুকে প্রণব বললে, কেন তাতে দোষ আছে নাকি?

—না, দোষ ঠিক নেই। কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেলে কোন দিন গুরুজনদের সামনে নাম করে নিজেও লজ্জা পাবে, আমাকেও লজ্জায় ফেলবে।

—তাতেই বা দোষ কি! ইচ্ছে করলে তুমিও আমার নাম ধরে ডাকতে পার।

প্রণব হাসতে লাগল।

এবারে সৌদামিনী যেন একটু বিরক্তই হল। বর্ষীয়সী মহিলার মতো গম্ভীর তিরস্কার করে বললে, ছি ছি! তোমার যা মুখে আসছে তাই বলছ! দেখি, পা'টা।

বলে হেঁট হয়ে আবার তার পায়ের ধুলো নিলে।

প্রণবের অত্যন্ত কৌতুক বোধ হচ্ছিল। বাঙালী বধূ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার ছিল না। যাদের দেখেছে তারা মা, বোন. মাসি, পিসি। সৌদামিনীকে সে যখন দেখেছে, তখন তার বয়স মোটে বারো। তাও সে কি দেখা! একবার, কি দু'বার—তাও বলতে গেলে ঘুমন্ত মেয়েকে। রমণী সে প্রথম দেখলে আসলে বিলেত গিয়ে। এবং তাদের সঙ্গে তুলনায় তার কৌতুকই বোধ হবার কথা।

বললে. কিন্তু ডাকতে তো হবে। কি বলে ডাকব তখন?

এবারে সৌদামিনীর চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। বললে, কি বলে ডাকে জান না?

প্রণবের মনে পড়ে গেল কি বলে ডাকে। কিন্তু বললে, না।

সৌদামিনী দু'বার চেষ্টা করলে। পারলে না।

প্রণব বললে, বল।

—ওগো বলে।

বলেই সৌদামিনী প্রণবের মুখের দিকে আর চাইতে পারলে না। তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল।

পরদিন ভোরে প্রথম যেখানে ট্রেন থামল, প্রসন্নবাবু সেইখানে তরঙ্গিণীকে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।

মাকে দেখে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নিজের বেঞ্চে বসল। সৌদামিনী নিঃশব্দে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। তরঙ্গিণী ছেলের কাছে বসে গল্প জুড়লেন। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর সৌদামিনীর দিকে। সেখানে তিনি কি দেখলেন তিনিই জানেন। কিন্তু পরের স্টেশনে যখন তিনি নেমে গেলেন, তাঁর দুটি ঠোঁটের কোণেই হাসি এবং কৌতুক জমেছে প্রচুর।

হাওড়া স্টেশনে নেমে প্রণব দেখলে বাড়ি থেকে দুটো চাকর এসেছে। দুজনই অপরিচিত। এরা উর্দিপরা। নন্দদেহ রামলগিন নয়। মালপত্র নিয়ে তারা পিছনে আসবে। ওরা দুখানা ফিটনে আগেই বেরিয়ে পড়ল।

সেই পুরনো কলকাতা। যদিও মাঝে মাঝে পরিবর্তন চোখে পড়ে। হয়তো একটা নতুন রাস্তা, নয়তো কোনো সুদৃশ্য বাড়ি। কিন্তু ওদের গাড়ি এসে থামল সেই পুরনো ছিদাম মুদির লেনে নয়,—একেবারে বালিগঞ্জে, ব্রাইট স্ট্রীটে।

—এ-বাড়িতে কবে এলে? —মায়ের দিকে চেয়ে প্রণব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

—মাস দুই হল।—উত্তর দিলেন তরঙ্গিণী,—সবাই ওঁকে বললে, ওখানে থেকে তোমার প্র্যাকটিসের অসুবিধা হবে, তাই।

—ভালো করেছ। দাদামশাই অনেক টাকা রেখে গেছেন, না?

—দু'লাখের ওপর। তাছাড়া ওঁরও প্র্যাকটিস বেড়েছে। এটা মাস ছয়েক হল কেনা হয়েছে। তার পরে মেরামত করতে আরও মাস চারেক গেছে।

বাড়িটা প্রণবের খুব পছন্দ হয়েছে। নির্জন ছায়ায়-ঢাকা রাস্তার উপর অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছোট একখানা বাড়ি। ভারি সুন্দর!

তার নীচের অফিস-ঘরখানি সুসজ্জিত। এ ছাড়াও শোফা দিয়ে সাজানো একখানা বসবার ঘরও আছে। আর আছে একখানা ঘেরা-বারান্দা। বেশ চমৎকার হয়েছে। লোক তো ওরা বেশি নয়। বাবা, মা আর ওরা দু'জন।

এক সময় আড়ালে পেয়ে সৌদামিনী বললে, ব্যবস্থা দেখেছ তো? নীচের অফিস-ঘরটা তোমার, আর ওপরের শোবার ঘরটা আমার। তুমি সাহেব হয়েছ বলে আমি তো আর মেমসাহেব হইনি। যখন-তখন হুট করে ওপরে আসবে না।

—না। শুধু যখন তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হবে, তখন নীচের থেকে আমি চিৎকার করে ডাকব ঃ ওগো!

—হ্যাঁ। আমি তখন ওপর থেকে চিৎকার করে সাড়া দোব ঃ কি গো, কি গো, কী গো!

—নীচে থেকে বাবা ছুটে বেরিয়ে আসবেন,

—ওপর থেকে মা ছুটে বেরিয়ে আসবেন,

—নাইস!

—আবার ইংরিজী বলছ! বলিনি, আমার ভয় করে? —তর্জনী উঁচিয়ে সৌদামিনী শাসন করলে।

—আর বলব না—প্রণব তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করলে।

মা এক সময়ে ডেকে বললেন, হ্যাঁরে খোকা, উনি বলছিলেন তোর বিলিতী রান্না খাওয়া অভ্যেস হয়েছে, ঠাকুরের রান্না কি ভালো লাগবে?

প্রণব তৎক্ষণাৎ বললে, কেন লাগবে না, মা? বিলিতী রান্না তো চার বছরের অভ্যেস। তার আগের কুড়ি বছর তো তোমার হাতের মাছের ঝাল আর শুক্তো খেয়েই কেটেছে।

তরঙ্গিণী খুশি হলেন, ছেলে তেমন সাহেব হয়নি।

তবু বললেন, দেখিস, লজ্জা করিস না যেন!

সন্ধ্যাবেলায় প্রসন্নবাবু ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমার হাইকোর্ট তো এখন ছুটি, খুলতে দেরি আছে। এবারে গরমও পড়েছে অসম্ভব। ক'দিন দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসবে?

প্রণব হেসে বললে, না বাবা। শীতের দেশে থেকে-থেকে শীতে আর রুচি নেই। এ গরমটা বরং ভালোই লাগছে। তার চেয়ে বরং

—বরং?

—যদি যেতেই কোথাও হয় তাহলে বর্ধমান থেকে ঘুরে এলে হয় না?

—সেখানে কি?

—ওঁদের ওখানে আর কি! বিলেত থেকে ফিরে এলাম। একবার দেখা করতে যাওয়া বোধ হয় উচিত।

প্রসন্নবাবু বুঝলেন। বললেন, আরও কিছুদিন থাক, প্রণব। ওখানে যাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে।

—অসুবিধা! —প্রণব বিস্মিতভাবে চাইলে।

একটু ইতস্তত করে প্রসন্নবাবু বললেন, অসুবিধা মানে অন্য কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার জানোই তো। তোমার বিলেত যাওয়া নিয়ে এর মধ্যেই ওঁরা কিছু সামাজিক অসুবিধায় পড়েছেন। এর ওপর এখনই তোমরা গেলে ওঁরা বিব্রত বোধ করবেন। তার চেয়ে দার্জিলিং যাওয়া ভালো।'

এরকম একটা সম্ভাবনা যে প্রণবের অজ্ঞাত তা নয়। কিন্তু এই কলকাতা শহরে আত্মীয়-সমাজ যেরকম সমাদরে তাকে গ্রহণ করেছে, তাতে সেকথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

প্রসন্নবাবুর কথা শুনে সে চুপ করে রইল।

প্রসন্নবাবু বলতে লাগলেন, দার্জিলিং গেলে বৌমাকে সুদ্ধ নিয়েই যাবে। আমার একটি মক্কেলের বাড়ি আছে সেখানে। তাদের বলে রেখেছি, যাও যদি সে বাড়িটা পাওয়া যাবে।

তা হলে মন্দ হয় না। প্রণব খানিকটা উৎসাহিতই বোধ করলে।

—বললে, তাই যাওয়া যাবে বরং। আপনি এবং মা-ও যাচ্ছেন তো?

—না। সামনের সোমবারে স্বামীজি আসছেন। পূর্ণিমার দিন আমরা দীক্ষা নোব।

স্বামীজির প্রসঙ্গে প্রণবকে উৎসাহিত বোধ হল। জিজ্ঞাসা করলে, এই স্বামীজি কে, বাবা?

—একটি বৃদ্ধ বাঙালী সন্ন্যাসী। কনখলে এঁর আশ্রম। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। বড় ভালো লেগেছে ওঁকে আমাদের।

—তা হলে এ সময় আমরা বাইরে যাব?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, তাতে কি হয়েছে! সাধু-সন্ন্যাসী তোমাদের ভালো লাগবার কথা নয়।

প্রণবও হাসলে। বললে, ভালো লোককে সবাই ভালোবাসে।

ব'লে ভিতরে চলে গেল। বোধ করি দার্জিলিং যাওয়া সম্বন্ধে সৌদামিনীর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে।

সৌদামিনী তখন তরঙ্গিণীর শোবার ঘরে। তরঙ্গিণী খাটে শুয়ে, আর সৌদামিনী তাঁর পা-তলায় বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বাইরে থেকে প্রণব উঁকি দিলে। সৌদামিনী সামনেই বসে। প্রণবকে তার দেখা উচিত ছিল। কিন্তু দু'তিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেও সে যে প্রণবকে দেখেছে এমন মনে হল না।

বাধ্য হয়ে প্রণব তার শোবার ঘরে গিয়ে একটা ঈজি-চেয়ারে বসে একখানা ইংরিজী উপন্যাস খুলে পড়তে আরম্ভ করলে।

তরঙ্গিণী তখন গল্প করছিলেন তাঁর গুরুদেবের :

কী সুন্দর সৌম্য কান্তি! অঙ্গ থেকে লাবণ্য যেন চুঁয়ে পড়ছে! ঢলঢল চোখ, ক্ষণে ক্ষণে চোখ বুঁজে আসে। মুণ্ডিত মস্তক, মুণ্ডিত মুখমণ্ডল, পাতলা ঠোঁটে একটু আলগা হাসি যেন লেগেই রয়েছে। কত যে বয়স, কেউ জানে না। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় কিশোর বালক!

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে, খুব ফরসা বুঝি?

—ফরসা! তুমি কত ফরসা কল্পনা করতে পার, বৌমা! না, সেই রকমের ফরসা নয়। তাঁকে তুমি ঠিক ফরসা বলতে পার কিনা, তাও জানি না। কী রকম জানো ঃ সমস্ত শরীর থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে,—যেন মাজা দেহ, মাছি বসলে পিছলে পড়বে।

রংটা কল্পনা করতে ছোট মেয়ে সৌদামিনীর কষ্ট হচ্ছিল। সত্য কথা বলতে কি, ওইরকম রং সে দেখেনি,—ওর কাছাকাছি কোনো রকমের রঙও নয়। তবু তরঙ্গিণীর কথা শুনেই তার মন একটা অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে।

প্রণবের মাথায় তখন দার্জিলিংএর স্বপ্ন। ইংরিজী উপন্যাস তার চোখে ঝাপসা হয়ে আসছে।

আবার একবার এসে সে উঁকি দিলে।

এবারও সৌদামিনী তাকে চেয়ে দেখলে কিনা বোঝা গেল না। হতে পারে, শাশুড়ীর কাছে বসে সে লজ্জায় বাইরের দিকে চাইতেই পারেনি। কিন্তু তার চোখের তারায় প্রণবের অস্পষ্ট একটা ছায়াও কি পড়েনি?

তাহলে কি করে পড়ল আড়ালে থেকেও তরঙ্গিণীর মনের চোখের তারায় সেই অস্পষ্ট ছায়া? হয়তো অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট।

তিনি গুরুদেবের প্রসঙ্গ বন্ধ করে হঠাৎ বললেন, প্রণব বোধ হয় ওপরে এল, বৌমা। দেখো, তার কি দরকার।

সৌদামিনী লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

এই লজ্জা তরঙ্গিণীর ভালো লাগল। কিন্তু তাঁর কেমন মনে হয়, বিলেতে সাহেব-মেমের অবারিত জীবনযাত্রা দেখে যারা অভ্যস্ত হয়েছে, খুব বেশি লজ্জা তারা পছন্দ করে না। প্রণবের সম্বন্ধে তাঁর সেই ভয়।

সুতরাং আবার বললেন, যাও মা। বোধ হয় কোনো দরকারেই এসেছে। ক'বারই তার পায়ের শব্দ পেলাম যেন।

সৌদামিনী তথাপি নীরব। কিন্তু তরঙ্গিণী ছাড়লেন না। জোর করেই তাকে উঠিয়ে দিলেন এবং হুকের উপর থেকে মালাটা নিয়ে খাটে ঠেস দিয়ে জপ করতে বসলেন।

দীক্ষার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গুরুদেবকে দেখে পর্যন্ত তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এর ভালো মন্দ লাভ-ক্ষতি কিছুই যেন আর তাঁকে আকর্ষণ করছে না। দীক্ষার আর ক'দিনই বা বাকি! কিন্তু এই ক'টা দিনের বিলম্বই যেন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে!

লজ্জিত সৌদামিনী শোবার ঘরে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছিলে?

প্রণব আবার তার ঈজি-চেয়ারে ফিরে এসে নিরুপায়ভাবে ইংরিজী উপন্যাসে মন দিয়েছিল। সৌদামিনীর কণ্ঠের উত্তাপ সে খেয়ালই করলে না। খুশি হয়ে বললে, অনেক কথা আছে সদু। কাছে...

ওর কথার মাঝখানেই সৌদামিনী ধমক দিয়ে বললে, ফের নাম ধরে ডাকে! তুমি ভারি বেহায়া!

হেসে প্রণব বললে, আচ্ছা আর গুরুজনদের নাম ধরে ডাকব না। আর্যে। কাছে আসুন, বলি।

ওর কথার ভঙ্গিতে সৌদামিনীর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুচ্চমকের মতো মুহূর্তে একটুখানি হাসি খেলে গেল। কিন্তু তখনই শক্ত হয়ে আগের মতো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, না, ওইখান থেকেই বল।

—তা হলে থাক। রাত দুটোয় যখন গোটা কলকাতা শহর ঘুমিয়ে পড়বে, আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না, তখন বলা যাবে বরং।

তার কণ্ঠেও যেন ঈষৎ উত্তাপের আভাস।

কিন্তু সৌদামিনী গ্রাহ্য করলে না।

—সে ভালো।

ব'লেই আর দাঁড়াল না।

কিন্তু শাশুড়ীর কাছে যাবার উপায় নেই। এখনই ফিরে আসার জন্যে তিরস্কার যদি তিনি নাও করেন কৈফিয়ত দিতে হবে একশোটা। তার চেয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আসা যাক কি রাঁধছে ঠাকুরটা। কিন্তু লঙ্কা-ফোড়নের ঝাঁঝে সেখানেও সে তিষ্ঠুতে পারলে না। তখন একবার তার মনে হল, প্রণবের কথাটা শুনে এলেই ভালো হত। কিন্তু একবার তেজ দেখিয়ে চলে আসার পরে আর তা হয় না।

সৌদামিনী নীচে গেল। প্রসন্নবাবুর অফিস-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে আর কেউ নেই ঘরে। চেয়ারে বসে গুড়গুড়ির নলটি আলতোভাবে মুখে দিয়ে তিনি ঘুমুচ্ছেন, কি কিছু ভাবছেন, পিছন থেকে বোঝা গেল না।

সৌদামিনী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ও'র চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল।

শাশুড়ীর চেয়ে শ্বশুরের কাছেই সৌদামিনী প্রশ্রয় বেশি পায়। সত্য কথা বলতে গেলে, শাশুড়ী যদিও তাকে তিরস্কার বড় একটা করেন না, তবু তাঁকে, কি জানি কেন, সে মনে মনে বিলক্ষণ ভয় পায়। কোনো একটা অন্যায় করে ফেললে তরঙ্গিণী তিরস্কার না করে যদি হাসেনও সৌদামিনীর

বুকটা তবু দুরুদুরু করে ওঠে। এ শঙ্কা প্রসন্নবাবুর ক্ষেত্রে জাগার প্রশ্নই ওঠে না।

সৌদামিনী লক্ষ্য করলে, প্রসন্নবাবু গুড়গুড়িতে টান দিচ্ছেন, কিন্তু ধোঁয়া বার হচ্ছে না। কলকের দিকে চেয়ে মনে হল, আগুনটা নিভে গেছে সম্ভবত।

প্রসন্নবাবু ভেবেই যাচ্ছেন কি হয়তো ঘুমিয়েই গেছেন। ওর আসা টেরই পাননি।

সৌদামিনী নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। বারান্দায় যে চাকরটাকে পেলে তাকে কলকেটা বদলে দিতে বললে। তারপর আবার ফিরে এসে প্রসন্নবাবুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবাবু হেসে চোখ মেললেন। ডান হাত দিয়ে সৌদামিনীকে সামনে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতক্ষণ এসেছ মা?

—একটু আগে। এস দেখি, আপনার কলকের আগুন নিবে গেছে। কলকেটা কাউকে বদলে দিতে বলেন নি কেন, বাবা?

—কারণ—প্রসন্নবাবু সহাস্যে বললেন—আমি জানতাম, তুমি এখনই আসবে। এসেই সব ব্যবস্থা করবে।

সৌদামিনী মাথা দুলিয়ে হেসে বললে, আমি যদি এখন না আসতাম বাবা?

প্রসন্নবাবুও হাসলেন। বললেন, তা কি হয় মা! তা হলে ছেলেরা বাঁচে কখনও?

সৌদামিনী আর কিছু বললে না। আবার সে পিছনে এসে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে আসছিল। প্রসন্নবাবু আটকে রাখলেন।

বললেন, খানিক আগে প্রণব এসেছিল। তাকে বললাম, বড্ড গরম পড়ে গেছে. হাইকোর্টও বন্ধ। এই সময় ক'দিনের জন্যে তোমাকে নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে আসুক বরং।

এই বাড়িতে সকলের মধ্যে প্রণবকে তার ভয় করে না। কিন্তু সকলের থেকে দূরে, গুরুজনের চোখের আড়ালে, বিদেশে প্রণবের সঙ্গে একা কাটাতে তার ভয় করে।

বললে, তা কি করে হয়, বাবা! ক'দিন পরে আপনাদের দীক্ষা। আমরা থাকব না?

—তোমরা থেকে আর কি করবে, মা?

—বাঃ! বেশ! দীক্ষা নেওয়া দেখব না আমরা?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, দেখার তো কিছু নেই, মা। সমারোহ ব্যাপার তো কিছু নয়। তার জন্যে তোমাদের থাকার কোনো দরকার হবে না।

—তা যেন হল না। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখব না?

—দেখবে বই কি মা, কতবার দেখবে! তিনি তো চলে যাচ্ছেন না। কিছুদিন থাকবেন এখানে।

সৌদামিনী বুঝলে, এই খবরটা দেবার জন্যেই প্রণব উসখুস করছিল। কিন্তু তার ভালো লাগছিল না।

বললে, সে বিশ্রী লাগবে, বাবা। আমার এ সময়ে কোথাও যেতে মোটে ইচ্ছা করছে না।

ওর অনিচ্ছা দেখে প্রসন্নবাবু হেসে ফেললেন। কারণটা তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বললেন, তাহলে থাক। কিন্তু গেলে ভালো করতে, মা। ক'বছর ঠাণ্ডা দেশে ছেলেটা থেকে এল, এই গরমটায় ওর শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে।

সৌদামিনীর মনে এসেছিল বলে, আমরা গরম দেশেরই লোক। দু'দিন বিলেত ঘুরে এলে যদি এত ঝামেলা পোহাতে হয়, তা হলে বিলেত না যাওয়াই ভালো। কিন্তু গুরুজনের সামনে স্বামীর প্রসঙ্গে কথা বলা বেহায়াপনা। এ সব প্রসঙ্গে সৌদামিনী চুপ করেই থাকে। এখনও চুপ করেই রইল।

তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললে, আমার যে কী ইচ্ছে করছে তাঁকে দেখতে! মায়ের সঙ্গে সেই গল্পই হচ্ছিল এতক্ষণ।

—গুরুদেবের গল্প? তোমার মায়ের ওঁকে খুব ভালো লেগেছে।

—হ্যাঁ। যা বললেন, তাতে লাগবারই কথা, বাবা। তাঁর চোখ নাকি অদ্ভুত! আর শরীরের লাবণ্য. ....

বাধা দিয়ে প্রসন্নবাবু বললেন, সেইগুলোই বড় কথা নয়, মা। আসলে বড় হচ্ছে তাঁর সাধনা। কিছুই না করে শুধু তাঁর কাছে বসে থাকলেই মন সংসার থেকে বহু উঁচুতে উঠে যায়। সেইটেই তাঁর পরিচয়। কাছে বসলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।

প্রসন্নবাবু দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে গুড়গুড়ির নলটা মুখে তুলে নিয়ে বললেন, বেশ, তাই হোক। তোমরাও থাক দেখ তাঁকে।

সৌদামিনী নিশ্চিন্ত হয়ে উপরে গেল। তরঙ্গিণীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে তিনি খাটে নেই। এর পিছনেই একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেটা ঠাকুরঘর। সেখানে পাশের দেওয়ালের মাঝখানে একটা জলচৌকির উপর সুদৃশ্য কার্পেটের আসন। তার উপরে একটি সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। সিংহাসনের দু'পাশে জলচৌকির উপর দুটি ধূপদানি। সামনে একটা রেকাবিতে থাকে শঙ্খ, কিছু ফুল।

এখন সন্ধ্যার পরে ফুল অবশ্য নেই।

কিন্তু এ-ঘর থেকেই ধূপের গন্ধে সৌদামিনীর সংশয় রইল না যে. তরঙ্গিণী পুজোর ঘরে।

উঁকি দিয়ে দেখলে, তাই বটে।

সেখান থেকে আবার সে গেল রান্নাঘরে। একটা কড়ায় ঠাকুর মাছের ঝোল চড়িয়েছে। কিন্তু সেখানেও তার ভালো লাগল না। প্রণবের শেষ কথায় যে উত্তাপ ছিল. তখন গ্রাহ্য না করলেও. কিছুক্ষণ থেকে শুধু তার কানে বাজছে যেন। কিছুতে তাকে শান্তি দিচ্ছে না।

আরও খানিক এদিক-ওদিক ক'রে অত্যন্ত চুপি চুপি সে নিজের শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজা বন্ধ।

একটু ফাঁক করে দেখলে ঘর অন্ধকার।

প্রণব কি ভিতরে আছে? খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে কি? বাইরে থেকেই সৌদামিনী কান পেতে ওর নড়াচড়া, ওর নিশ্বাসপতনের শব্দ শোনবার চেষ্টা করলে।

না, কিছু পাওয়া যায় না।

কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও সাহস হয় না। পাছে কারও চোখে পড়ে যায়। শাশুড়ী অবশ্য পুজোয় বসেছেন। এখন তিনি উঠবেন না। কিন্তু ঝি-চাকর তো আছে। তাদেরও সে সমীহ করে এ ব্যাপারে।

সৌদামিনী বারান্দার এদিকে এসে দাঁড়িয়ে অকারণে নীচের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু প্রণবের কণ্ঠস্বরের উত্তাপটুকু—কতটুকুই বা উত্তাপ, বোঝা যায় না বললেই চলে,—সেইটুকুই তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না।

সে আবার শোবার ঘরের দিকে চলল।

বেশি দূরে যেতে হল না, ঝি বললে, দাদাবাবু থিয়েটার দেখতে গেছেন গো। মাকে বলে গেলেন, ফিরতে রাত হবে।

সৌদামিনী লজ্জা পেয়ে গেল। ঝিটাও তার মনের কথা টের পেয়েছে নাকি! মাগো, কী লজ্জার কথা!

মুখে বললে, বাঁচা গেল! ওই কথাটা জানবার জন্যেই আমার এতক্ষণ ঘুম হচ্ছিল না।

পুরনো ঝি। সেও কম যায় না।

বললে, তা লুকুলে কি হবে, বৌদি! ঘুম সত্যিই হচ্ছিল না।

—তাই নাকি! তুই আমার মনের ভিতর ঢুকে দেখে এসেছিস, না?

ঝি-ও নথ ঘুরিয়ে বললে, মনের ভিতর ঢুকতে হবে কেন, বৌদি, দেখলাম ঘুরঘুর করছ, তাই বললাম।

এবারে সৌদামিনী সত্যিই লজ্জা পেয়ে গেল। কৃত্রিম ক্রোধে হাত ঘুরিয়ে বললে, খুব করেছিস। যা, ভাগ্ এখান থেকে।

ঝি হাসতে হাসতে চলে গল।

সৌদামিনী দুমদুম করে গিয়ে আলো জেবলে খাটের উপর শুয়ে পড়ল, যেন সে কাউকে গ্রাহ্য করে না।

ইংরিজী উপন্যাসখানা প্রণব খাটের উপর ফেলে গিয়েছিল। না দেখে শোয়ায় সেইটে ওর পিঠে লাগল।

একটু অস্ফুট শব্দ করে হাত বাড়িয়ে সেইটে সে পিঠের তলা থেকে বার করলে। একবার সেটা খুলে আলোতে দেখলে। ইংরিজী। সেটাকে বালিশের পাশে সরিয়ে রেখে দিলে।

—বৌমা!

—যাই, মা!

—সৌদামিনী ধড়মড় করে উঠে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—খোকা থিয়েটারে গেছে। ফিরতে রাত হবে বলে গেছে। ওর খাবারটা শোবার ঘরে টিপয়ের ওপর ঢেকে রেখো। জলও রেখো এক গ্লাস।

সৌদামিনী চুপ করে রইল।

শাশুড়ী বলতে লাগলেন, তার আবার গুণ অনেক। হয়তো রাত-দুপুরে ফিরে এসে স্নান করতে চাইবে। দিও না স্নান করতে। চারদিকে খুব অসুখ-বিসুখ হচ্ছে।

সৌদামিনী তথাপি নিরুত্তর।

তরঙ্গিণী কি ভেবে বললেন, তোমার কথা না শুনলে আমাকে জানিও। আমি জেগেই থাকব। তবু যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাই বললাম।

সৌদামিনী তা জানে। প্রণব বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। সুতরাং সে এসে খেয়ে না ঘুমনো পর্যন্ত তরঙ্গিণীর চোখে ঘুম আসবে না, এ পরিচয় আরও দু'একবার ইতিমধ্যেই সে পেয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে বললে, খাবারটা আপনার ঘরে রাখবার কথা বলব?

তরঙ্গিণী হাসলেন। তিনি বুঝতে পারেন, সৌদামিনী তাঁর ছেলেকে ভয় পায়। যদিচ ভয়ের হেতুটা তিনি ভুল অনুমান করেন। ভাবেন. পল্লীগ্রামের এই অশিক্ষিতা বালিকা একমাত্র রূপ ছাড়া আর কোনো দিক দিয়েই তাঁর ছেলের যোগ্য নয় এবং সেই অযোগ্যতার কথা ভেবেই সৌদামিনী ভয় পায়।

পুত্রগর্বে মনে মনে তিনি খুশি হলেন।

বললেন, তাই কোরো বরং। আমার ঘরেই রেখো।

ব'লে তিনি রান্নাঘরে গেলেন। সেখান থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

মাছের ঝোলে অত ঝোল রেখেছ কেন, ঠাকুর? কতবার তোমাকে বলিনি, সাহেব ঝোল বেশি পছন্দ করেন না?

ঠাকুর-চাকরের সামনে তরঙ্গিণী মাঝে মাঝে প্রণবকে সাহেব বলে উল্লেখ করেন। সব সময়ে নয়. মাঝে মাঝে, মনটা খুব ভালো থাকলে।

সাহেব! সৌদামিনী হাসলে, সাহেব না হাতি! পুঁইডাঁটাখোর সাহেব!

সৌদামিনী একটু অপেক্ষা করলে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তরঙ্গিণী নিজের ঘরে যেতেই সে আবার শোবার ঘরে ফিরে এল।

আশ্চর্য এই যে. নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে হয়েও এবং পল্লীসমাজের খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচারের সমস্ত সংস্কারে আবদ্ধ হয়েও এই 'সাহেব' ডাকটা সৌদামিনীর ভালো লাগে।

সত্যি, প্রণব পুঁই-চচ্চড়ি খায় কেন? শ্বশুর-শাশুড়ী তো ওর জন্যে বেয়ারা-বাবুর্চি রাখতে প্রস্তুত ছিলেন। সৌদামিনীরও তাতে আপত্তি ছিল না, অন্দরটা নিষ্কলুষ রেখে সমস্ত অনাচার বাইরেই সীমাবদ্ধ থাকত। ওর ইচ্ছা করে, কোট-পেণ্টলুন জুতো-মোজা মায় মাথার টুপিটা পর্যন্ত পরে প্রণব চব্বিশ ঘণ্টা সাহেব সেজে থাকুক।

বাইরের দিকে বাবুর্চির হাতে চেয়ার-টেবিলে কাঁটা-চামচ ধরে থাক। তাতে তার কিছু আপত্তি নেই, বরং ভালোই লাগবে।

বস্তুত সাহেবই যদি সে না হবে, তবে ঐত অর্থব্যয় করে ওই দূরে দেশে এতদিন গিয়ে রইল কেন? সামাজিক গোলযোগ, আত্মস্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আরও কত ঝামেলা যে পোহাতে হচ্ছে—এই বা কেন? আবার যদি বাঙালীর ডাল-ভাতের জীবনে ফিরেই আসতে হয়, তাহলে বিলেত যাওয়ার সার্থকতা কি?

প্রণবের এই জীবনযাত্রার প্রণালী সৌদামিনীর ঠিক ভালো লাগে না। সে নিজে মেমসাহেব হতে চায় না, তাতে তার ভীষণ বিতৃষ্ণা। নিজে সে কঠোর আচারপরায়ণা হিন্দু কুলবধূই থাকতে যায়। কিন্তু স্বামী সাহেব সেজে সাহেবী আচার-ব্যবহার অনুসরণ করলে সে গর্বই বোধ করবে।

কিন্তু প্রণব যেন কী! সে তা পারে না। কেন পারে না? ওর কেমন মনে হয়, মায়ের জন্যেই প্রণব তা পারে না। নইলে তার মনে ইচ্ছা এবং আগ্রহের অভাব নেই।

কে বললে তার আগ্রহের অভাব নেই, কি করে সে টের পেলে এই গোপন কথা, তা সে নিজেও জানে না। শুধু তার মনে হয়,—মনে হয়।

এমন সময় সিঁড়িতে প্রণবের জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

তরঙ্গিণীরও সাড়া পাওয়া গেল ঃ তোর খাবার আমার ঘরে রয়েছে, খোকা। ও ঘরে কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। স্নান করবে না এত রাত্রে।

প্রণব কি বললে, এত দূরে থেকে সৌদামিনী বুঝতে পারলে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেও তার সাড়া না পেয়ে বুঝলে প্রণব খেতে বসেছে। সৌদামিনী তৈরি হয়ে রইল।

আরও কিছুক্ষণ যেতে প্রণবের পায়ের আবার সাড়া পাওয়া গেল। সৌদামিনী তৈরি হয়েই ছিল। প্রণব ঘরে আসতেই দ্রুত খাট থেকে নেমে ডান হাতটা কপালে তুলে বললে, সেলাম সাহেব!

প্রণব আশা করেনি, সৌদামিনী একটা পর্যন্ত জেগে থাকবে। বস্তুত তার ব্যবহারে সন্ধ্যাবেলায় সে খুবই চটে গিয়েছিল। নইলে থিয়েটার দেখার তার যে একটা খুব আগ্রহ আছে তা নয়। সে শুধু আজ রাত্রের মতো সৌদামিনীকে এড়াবার জন্যেই সেখানে গিয়েছিল। ভেবেছিল,

সে যখন ফিরবে, তখন সৌদামিনী ঘুমিয়ে থাকবে এবং ভোরে সকলের ওঠবার আগে যখন সৌদামিনী উঠবে, তখন তার গভীর ঘুমের সময়।

সুতরাং সৌদামিনীকে এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকতে দেখে সে প্রসন্ন হয়নি। কিন্তু সেই অপ্রসন্নতা তার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রবণতা নষ্ট করতে পারেনি।

তাড়াতাড়ি ঠোঁটে একটা আঙুল তুলে সে ত্রস্তভাবে বললে, চুপ।

সঙ্গে সঙ্গে একগলা ঘোমটা কেটে সৌদামিনী ব্যস্তভাবে খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার ধারণা শাশুড়ী আসছেন।

প্রণব শান্তভাবে গায়ের জামা খুলে আলনায় রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্তভাবে খাটে এসে শুয়ে পড়ল।

এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট যায়। কেউ আসে না।

প্রণব বললে, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এতক্ষণে সৌদামিনী বুঝলে, ব্যাপারটা রসিকতা।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সৌদামিনী খাটে এসে বললে, এত ভয় দেখাতে পার তুমি! আমি ভেবেছিলাম, মা আসছেন বুঝি! তাই...

—তাই একগলা ঘোমটা টেনে খাটের পাশে ষষ্ঠীবুড়ির মতো দাঁড়িয়ে পড়লে! তোমার লজ্জার বাহাদুরি আছে!

শেষের দিকে প্রণবের কণ্ঠস্বর একটু কর্কশই শোনাল।

সৌদামিনী বুঝলে সেটা। তার চোখ ছলছল করে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, তুমি রেগে গেছ তা আমি জানি। সেই জন্যেই জেগে বসে আছি এখনও। কিন্তু আমার দোষ কি বল? সন্ধ্যেবেলা, পাশের ঘরে মা রয়েছেন, কখন কি তাঁর দরকার হবে, ডাকবেন। আমি তখন আসতে পারি ঘরে?

—না, পারো না। সুতরাং তখন যদি আমার একটু গল্পগুজব আনন্দ করার ইচ্ছে হয়, তাহলে তিন টাকা খরচ করে থিয়েটারে যেতে হবে। এই তো!

কাঁদকাঁদভাবে সৌদামিনী বললে, তার আমি কি করব বল।

—না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। এখন একটু ঘুমোও। আমার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।

ব'লে পাশ-বালিসটা টেনে নিয়ে প্রণব ক্রুদ্ধভাবে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

এবারে সৌদামিনীও রেগে গেল। প্রণবের পাশ ফিরে শোয়ার ভঙ্গিতে সে খুব অপমানিত বোধ করলে।

বললে, তা তুমি রাগই কর আর যাই কর, মা-বাবার চোখের সামনে দিয়ে আমি তোমার ঘরে আসতে পারব না।

সেও আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এসে অন্য পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

দাম্পত্য-কলহ ওদের জীবনে এই প্রথম নয়। এর আগেও অনেকবার হয়ে গেছে। প্রণব আবার তাকে ডেকেছে, মিষ্টিকথা বলে মান ভাঙিয়েছে। কিন্তু আজ প্রণবের মাথায় যেন গোঁ চেপে গেছে। দুটো বাজল ঢং ঢং করে, অথচ তার সাড়া নেই।

সৌদামিনী আর থাকতে পারলে না। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে, ঘুমুলে?

—না। কেন?

—বাবা দার্জিলিং যাওয়ার কথা বলছিলেন। তোমার সঙ্গে সে কথা কিছু হয়েছে?

—হয়েছে।

—কি বললে তুমি?

—যাব বলেছি।

—কি করে যাবে? ওঁরা দীক্ষা নিচ্ছেন সামনের সোমবারে। গুরুদেব আসছেন। তাঁকে দেখবে না?

—এবারে নাই দেখা হল। অন্যবারে হবে।

—তুমি যাবে তাহলে?

—হ্যাঁ।

—আমি যাবনা বলে দিয়েছি। তুমি একলা যাবে?

—তাহলে একলাই যাব।

—তাই যেও।

ব'লে সৌদামিনী রেগে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলে না। আবার জিজ্ঞাসা করলে, সেটা কি ভালো হবে?

প্রণব বললে, ভালো-মন্দের কথা কাল হবে। এখন দুটো বেজে গেছে। তোমাকে আবার সবাই ওঠবার আগে চারটেয় উঠতে হবে। দেরি হয়ে গেলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না, মনে থাকে যেন।

—আচ্ছা। তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

বলে এবার রীতিমতো রেগে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পরেই সে অঘোরে ঘুমুতে লাগল। আশ্চর্য, প্রণব কিন্তু ঘুমুতে পারলে না।

তিনটে বাজল। সাড়ে তিনটে। ধীরে ধীরে একখানি হাত প্রণব সৌদামিনীর গায়ের উপর রাখলে। ভোরে সকলের ওঠবার আগেই যথারীতি সৌদামিনীর ঘুম যখন ভাঙল, তখনও তার হাতখানি সেইখানেই। এই হাতখানি থেকে মুক্ত হতে সৌদামিনীর মন চাইছিল না। কিন্তু ভোর-ভোর হয়ে আসছে। বিছানায় আর সে থাকতে পারে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে হাতখানি নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে সে উঠল।

প্রণব জানতেই পারলে না। অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে তখন।

দিন পাঁচ-ছয় হল দার্জিলিং এসেছে প্রণব একাই। তার বাবার মক্কেলের বাড়িতে ওঠেনি। একটা হোটেলে উঠেছে। একা এলে হোটেলই ভালো। ঝামেলা থাকে না।

এই হোটেলটা বিলিতী স্টাইলে চলে। মর্নিং টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবই আছে। তবু কেমন দিশী-দিশী। আসল বিলিতী কাকে বলে প্রণব জানে। যারা জানে না তারা শীতার্ত শহরে এই হোটেলে থেকেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। প্রণবেরও মন্দ লাগে না নিতান্ত। অনুকল্পেও কাজ চলে যায়।

কিন্তু ভিতরে তার রাগ পোরা আছে। সৌদামিনী যে এল না, সেই রাগ। ওইটুকু মেয়ের জেদ দেখে সে অবাক্ হয়ে গেছে। অথচ কী কৌশলী! একটা অপরিচিত এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে আত্মরক্ষার কৌশলটা ওরা হয়তো জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই আয়ত্ত করে নেয়।

প্রণবের কাছে সৌদামিনী কিছুতেই নতিস্বীকার করলে না। কিন্তু প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণীকে সে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে যে, তাঁরা ওকে দার্জিলিং যাওয়ার জন্যে এতটুকু চাপ দিলেন না। তরঙ্গিণী ওদের দুজনের মধ্যে কলহের আভাস যদি-বা পেয়ে থাকেন, প্রসন্নবাবু তার বাষ্পটুকুও টের পাননি। বরং ওদের এই বিশ্বাসই হয়েছে যে, গুরুদেবকে দেখবার জন্যে সৌদামিনীর আগ্রহ এতই প্রবল যে, এই

দুরন্ত গরমেও প্রণবের সঙ্গে দার্জিলিং যাওয়ার প্রলোভন সে হেলায় ত্যাগ করলে। এর জন্যে সৌদামিনীর উপর ওঁরা যেন খুব প্রসন্নই হয়েছেন।

কে জানে এই বয়সে সৌদামিনীর এতখানি গুরুভক্তি এবং পারলৌকিক চিন্তা কতখানি অকৃত্রিম। প্রণবের সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। অথচ সে যে এল না, দার্জিলিং দেখার প্রলোভন সত্যই ত্যাগ করলে, তাতেও তো আর ভুল নেই।

এক এক সময় প্রণবের মনে হয় সৌদামিনীর টান যতখানি তার উপরে, তার চেয়ে ঢের বেশি সংসারের উপরে। সে বসে থাকতে পারে না। একখানা বই নিয়ে, কি একটা সেলাই নিয়ে বসে থাকা তার ধাতে নেই। অথচ কাজও কিছু নেই। সুতরাং সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও তরঙ্গিণীর মাথার পাকা চুল তুলছে, কখনও প্রসন্নবাবুর হুঁকো-কলকে থেকে তাঁর স্নানের ঘরের তোয়ালেটির পর্যন্ত তদ্বির করছে, কখনও ভাঁড়ারে কখনও রান্নাঘরে।

সবই করে, শুধু তারই এক ফাঁকে প্রণবের ঘরে এক মিনিটের জন্যে এসে একটু বসার সময় পায় না। আশ্চর্য!

এ-কথা ভাবতেও প্রণবের বুকের ভিতরটা জ্বালা করে ওঠে। তার কেমন মনে হয়, সৌদামিনীর বুকের ভিতরটা বরফের মতো জমাট। তাতে ভাবের কোনো তরঙ্গ খেলে না। তার কাছ থেকে দূরে সৌদামিনী বেশ থাকে। কত তার উৎসাহ, কত তার অনুরাগ। কিন্তু তার কাছে এলেই কেমন যেন সে জমে যায়!

কেন এমন হয়? শিক্ষার অভাবে?

সে কথাও প্রণব একদিন তুলেছিল। বলেছিল, দিনরাত্রি ঘুরে না বেড়িয়ে একটু পড়াশুনা কর।

সৌদামিনী বলেছিল বেশ তো। কে পড়াবে?

—আমি।

—কখন পড়াবে?

—সকালে-সন্ধ্যায়।

লজ্জায় লাল হয়ে সৌদামিনী বলেছিল, রক্ষে কর। সকালে-সন্ধ্যায় তোমার কাছে পড়তে আমি পারব না।

—তবে কখন পড়বে?

—রাত্রে।

—মানে রাত দশটার পর যখন তুমি আসবে, তখন?

—হ্যাঁ।

প্রণব হেসেছিলঃ সেটা কি পড়বার সময়?

—কিন্তু তাছাড়া আর সময় কই?

—তাহলে থাক। রাত দশটায় তোমাকে আমি 'কথামালা' আর 'ফার্স্টবুক' পড়াতে পারব না।

সেই পর্যন্তই হয়ে আছে। এখন দার্জিলিংএর পথে পথে গুণ্ঠনমুক্তা স্বচ্ছন্দবিহারিণী বঙ্গললনাদের দেখতে দেখতে সে সংকল্প করলে. এবারে ফিরে গিয়ে সৌদামিনীর লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তার জন্যে মাকে বলতেও সে লজ্জা করবে না। লজ্জা করলে চলবে না। মাস্টারের কাছে সৌদামিনী হয়তো পড়তে রাজী হবে না। দরকার হলে একজন মেম-শিক্ষয়িত্রীই রাখা যাবে বরং। এ-রকম জবরজং করে ফেলে রাখা ঠিক নয়। প্রণবের সমস্ত জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে তাহলে। সেইদিন সূর্যাস্তের কিছু আগে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বরদা মিত্র তার নাম।

কলেজে ওর সঙ্গে পড়েনি অবশ্য। বোধ হয় দুই-এক ক্লাস উপরেই পড়ত। এখানে ওকে সে চিনত না। বিলেতে পরিচয়। এক সঙ্গে দু'জনে পাস করে এক জাহাজেই ফেরে।

চমৎকার ছেলে এই বরদা। ভিতরে তার অফুরন্ত উদ্যমের যেন একটা ফোয়ারা রয়েছে। চিৎকার ছাড়া সে কথা বলতে পারে না, দৌড়নো ছাড়া হাঁটতে পারে না।

প্রণবকে দেখে সে দূর থেকেই চিৎকার করে উঠল,—হ্যালো, মুক! তুমি!

কাছে এসে ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, কবে এলে?

বরদার পাশে আর একটি মেয়ে চৌদ্দ-পনরো বৎসরের। পাতলা ছিপছিপে লম্বা গড়ন। শ্যামবর্ণ। সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু ছোট্ট ললাটে, পাতলা ঠোঁটে এবং উজ্জ্বল দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

তার দিকে একবার চেয়ে প্রণব জবাব দিলে, পাঁচ-ছ' দিন হল। তুমি কবে?

—হাইকোর্ট বন্ধ হওয়ামাত্র। বাবা-মাও ছিলেন, পরশু ফিরে গেছেন কলকাতায়। এখন আমি আর আমার বোন সুচরিতা।

তারপরে সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, ইনি আমার বন্ধু প্রণব

মুকার্জি', আমরা বিলেতে 'মুক' বলে ডাকতাম। তোমার সঙ্গে এক জায়গায় মিল আছে সু, তোমার মতো ওরও টেনিস খেলায় প্রচণ্ড নেশা।

সুচরিতা নিঃশব্দে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। কোনো কথা না বললেও বোঝা গেল, খেলার প্রসঙ্গে প্রণবের সম্বন্ধে তার উৎসাহ জেগেছে।

চলতে চলতে বরদা বললে, সু এবার এণ্ট্রান্স দেবে।

সুচরিতা সংশোধন করে বললে, দেবার কথা।

—হ্যাঁ, দেবার কথা। অর্থাৎ যতক্ষণ না টেস্টে উত্তীর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ এণ্ট্রান্স দিচ্ছে এ-কথা ও কিছুতে বলতে দেবে না।

বরদা হাসলে।

সুচরিতা প্রণবের দিকে চেয়ে বললে, বলা উচিত নয়। বলুন?

প্রণব সায় দিলে, নিশ্চয়।

বরদা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় উঠেছ?

প্রণব তার হোটেলের নাম করলে।

তোমরা?

বরদা বললে, তোমার হোটেলের থেকে দূরে নয়। তোমার ঘর থেকে নীচের দিকে চাইলে দেখাও যায় হয়তো। ফেরবার সময় চিনিয়ে দোব।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আছ ক'দিন?

প্রণব হেসে বললে, আর ভালো লাগছিল না। পালাব ভাবছিলাম। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, যে ক'দিন তোমরা আছ থাকতে পারি।

—চমৎকার হবে তা হলে!

কথাটা বলে সুচরিতা অকারণেই কেমন লজ্জা পেয়ে গেল।

—আমরা এখনও দিন দশেক তো আছিই। কি বল, সু?

বরদা সুচরিতার দিকে সম্মতির জন্যে চাইলে।

সুচরিতা সায় দিলে, নিশ্চয়ই। আমার তো নেমে যেতে ইচ্ছেই করছে না।

প্রণব বললে, আমিও সে ক'দিন আছি তা হলে।

খুব খুশির সঙ্গে সে একবার বরদার দিকে আর একবার সুচরিতার দিকে চাইলে।

সুচরিতা প্রণবকে জিজ্ঞাসা করলে, 'টাইগার হিলে' সূর্যোদয় দেখেছেন?

প্রণব হেসে ফেললে। বললে, না। শুধু টাইগার হিলে নয়, সূর্যোদয় বস্তুটাই আমার দেখতে বাকি আছে। চিরকাল আমি অত্যন্ত দেরিতে উঠি।

সুচরিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। প্রণব অবাক্ হয়ে ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন করে সৌদামিনী হাসতে পারে? এমন পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছল হাসি? প্রণব তো শোনেনি কখনও। সুচরিতার চেয়ে সে যে বিশেষ বড় তা তো নয়। দু'এক বৎসরের বড় হয়তো। কিন্তু তাকে মনে হয় যেন কত বড়। আর সুচরিতা যেন একফোঁটা মেয়ে।

হাসি থামিয়ে সুচরিতা বললে, আপনি একেবারে দাদার গোত্র। দাদাও সকালে উঠতে পারে না। কতবার এখানে এলাম। এবারও তো অনেকদিন আছি। কিন্তু এ পর্যন্ত দাদা একবারও সূর্যোদয় দেখতে পেলে না।

বরদা হেসে বললে, তোদের চিৎকারে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে যায়, আর আমার ভাঙেনা ভাবিস? ঘুম ভাঙে। কিন্তু অত ভোরে ঠাণ্ডায় লেপের মধ্যে থেকে দেহটা বার করতে পারি না!

প্রণব সায় দিয়ে বললে, আমারও ঠিক তাই। কিন্তু যেতে একদিন হবে, বুঝলে বরদা, নইলে দার্জিলিং আসাই মিথ্যে।

বরদা সাড়া দিলে না।

কিন্তু সুচরিতা উৎসাহের সঙ্গে বললে, কবে যাবেন বলুন। আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব। কেবল কাল হবে না।

কাল যেতে হবেনা শুনে প্রণবের দেহ যেন নববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, কাল নয় কেন?

—কাল সকালে আমাদের একটি আত্মীয়ের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। পরশু হতে পারে। যাবেন?

প্রণব বরদার দিকে অসহায়ভাবে চাইতেই বরদা হেসে ফেললে।

বললে, ওকে অত তাড়া দিসনে সু। তাহলে পরশু গিয়ে হয়তো দেখবি, ও কলকাতা পালিয়েছে।

প্রণব ব্যস্ত হয়ে বললে, না, না। ওর কথা শুনবেন না। পরশুই যাওয়া যাবে।

হোটেলে ফিরে এসে প্রণব কলকাতায় চিঠি লিখতে বসল। এসে পর্যন্ত বাড়িতে কয়েকখানা চিঠি সে অবশ্য দিয়েছে। কিন্তু সৌদামিনীকে একখানা চিঠিও দেয়নি। আজ চিঠি লিখতে বসল তাকেই।

এ ক'দিনের ঘোরাঘুরি এবং দ্রষ্টব্য স্থানের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বাকিটা সে সুচরিতার কথাতেই ভর্তি করলে। কী সুন্দর মেয়েটি, কেমন সপ্রতিভ, আসছে বারে সে যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে এবং সুনিশ্চিত জলপানি পাবে, সমস্ত জানিয়ে শেষে পরশু ভোরে তারা দু'জনে যে আবার 'টাইগার হিল' যাবে, তাও লিখলে। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে তার কেবলই মনে পড়তে লাগল. বরদা এবং সুচরিতার কথা। কিন্তু কোন্ বাড়িতে তারা এসে উঠেছে, খোশগল্পে এমনই সে মশগুল হয়ে উঠেছিল যে, সেইটাই জেনে নেওয়া হয়নি। ওর ঘরের জানালা খুললেই সেই বাড়িটা নাকি দেখা যেতে পারে। সে-চেষ্টা সকালে উঠেই সে করেছে। কিন্তু এতগুলো বাড়ি তার চোখে পড়ল যে. তার মধ্যে ওদের বাড়িটা বেছে নেওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, সে বাড়িতেও ওরা এখন নেই। কোথায় নাকি তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। সেও যে কোথায়. তাও অজ্ঞাত। সুতরাং চা-পানের পর এলোমেলো ঘোরা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু তাতেও একটা প্রতিবন্ধক আছে। ওর হোটেলের ঠিকানাটা তাদের জানা। নিমন্ত্রণ সেরে ফেরার পথে তার হোটেলেও তারা একটা ঢু' দিয়ে যেতে পারে। সে না থাকলে তারা ফিরে যাবে। থাকলে তার ঘরেও আড্ডা জমতে পারে।

অনেক চিন্তার পর প্রণব না বেরুনোই স্থির করলে এবং কার্যকালে দেখা গেল, ও ঠিকই স্থির করেছে। একটু বেলা হতেই ওরা দু'জনে ঠিক তার হোটেলে এসে উপস্থিত।

সুচরিতা বললে. আপনি বেরোন নি?

প্রণব বললে, না।

সুচরিতা দাদার দিকে চেয়ে হেসে বললে, তুমি ঠিকই বলেছিলে দাদা।

বরদা সগর্বে উত্তর দিলে, বলব না? আমি চিনি যে ওকে।

প্রণবের দিকে চেয়ে সুচরিতা বললে, ফেরবার পথে দাদা বললে,

আপনার হোটেল হয়ে যাওয়া যাক। আমি বললাম, নিষ্ফল। এই চমৎকার সকালে আপনি নিশ্চয় বেরিয়েছেন। দাদা হেসে বললে, আপনি যা কুঁড়ে এবং শীত কাতুরে, কোথাও বেরোননি! দেখছি, ঠিক তাই।

হেসে প্রণব জবাব দিলে, ঠিক তাই। কিন্তু কুঁড়েমির জন্যেও নয়. শীতের ভয়েও নয়।

—তবে কিসের ভয়ে?

—আমার কেমন মনে হচ্ছিল, ফেরার পথে আপনারা এদিক হয়ে যেতে পারেন। সে সময় পাছে আমাকে না পান, সেই ভয়েই এই সুন্দর সকালেও কোথাও বেরোই নি।

বরদা একটা চেয়ারে আরাম করে বসে বললে, ভালোই করেছ। তোমার কাছে ভালো চুরুট আছে? দাও তো একটা।

প্রণব দেশলাই আর চুরুটের বাক্সটা এগিয়ে দিলে।

তারপর সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, বলেছিলেন আমার ঘরের জানালা খুললে আপনাদের বাড়িটা দেখা যেতে পারে। তাই কি কম বার উঁকি দিলাম!

সুচরিতা বললে, দেখা যেতে পারে। দেখি দাঁড়ান।

সে প্রণবের পাশে জানালায় এসে দাঁড়াল। একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি।

সুচরিতা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ বললে, ওই তো দেখা যাচ্ছে! ওই যে, ওই লাইনে একটা, দুটো, তিনটের পরে ফোর্থ বাড়িটা। বুঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—ওইটে। এখান থেকে যত কাছে মনে হচ্ছে তত কাছে অবশ্য নয়। অনেকখানি ঘুরে যেতে হবে। সেই কথাটা বলো না, দাদা।

—বলি।—বরদা খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—আজ বিকেলে তোমাকে আমরা ওখানেই নিয়ে যাব, মুক্।

প্রণব বিস্মিতভাবে বললে, সে কি!

বরদা গুছিয়ে বলতে পারছে না দেখে সুচরিতা বললে, হ্যাঁ। আপনি আপত্তি করতে পারবেন না। বাবা-মা চলে যাওয়ার পর অত বড় বাড়িতে আমাদের ভারি একা বোধ হচ্ছে। আমাদের ঠাকুর চাকর রয়েছে। সুতরাং আপনার হোটেলে পড়ে থাকার কোনই মানে হয় না।

তখন-তখনই প্রণব রাজী হয়ে যেতে পারলে না। ভাবতে লাগল।

বরদা হেসে বললে, ভাবনা মিছে, মুক। সু যখন ধরেছে, তখন আজ বিকেলে তুমি ওখানে চলে গেছ ধরে নিতে পার।

[illegible] এরই মধ্যে যতটুকু সে চিনেছে তাতে মনে হল, বরদার কথা মিথ্যে নয়। আপত্তি নিষ্ফল। বিশেষ হোটেলের একঘেয়েমিতে সে এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সে আর বাধা দিলে না। সকালেই সৌদামিনীকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। ওরা চলে যেতেই নতুন ঠিকানা জানিয়ে প্রসন্নবাবুকে আবার একখানা চিঠি দিয়ে দিলে।

দীক্ষা উপলক্ষে কি ভেবে প্রসন্নবাবু বৈবাহিককে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। বিশেষ কিছুই নয়, দীক্ষার তারিখটা জানিয়ে লিখেছিলেন, এই উপলক্ষে একবার যদি আসতে পারেন, অনেকদিন পরে দেখা হয়।

চিঠি পেয়ে শিবশঙ্কর বিশেষ বিব্রত বোধ করলেন। কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে না যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু তাতে বেয়াই ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সে ঠিক হবে না। আবার যদি যান এবং বেয়াই যদি খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন, তাহলেও কঠিন অবস্থা। হয়তো এই থেকেই উভয় পরিবারে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

পিতা-পুত্র এই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারলেন না। পালকি গেল গুরুদেবের কাছে। এই পরিবারে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

গৌরবিনোদ ন্যায়পঞ্চানন ও-অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বহু জমিদারের গুরু। সুতরাং নিঃসন্দেহে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর চতুষ্পাঠীতে অনেক দূর থেকে ছাত্রেরা আসে ন্যায় এবং স্মৃতি অধ্যয়নের জন্যে। অথচ থাকেন তিনি সামান্য পর্ণকুটিরে। শিষ্যদের কাছ থেকে বহু টাকা তিনি নিশ্চয়ই পেয়ে থাকেন; কিন্তু তার সমস্তই টোলের ছাত্রদের পিছনে ব্যয়িত হয়।

শিষ্যদের কাছে ইঙ্গিতে জানালে বহু অর্থ তিনি পেতে পারেন। তাঁর যা পাণ্ডিত্য তাতে কলকাতা অথবা কোনো সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্রে টোল খুললে যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠাও লাভ করতে পারেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই।

গৃহিণী দারিদ্র্য-দুঃখে কাতর হয়ে যদি কখনও অনুযোগ করেন, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় হাসেন।

বলেন, ব্রাহ্মণী, এই মাথায় ঠাকুর রয়েছেন। কোনো লোভের কাছে এই মাথা তো আমি কিছুতেই নোয়াতে পারি না। সে তো ব্রাহ্মণের ধর্ম নয়।

এই সদাহাস্যময় সুরসিক পণ্ডিতের কাছে শিষ্যগৃহের পালকি আসতেই তিনি তাতে চড়ে বসলেন। কালীশঙ্কর নিশ্চয়ই কোনো কারণে বিব্রত। সুতরাং বিলম্ব করা ঠিক নয়।

গিয়ে দেখেন, বিব্রত ঠিকই এবং যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাই নিয়েই।

বললেন, চিন্তা কি! আমি সুদ্ধ যাব।

শিবশঙ্কর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও যাবেন?

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, যাব বইকি, বাবা! আমার ছোটগিন্নী সেখানে রয়েছে। কতদিন দেখিনি। আমাকে তো যেতেই হবে!

সুতরাং দুজনেই চললেন। শিবশঙ্করের আর কোনো চিন্তা রইল না।

সন্ধ্যায় ও'রা গিয়ে উঠলেন এক আত্মীয়-গৃহে। সেখানে রাত্রি যাপন করে সকালে এলেন প্রসন্নবাবুর বাড়ি। তিনি ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ক চিনতেন। উভয়কেই সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন।

সত্য কথা বলতে কি, এতখানি তিনি প্রত্যাশা করেন নি। নিমন্ত্রণ করেছিলেন বটে, কিন্তু সত্যসত্যই যে তিনি এসে পড়বেন এবং একা নয়, গুরুদেবকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে, এ তিনি ভাবতে পারেন নি।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, সে শালা কোথায়?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, দার্জিলিং গেছে।

—তার মানে, পালিয়েছে! আয়ান ঘোষের সম্মুখীন হবার তার সাহস নেই। ভীরু, কাপুরুষ!

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার 'তিনি' কোথায়? তিনিও কি দুর্জয়লিঙ্গে?

নিতান্ত সুপরিচিত রসিকতা। প্রসন্নবাবু হেসে বললেন, বৌমা এই সময়ে কিছুতেই দার্জিলিং যেতে রাজী হলেন না। চলুন ভিতরে। আসুন বেয়াইমশাই।

গুরুদেবের সঙ্গে মেয়ের কাছে যাবার সাহস শিবশঙ্করবাবুর নেই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মুখের আগল তো নেই। কি রসিকতা বাপের সামনেই মেয়েকে করে বসবেন, কে জানে!

ইসারায় বললেন, উনি ফিরে আসুন, তার পরে।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের কিন্তু কোনো দিকেই খেয়াল নেই! তিনি তখন বললেন, ইনি রয়ে গেলেন আর তিনি সাহেব চলে গেলেন দার্জিলিং! বাঃ! বেশ তো!

লজ্জিতভাবে প্রসন্নবাবু বললেন, না, তারও যাবার ইচ্ছা ছিল না। আমিই জোর করে পাঠালাম।

—ভালো করনি, বাবা। আমাদের সমাজের ভিত্তি কোথায়, গড়ন কেমন, কি তার মূল সুর, এর সঙ্গে ছেলেদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়। এ তো ইংরেজের বইতে লেখা নেই! চোখে দেখবে, বুদ্ধি দিয়ে ভাববে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে, তবে তো তার স্বধর্মকে চিনবে। বিলেত গেলেই তো আর সত্যিসত্যিই সাহেব হয়ে যায় না!

ব'লেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন এবং তখনই অন্দরে তাঁর বেসুরো গলায় গান শোনা গেলঃ

"নাতনী লো সই,
কোথায় গেলি তুই?
দুটো মনের কথা কই।"

প্রসন্নবাবু বাইরে পালিয়ে এলেন। কিন্তু এ গলা সৌদামিনীর ভোলবার কথা নয়। সে উপরে কি করছিল। গুরুদেবের গলা শুনে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল।

ওকে দেখামাত্র তিনি আবার গান ধরলেনঃ

"আজ তোমারে দেখতে এলাম
অনেক দিনের পরে।
ভয় নাই সুখে থাকো,
অধিকক্ষণ থাকবো নাকো,
এসেছি দুদণ্ডের তরে।"

—থামুন, থামুন। এটা সাহেব-বাড়ি, ওসব গান চলে না।—বলতে বলতে সৌদামিনী ঢিপ করে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো মুখে-মাথায় নিলে।

তাড়াতাড়ি তাঁর জন্যে মেঝেতে একখানা আসন বিছিয়ে দিলে এবং নিজে অদূরে বসে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা আসেন নি ?

—এসেছেন বইকি! নীচে তোর শ্বশুরের সঙ্গে গল্প করছেন। কেমন আছিস বল্।

—ভালো।

বলবার দরকার ছিল না। দেহ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মুখখানি কেমন করুণ দেখাচ্ছে যেন। সেটা গুরুদেবের দৃষ্টি এড়াল না।

বললেন, কিন্তু তোর মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে? বিরহে, না আমাকে দেখে ?

সৌদামিনী মুখ নীচু করে হেসে জবাব দিলে, কি জানি!

ওর হাসিটা কেমন যেন লাগল গুরুদেবের। এ রকমের হাসি যেন তাঁর পরিচিত।

বললেন, ছেলে-পুলে হবে নাকি ?

সৌদামিনী ছিটকে বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, আপনার কাছে বসবার উপায় নেই।

গুরুদেব হাসতে লাগলেন। বললেন, পালাস নে। শোন্ শোন্। কথা আছে।

একটু পরেই শাশুড়ীকে নিয়ে সৌদামিনী ফিরে এল।

তরঙ্গিণী ভক্তিভরে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, আজ আমাদের সত্যিই বড় সৌভাগ্যের দিন, ঠাকুরমশাই—যে, এ বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আজ আমার বাড়ি পবিত্র হল।

গুরুদেব যেন আর সে মানুষই নন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, ও কি কথা, মা। ও-কথা বললে আমার অপরাধ হয়। তোমাদের দীক্ষা দেখবার জন্যেই আমাদের ছুটে আসা। প্রসন্নবাবাজি যখন গুরু নির্বাচন করে নিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি অসামান্য ব্যক্তি।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি ?

—এখনও হয়নি। তবে এসেছি যখন তখন তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে কি যাব ?

গুরুদেব হাসতে লাগলেন। আবার বললেন, দীক্ষার সময়টা কখন ?

—দশটার পরে।

তা হলে তারও তো আর দেরি নেই। তোমরা তৈরি হয়ে নাও, মা। আমি এখন নীচে যাই।

নীচের ঘরে একখানি অনতিপ্রশস্ত চৌকিতে একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর স্বামীজি একাকী তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁর জন্যে একটা নতুন গড়গড়াই কেনা হয়েছে। পরিধানে একখানা সিল্কের গেরুয়া। চোখে চশমা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলেছে।

দেখলে ভক্তি হয় সত্যই। দেহে একটা অপার্থিব লাবণ্য যেন ঝকঝক করছে। চোখ দুটি সর্বদাই ঢুলুঢুলু,—যেন এ পৃথিবীতে নেই, অন্য কোথাও বিচরণ করছে সব সময়।

প্রসন্নবাবু ন্যায়পঞ্চানন ও শিবশঙ্করবাবুকে সেখানে নিয়ে এলেন। ওঁরা দু'জনেই তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

স্বামীজি ব্যস্তভাবে পা সরিয়ে নিলেন। বললেন, থাক্ থাক্, প্রণাম করতে হবে না। ঠাকুর আপনাদের কল্যাণ করুন।

অভ্যাগতদের জন্যে মেঝেতেও একখানা কার্পেট পাতা ছিল। ওঁরা দু'জনে সেইখানে এবং প্রসন্নবাবু খালি মেঝেতেই উপবেশন করলেন।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, দীক্ষার সময়ও হয়ে এল।

হাতের ইংরিজী খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে স্বামীজি বাঁ হাতের রিস্টওয়াচটা দেখলেন।

বললেন, হুঁ। তোমরা আর দেরি কোরো না। তৈরি হয়ে নাওগে।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, আমরাও এখন উঠি, স্বামীজি। সন্ধ্যায় আছেন তো? তখন এসে আপনার কাছ থেকে অনেক উপদেশ শুনব। ওঠো বাবাজি।

ওঁরা স্বামীজিকে প্রণাম করে উঠলেন। প্রসন্নবাবু সঙ্গে সঙ্গে এলেন। বাইরে এসে হাতজোড় করে বললেন, আপনাদের কিন্তু আমি আহারের জন্য চাপ দিলাম না।

তার জন্যে ওঁরা দু'জনেই মনে মনে খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওঁরা কোনো কথা বলবার আগেই প্রসন্নবাবু বললেন, ঠাকুরমশাইকে খেতে বলি এ সাহস আমার নেই। আপনাকে বলতে পারতাম, বেয়াইমশাই। কিন্তু ভাবলাম, থাক্। আমি আত্মীয় হয়ে যদি আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা না বুঝি, তা হলে কে বুঝবে?

প্রসন্নবাবু ম্লানভাবে হাসলেন।

আবার বললেন, আপনারা এসেছেন এ আমার কত বড় ভাগ্য! কিন্তু সমাজের ব্যবস্থায় সেই ভাগ্য দুর্ভাগ্যে দাঁড়াল। আপনাকে তো কতবার পাবার আশা রাখি বেয়াইমশাই, কিন্তু ওঁকে পাব কোথায়?

ব'লে ন্যায়পঞ্চাননের পায়ের ধুলো নিলেন।

ন্যায়পঞ্চানন ওঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, এজন্যে তুমি দুঃখ কোরো না, বাবাজি। দৌহিত্রের মুখ না দেখা পর্যন্ত শিবশঙ্কর তো এখানে আহার করতে পারেন না। সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

প্রসন্নবাবুর সত্যই সে খেয়াল ছিল না। বললেন, তা বটে। তা হলে বিকেলে আসছেন তো দু'জনে?

শিবশঙ্কর বললেন, নিশ্চয়ই। সদুর সঙ্গে এখনও তো আমার দেখাই করা হয়নি।

তাই নাকি!—প্রসন্নবাবু বললেন,—তা হলে তো নিশ্চয়ই আসছেন। আচ্ছা, আমার আবার......

উভয়েই বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি যান, তৈরি হয়ে নিন গে।

রাস্তায় নেমেই ভাগ্যক্রমে একখানা ঠিকাগাড়ি পাওয়া গেল। তাইতে উঠে দু'জনেই নীরবে বাইরে চেয়ে রইলেন। প্রসন্নবাবুর কথায় প্রকাণ্ড বড় একটা বোঝা উভয়ের বুক থেকে নেমে গেল। সেইটেই উভয়ে নিঃশব্দে উপভোগ করতে লাগলেন।

খানিক পরে শিবশঙ্করবাবু ডাকলেন, ঠাকুরমশাই!

ন্যায়পঞ্চানন নীরবে ওঁর দিকে চাইলেন।

—স্বামীজিকে কেমন লাগল?

ন্যায়পঞ্চানন জবাব দিলেন না। হাসলেন শুধু।

শিবশঙ্কর বললেন, গায়ে সিল্কের গেরুয়া, পায়ে সিল্কের মোজা এই গরমের দিনেও, হাতে রিস্টওয়াচ! কি ব্যাপার বলুন তো? কী রকম স্বামীজি!

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, সেই কথাই ভাবছি, বাবাজি। দিন বদলাচ্ছে। আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিছুটা আমাদের পাপেও বটে। হাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন নতুন গুরুর যুগ,—সিল্কের গেরুয়া-পরা, ইংরিজি-জানা গুরু। তোমার অবাক্ লাগছে, আমারও। কিন্তু এই হবে। কি করবে বল।

একটু পরে বললেন, শুধু তাই নয়, বাবাজি। আমার মনে হচ্ছে. এঁকে যেন আমি চিনি। কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না। চেহারাটা খানিকটা বদলেছে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। সেই কথাটাই ভাবছি।

দুজনেই চুপ করে রইলেন।

হঠাৎ শিবশঙ্কর বললেন, প্রণাম তো করে ফেললাম, ঠাকুরমশাই, বামুন বটে তো!

ওঁর ভয় দেখে ন্যায়পঞ্চানন হাসলেন। বললেন, না হলেই বা ক্ষতি কি? সন্ন্যাসীর তো জাত নেই। তাঁরা জাতির ঊর্ধ্বে। তাই সকলেরই প্রণম্য। সেইজন্যেই আমিও প্রণাম করলাম। নইলে প্রথমে একটু খটকা আমারও বেধেছিল।

আবার দুজনে নিরুত্তর।

ছ্যাকরা গাড়ি ঝর-ঝর ছর-ছর করতে করতে চলেছে।

হঠাৎ এক সময় ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করলেন, সদুর সম্বন্ধে এঁরা কি তোমাদের কোনো খবর দিয়েছেন?

—না তো। কি খবর?—শিবশঙ্কর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—মনে হল মেয়েটা সন্তানসম্ভবা।

—তাই নাকি? শুনলেন সে কথা?

—শুনিনি। ওর মুখখানা দেখে তাই মনে হল। তোমরা কোনো খবর পাওনি তা হলে?

ওঁরা বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আর কানো কথা হল না। কিন্তু খবরটা শুনে আনন্দে শিবশঙ্করবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এবং শিবশঙ্করবাবু বিকেলে যখন প্রসন্নবাবুর বাড়ি পৌঁছলেন, স্বামীজি তখন ড্রইংরুমে একটা শোফায় অর্ধশায়িত। হাতে গড়গড়ার নল।

পা-তলায় মেঝেতে একখানা বাঘের চামড়া পাতা। সেইটেতে প্রসন্নবাবু বসে।

ঘর নিস্তব্ধ। স্বামীজি অন্যমনস্ক হয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছেন। আর প্রসন্নবাবু তদ্গতচিত্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। তিনি কী ভাবছেন তা তিনিই জানেন।

এক সময় স্বামীজি প্রসন্নবাবুর দিকে চাইলেন এবং কী যেন বলতে গেলেন। এমন সময় ওঁদের দুজনকে প্রবেশ করতে দেখে স্বামীজি সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন। নমস্কার!

ওঁরাও সবিনয়ে নমস্কার করে সামনের দুটি শোফায় বসলেন।

স্বামীজি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, আহারের সময় আপনাদের দেখতে পেলাম না তো? প্রসন্ন বললেন, আপনারা চলে গেছেন।

ওঁরা ঠিক বুঝতে পারলেন না, স্বামীজি ভিতরের রহস্যের কতখানি জানেন। তাই কুণ্ঠিতভাবে শুধু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, দেশের ছেলেমেয়েদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জেগেছে। ইউরোপ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত। সুতরাং জিজ্ঞাসুকে ইউরোপ যেতেই হবে। নইলে দেশ বড় হবে না, দেশের লোক কূপমণ্ডুক হয়ে থাকবে। তা তারা থাকতে চায় না। তাই একদিন যেমন নালন্দা কিংবা মিথিলার দিকে ছাত্রদের স্রোত শুরু হয়েছিল, আজ তেমনি শুরু হয়েছে ইউরোপের দিকে। একে ঠেকাবেন কি করে?

ওঁরা জবাব দিলেন না।

স্বামীজি বলতে লাগলেন, আজ জামাই বিলেত গেছে, না খেয়ে জাত বাঁচালেন। কাল যখন ছেলে যাবে, মেয়ে যাবে, নাতি যাবে, নাতনি যাবে —তখন কি করবেন? ক্রমাগত বর্জন করে-করে সমাজ অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাবে। ন্যায়পঞ্চানন মশাই, সমাজকে বাঁচাবার পথ ওদিকে নয়।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, তা যে একেবারেই ভাবছি না, তা নয়। ভাবছি বলেই শিবশঙ্কর বাবাজির সঙ্গে আমি নিজে এসেছি। কিন্তু জানেনই তো, সংস্কার সহজে ভাঙতে চায় না।

ন্যায়পঞ্চানন হাসলেন।

স্বামীজি সিংহ-গর্জনে বললেন, সেই সংস্কার এবারে ভাঙতে হবে। নইলে সমাজপতির আসন ছেড়ে দিতে হবে।

—আমরা তো তার জন্যে তৈরিই আছি, স্বামীজি। আপনাকে গর্জন করতে হবে না, কৃতান্ত নিজেই ডাক দিয়েছেন। শুধু যাবার আগে আপনাদের মতো মহাপুরুষের কাছ থেকে শুনে যেতে চাই, হাজার হাজার লোক বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলেই আমার দেশ বড় হয়ে যাবে? আর কিছুরই দরকার নেই?

গর্জনের কথায় স্বামীজি যেন একটু লজ্জিত হলেন। প্রায় প্রত্যহ বহু লোকের সামনে ওজস্বিনী বক্তৃতা দেওয়ার ফলে ওটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

শান্ত কণ্ঠে বললেন, আরও অনেক কিছু দরকার স্বীকার করি। তাও

অর্জন করতে হবে। যাঁরা বিলেত যাচ্ছেন তাঁরা তো তাতে বাধা দিচ্ছেন না। তা হলে তাঁদের পতিত করা হচ্ছে কেন?

—অন্যায় হচ্ছে। সুতরাং নিশ্চিত জানবেন, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এ'রা পতিত থাকবেন না। তথাপি এ'দের সম্বন্ধে ভয় করবার কি কিছুই কারণ নেই?

—কী ভয় বলুন।

—আমাদের সমাজ যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি। সে তো আজ থেকে নয়, সতীদাহ নিরোধের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তারপরে বলুন।

—আজ ভাঙনের খেলা চলেছে। সমাজ-ব্যবস্থায় যা কিছু অন্যায়, যা কিছু যুগের অনুপযোগী—নির্মমভাবে তাকে ভাঙা হচ্ছে। তারপরে একদিন গড়বার দিন আসবে। ভয় করি সেইদিনকে।

—কেন?

—সেদিন হয়তো আমরা, ন্যায়পঞ্চাননের দল, থাকব না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জানবেন, ভারতবর্ষের প্রাণধর্মকে, তার ঐতিহ্যকে আর আত্মাকে আমরা যেমন করে চিনেছি, ইংরেজের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে তেমন করে চেনা যায় না। সেদিন নতুন ভারতবর্ষ এবং তার নতুন সমাজ গড়বার দায়িত্ব যারা নেবেন, আমাদের আশঙ্কা, তাঁদের চোখ থাকবে বিলেতের দিকে। বিলেতের অনুকরণে ভারত গড়বার চেষ্টায় অনেক দুর্দৈব জমা হবে। কোনো জাতকে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে বড় করা যায়, আমরা ন্যায়পঞ্চাননের দল তা বিশ্বাস করি না, যেমন বিশ্বাস করিনা আমাদের অশ্বত্থগাছকে কোনো প্রক্রিয়ায় ওক্ গাছ করা যায়। যায় মনে করেন?

—না। কিন্তু আপনি অতদূরের কথা এখন থেকে ভেবে বিচলিত হচ্ছেন কেন?

—বিচলিত হচ্ছি তখন আমরা থাকব না, এইজন্যে।

—থাকবেন না কেন?

—কারণ আমাদের প্রয়োজন শেষে হয়েছে। আজ আমাদের হাতে সমাজ আছে বলে যাঁদের আমরা পতিত করেছি, দিন আসছে যখন তাঁরাই আমাদের পতিত করবেন। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে......জানেনই তো।

ন্যায়পঞ্চানন বালকের মতো হাসতে লাগলেন।

স্বামীজি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চয়েছিলেন। বললেন, তাই বা মনে করেন কেন?

—মনে করি? অনুমান? না, স্বামীজি, এ আর অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা চিরকালকার টুলো পণ্ডিতের বংশ। আমার অন্য ছেলেরাও তাই। তারা যজন-যাজন-অধ্যাপনা নিয়েই আছে। কিন্তু ছোটটিকে তার দাদারা দিল ইস্কুলে। গেল বারে সে পঁচিশ টাকা জলপানি পেয়ে এণ্ট্রান্স পাস করেছে। শুনি, সেও নাকি বিলেত গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্ন দেখছে! আর কি করি বলুন?

স্বামীজি হেসে বললেন, সেই কথাই তো বললাম ন্যায়পঞ্চানন মশাই। আজ নাতজামাইএর বেলায় না হয় না-খেয়ে জাত বাঁচালেন, সেদিন কি করে বাঁচাবেন?

—এমনি করেই বাঁচাব। যেমন ক্ষতকে কেটে ফেলে দিয়ে বাকি দেহটাকে বাঁচাতে হয়।

ন্যায়পঞ্চাননের চোখদুটো একবার যেন ধ্বক করে জ্বলে উঠল।

—কিন্তু এদের আপনি ক্ষত ভাবছেন কেন?

—এরা স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট বলে। স্বধর্ম মানে আমি 'সনাতন হিন্দুধর্ম' বলছি না, স্বধর্ম মানে—ভারতের প্রাণধর্ম।

—কি করে ভ্রষ্ট হল? সাহেব হয়ে গেছে বলে?

—সাহেব হলে তো বাঁচতাম। কিন্তু সে তো হবার নয়। এরা রইল ত্রিশঙ্কু হয়ে!

স্বামীজী হেসে বললেন, এদের সম্বন্ধে এই মত একদিন আপনাকে পরিবর্তন করতে হবে যেদিন এদের আরও ভালো করে চিনবেন।

এতক্ষণে ন্যায়পঞ্চানন হাসলেন। বললেন, মরবার আগে পরিবর্তন করতে পারলে শান্তিতেই যাব। কিন্তু তা কি সত্যিই হবে?

ব'লেই চেয়ে দেখেন, শিবশঙ্কর নেই।

জিজ্ঞাসা করলেন, শিবশঙ্কর-বাবাজি কোথায় গেলেন?

প্রসন্নবাবু বললেন, বৌমার কাছে।

—কিন্তু তাঁকে তো একবার খবর দিতে হবে, বাবা। সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল। এবারে আমাকে উঠতে হবে।

প্রসন্নবাবু বেয়াইকে ডাকতে গেলেন।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, আপনার সঙ্গে আলোচনায় পরম প্রীত হলাম, স্বামীজি। আমাদের বৃত্তি ধীরে ধীরে আপনাদের হাতে চলে যাচ্ছে,

ভালোই হচ্ছে। আমাদের অধঃপতনের জন্যেই এমনটি হচ্ছে। সেজন্যে মনে কোনো ক্ষোভ নেই জানবেন। এই যে, শিবশঙ্কর এসে গেছেন। এবারে উঠি স্বামীজি, জয়োহস্তু!

ন্যায়পঞ্চানন সকালে এসে প্রণাম করেছিলেন, যাবার সময় আশীর্বাদ করে গেলেন। একমাত্র শিবশঙ্কর ছাড়া আর কেউ বোধকরি এটা লক্ষ্য করলেন না।

গ্রামের লোক উৎকর্ণ হয়েই ছিল। ন্যায়পঞ্চানন এবং শিবশঙ্কর আসতেই চারিদিকে ঘিরে ধরল। বৃদ্ধ কালীশঙ্করের মনেও উদ্বেগ কম জমেনি। তিনিও এদের মধ্যে রয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

গলা দিয়ে যেন তাঁর স্বর বার হচ্ছে না।

ন্যায়পঞ্চানন হাসলেন। ইচ্ছা করেই যেন প্রশ্নটার ভিতরের অর্থ বুঝলেন না। বললেন, দীক্ষা হয়ে গেল।

অধৈর্যের সঙ্গে কালীশঙ্কর বললেন, সে-কথা নয়। কোনো গোলমাল হয়নি তো?

শিবশঙ্কর পিতার দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের পরিমাণ বুঝছিলেন। খবরটা দেবার জন্যে তাঁর নিজের আগ্রহও সামান্য নয়।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ঘুরিয়ে জবাব দেবার আগেই তিনি বললেন, কোনো গোলমাল হয়নি। বেয়াইমশাই অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি স্পষ্টই বললেন, আমার বাড়িতে দুটি আহার করলে খুবই সুখী হতাম। কিন্তু তার জন্যে অনুরোধ করে আপনাদের বিব্রত করব না।

ন্যায়পঞ্চানন প্রথমে কালীশঙ্কর তারপর সমবেত সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কথাটায় খুবই লজ্জা পেলাম। বললাম, শুধু সেজন্যেই নয়, দৌহিত্র না আসা পর্যন্ত বাবাজির অন্নগ্রহণের উপায় তো নেই। কিন্তু অতবড় উকিলকে কি আর তাতেই ভোলান যায়! শুধু মুখরক্ষা আর কি!

তিনি হাসতে লাগলেন।

কালীশঙ্কর এতক্ষণে উদ্বেগ-মুক্ত হলেন। যাক, তাহলে খাওয়ার জন্যে ওঁরা জেদ করেননি। একটা মস্তবড় অপ্রীতিকর ঘটনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল। কিন্তু গ্রামের লোকে ন্যায়পঞ্চাননের মতো লোকের

মুখে শুনেও যে এত সহজে বিশ্বাস করলে তা মনে হল না। তারা পরস্পরের দিকে ইঙ্গিত হানতে লাগল।

আশ্বস্ত কালীশঙ্কর এবারে জিজ্ঞাসা করলেন সৌদামিনীর কথাঃ সদুর সঙ্গে দেখা হল? কেমন আছে মেয়েটা?

ন্যায়পঞ্চানন উৎসাহের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বললেন, ভালো। খুব ভালো। চেহারা যা হয়েছে, রাজকন্যার মতো! খুব সুখেই আছে।

শুনে কালীশঙ্করের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু গ্রামের লোকেরা আবার একবার ইঙ্গিত হানলে পরস্পরের দিকে।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, গেরস্ত মেয়ের মতো শাড়ি পরেই আছে? না.........

—না। জুতো-মোজা-গাউন প'রে।

—বলেন কি!—গ্রামের লোকেরা এতক্ষণে যেন একটু উৎসাহ বোধ করলে।

—রীতিমতো! আমরা যখন গেলাম, তখন টেবিলে ব'সে কাঁটা-চামচ দিয়ে খানা খাচ্ছে। আমাদের দেখে এতটুকু লজ্জা পর্যন্ত পেলে না। গম্ভীরভাবে বাবুর্চিকে বললে দূরে একখানা চেয়ার দিতে।

লোকগুলির চোখ কপালে উঠল ঃ তাই নাকি!

—হ্যাঁ।

ন্যায়পঞ্চানন রসিকতা করেন এমন গম্ভীরভাবে যে, সেটা সত্য, না রসিকতা বোঝাই যায় না। দুশ্চিন্তায় কালীশঙ্করের গলা শুকিয়ে উঠল। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল।

ন্যায়পঞ্চানন বলতে লাগলেন ঃ আর ঝড়ের মতো অনর্গল ইংরিজী বলে। বললে, রোজ বিকেলে ঘোড়ায় চ'ড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায়।

গ্রামের লোকের চোখের তারা ছানাবড়ার মতো বড় হয়ে উঠেছে। তারা শুধু একটা কথা বলতে পারলে ঃ সর্বনাশ!

—সর্বনাশের আর বাকি কিছু নেই, ভাইসব। বললে তো, নাচ শেখাবার জন্যে একটা মেমসায়েব আছে। রবিবারে-রবিবারে লাটসাহেবের ভোজে গিয়ে নাচতে হয়।

—ভোজ! তাদের সঙ্গে খায়ও নাকি!—অক্ষয় চক্রবর্তী প্রশ্ন করলে।

—সেটা ঠিক বলতে পারব না, অক্ষয়,—ওখানেই খায়, না বাড়ি থেকে খেয়ে যায়। মোট কথা, নাচে এটা ঠিক।

কালীশঙ্করবাবুর তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। কোনো রকমে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, নাতজামাইকে দেখলেন?

—না। সে শালা দার্জিলিং বেড়াতে গেছে!

তৎক্ষণাৎ ন্যায়পঞ্চাননের গলার স্বর যেন বদলে গেল। গাঢ় কণ্ঠে বললেন, দীক্ষা-ঘরের মেঝেয় কী বাহারের আলপনাই কেটেছে শালী! সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। পায়ে টুকটুকে আলতা। একখানা চওড়া লালপাড় শাড়ি প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন একখানি স্থলপদ্ম! এ যেন আমাদের ঠকিয়ে 'হায় হায়, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!'

ব'লে অট্টহাস্যে ন্যায়পঞ্চানন যেন বালাখানার ছাদটা ফাটিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু এমন উপাদেয় রসিকতাতেও যোগ দেবার মতো অবস্থা কারও নয়।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে অক্ষয় অনেকক্ষণ পরে বললেন, তবে যে বললেন— গাউন প'রে টেবিলে ব'সে.........

বাধা দিয়ে ন্যায়পঞ্চানন অন্যান্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে বললেন, অক্ষয় ভায়া, তুমিও কি ওদের মতো পাগল হলে? বিলেত গেলে লোকের কি শিং গজায়, না ক্ষুর বেরোয়? না বাঙালীর মেয়ে বিলেত-ফেরতের সঙ্গে বিয়ে হলে মেম হয়ে যায়?

—কিন্তু

—কিন্তু কিছু নেই রে, দাদা! তোমাদের সদু সেই সদু-ই আছে। শুধু রং আরেকটু চিকণ হয়েছে। আর......

এবারে কালীশঙ্করের দিকে কটাক্ষ হেনে বললেন, সদু সন্তান-সম্ভবা।

উপায় থাকলে কালীশঙ্কর লাফিয়েই উঠতেন। কিন্তু তা সম্ভব হল না। শুধু তাঁর বিপুল কলেবর একবার দুলে উঠল মাত্র।

বললেন, তাই নাকি!

—হ্যাঁ। আমি দেখেই বুঝেছিলাম। বাবাজিও তাঁর বেয়ানের কাছে সেইরকম ইঙ্গিতই পেলেন। এখন......

তাঁকে তার কথাটা শেষ করতে হল না। কালীকিঙ্কর গর্জন করে উঠলেন : ওরে কে আছিস, [illegible] কলকেটা পালটে দিয়ে যা তো—

খবরটা বাড়ির মধ্যে রাষ্ট্র হতেও দেরি হল না। এবং সেখানেও মেয়েমহলে

একটা প্রকাণ্ড আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সৌদামিনী এ বাড়ির বড় মেয়ে। সুতরাং তার সন্তান-সম্ভাবনায় একটু বিশেষ আনন্দ হবারই কথা।

শিবশঙ্কর তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, এখনই লাফিও না। পাকা খবর কিছু নয়। বেয়ান বললেন, আরও দু'এক মাস না গেলে বোঝা যাবে না।

এরকম সংবাদে মেয়েদের সহজে নিরস্ত করা যায় না।

তাঁরা বললেন, তবে যে ঠাকুরমশাই বললেন......

হ্যাঁ। ঠাকুরমশাই বললেন, বেয়ানও বললেন, আমারও দেখে তাই মনে হল। তবু এখনই নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি।

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে শিবশঙ্করের মা বললেন, ওরে দেখিস, এসব খবর মিথ্যে বড় একটা হয় না। সদুও মা হবে! কী আশ্চর্য ব্যাপার! সে নিজেই তো সেদিনও খিড়কির বাগানে ছুটে-ছুটে খেলে বেড়িয়েছে! আজও সে নিজের যত্নই করতে শেখেনি। ছেলের যত্ন করবে কী করে কে জানে!

শিবশঙ্করের মা ফোকলা দাঁতে হাসতে লাগলেন।

এ ব্যাপারে শিবশঙ্করের বলার কিছু নেই। তিনি হাসতে হাসতে উপরে উঠে গেলেন। মেয়ের হয়ে কোমর বেঁধে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করতে নামলেন শিবশঙ্করের স্ত্রী।

—কেন? আপনাদের তো আরও কম বয়সে ছেলে হয়েছিল। ছেলের যত্ন আপনারা করতে পেরেছেন আর আমার মেয়ে পারবে না? আমার মেয়েকে কী ভাবেন আপনারা?

এমন সময় গুরুদেবের পিছু পিছু কালীশঙ্কর অন্দরে এলেন। বৌমার শেষের কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল।

বললেন, তোমার মেয়ে কি সোজা, মা! সে ঝড়ের মতো ইংরিজী বলে, ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খায় আর লাটসাহেবের বাড়িতে নাচে। বিশ্বাস না হয় ঠাকুরমশাইকে শুধোও।

—তা নাচবেই তো। আমাদের মেয়ে রণরঙ্গিণী, সিংহবাহিনী। আপনাদের মেয়ের মতো জবুথবু ষষ্ঠীবুড়ি তো নয়। সে নাচবে, হাওয়া খাবে, আবার বাড়ি ফিরে ছেলেকে বুকে করে মানুষও করবে। দেখবেন!

কালীশঙ্করের স্ত্রী বললেন, তা বেঁচে থাকলে দেখতে হবে হয়তো। কিন্তু খবরটা যখন পাওয়া গেল তখন আসল কাজটা করে রাখো। পাঁচসিকে পয়সা [illegible] জন্যে আর পাঁচসিকে মা আনন্দময়ীর জন্যে মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখো। পাকা খবর এলে ভোগ দেবে।

সৌদামিনীর মা ব্যস্তভাবে দুটি যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বিনোদ রায় এবং মা আনন্দময়ীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, যা বলেছেন, মা!

তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল, আরও একটি মানত এখনও পরিশোধ করাই হয়নি। বললেন, ওই দেখুন মা, কী ভুল হয়ে গেছে!

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, কী আবার ভুল হল?

—বাবা তারকনাথের একটা মানত শোধ করাই হয়নি।

—সে আবার কবে করেছিলে?

—অনেক দিন আগে। জামাই ভালোয়-ভালোয় এসে পৌঁছুবেন ব'লে করেছিলাম।

শাশুড়ী বিরক্তভাবে বললেন, ওই তোমার দোষ, বাছা। মানত করবার সময় একগাদা করে বসো, তারপরে আর শোধ কর না! ভারি খারাপ অভ্যেস।

লজ্জিতভাবে সৌদামিনীর মা বললেন, ভুলে গিয়েছিলাম, মা। তা ছাড়া তারকনাথ যাবার লোকও তো পাওয়া যায় না বড়।

—ছেলে-মেয়ে-জামাইএর মানত নিজে গিয়েই শোধ করা ভালো। আমাকেও তো বলনি?

—আপনি ঠাট্টা করেন ব'লে ভয়ে বলিনি।

এবারে শাশুড়ী হেসে ফেললেন। বললেন, তা বাছা, এই বুড়ি যদ্দিন বেঁচে আছে, তদ্দিন তোমাদের ছেলে-মেয়ে-জামাই নিয়ে খোঁচা একটু খেতেই হবে। তাই বলে লজ্জায় মানত লুকুলে চলবে কেন?

—এবারে যেন, মা......

—মেয়েটা নেয়ে-ধুয়ে ছেলে কোলে করে আসুক, আমি নিজে তোমাকে বাবা তারকনাথের ঠাঁই নিয়ে যাব।

ব'লেই কী কথা মনে পড়ায় কালীশঙ্করের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তখন মেঝেয় একরাশ কাগজপত্র বিছিয়ে জমিদারী-সংক্রান্ত কী একটা কাগজ খুঁজছিলেন। গৃহিণীকে দেখে তাঁর দিকে চাইলেন।

গৃহিণী বললে, হ্যাঁগা, এইবার!

—কী এইবার?

—সদুর খবরটা যদি সত্যি হয়, প্রথম ছেলে, আনতে তো হবে।

কথাটা যে কালীশঙ্করও ভাবছিলেন না, তা নয়। কিন্তু ভেবে

কোনো দিশা পাচ্ছিলেন না। আনা উচিত। অথচ আনা অসম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

কিন্তু গৃহিণীকে সে কথা বলতে ইচ্ছা করল না। বললেন, দেখি, আগে পাকা খবরই তো আসুক।

গৃহিণীও নাছোড়বান্দা। বললেন, খবর যদি সত্য না হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে কি করবে তাই শুধোতে এলাম।

কালীশঙ্কর অসহায়ভাবে ওঁর দিকে চাইলেন। একটু ভেবে ধীরে ধীরে বললেন, সেই সমস্যার কথাই ভাবছি, মেজবৌ। কিন্তু ভেবে কোনো দিশা পাচ্ছি না।

দিশা গৃহিণীও পাচ্ছিলেন না। দুশ্চিন্তায় তিনিও দরজার গোড়ায় বসে পড়ে ভাবতে লাগলেন।

রাত্রেই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কালীশঙ্করকে বলেছিলেন, যা করা হচ্ছে সেটা নিতান্তই জোড়াতালি। জোড়াতালি বেশিদিন থাকে না। অথচ সম্পর্কটা জোড়াতালির নয়, স্থায়ী।

স্বামীজির কথাটাও তাঁর মনে লেগেছিল, সমস্যা সমাধানের পথ ওটা নয়। বিলেত যাওয়ার ঢেউ এসে গেছে—সত্যকার শিক্ষার জন্যেই হোক, আর জীবিকার্জনের ব্যবস্থার জন্যেই হোক। তাকে রোখা যাবে না। সুতরাং সমাজকে বাঁচাবার জন্যে তাকে আর একটু প্রশস্ত, আরও একটু উদার করতে হবে।

স্বামীজির সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই, অর্থাৎ যেদিন থেকে প্রণবের ফিরে আসার কথা হয়েছে, সেই দিন থেকেই, এই সমস্যার কথা নানা দিক দিয়ে তিনি ভাবছিলেন। সমাধানের পথ খুঁজছিলেন। এবারে কলকাতা থেকে ফিরে এসে সেই পথ যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন। রাত্রে কালীশঙ্করের সঙ্গে এই নিয়ে অনেক আলোচনা তিনি করলেন।

বললেন, প্রসন্নবাবুকে যেরকম বুদ্ধিমান এবং বিবেচক দেখলাম তাতে তোমাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে, এমন কাজ তিনি কখনও করবেন না। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। ছেলে হবার সময় সদু এখানে আসতে পারবে না, পুজো-পার্বণে জামাই আসবেন না, তাঁদের বাড়ি গিয়ে তোমরা উঠতে পারবে না,—এরকম আত্মীয়তাই বা কতদিন টেঁকতে পারে?

শুষ্ক মুখে কালীশঙ্কর বললেন, কিন্তু উপায়ই বা কি?

ন্যায়পঞ্চানন বললেন. উপায় একটা পেয়েছি। এখন প্রণবভায়া রাজী হলে হয়।

—কী উপায়?—কালীশঙ্কর যেন তথাপি ভরসা পাচ্ছিলেন না।

—প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে এর জন্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

—হুঁ।—কালীশঙ্কর ভাবলেন। বললেন,—শুধু প্রণব কিংবা প্রসন্নবাবুই নয়, সমাজপতিদের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

সংগত কথা। এক্ষেত্রে যে দু'টি পক্ষ, তাদের উভয়েরই সম্মতি প্রয়োজন।

ন্যায়পঞ্চানন বললেন, প্রসন্ন-বাবাজির সম্মতি পেলে তখন আমি নিজে সমাজপতিদের সংগে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

—তাহলে প্রণবভায়া ফিরে এলে আপনাকেই এর জন্যে কলকাতা যেতে হয়।

ন্যায়পঞ্চাননের তাতে আপত্তি নেই। শিষ্যের বিপদে তাকে উদ্ধার করাই তাঁর ধর্ম।

তিনি বললেন, ইতিমধ্যে কাল সকালে তোমাদের এখানকার প্রধানদের সংগে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

এখানকার প্রধানদের সম্বন্ধে কালীশঙ্করের দুশ্চিন্তা খুব বেশি নয়। এ গ্রাম তাঁর জমিদারি। কিছুটা লাঠির জোরে, কিছুটা মামলা-মোকদ্দমার হয়রানির মধ্যে ফেলে এদের সম্মতি আদায় করা তাঁর মতো দুর্দান্ত জমিদারের পক্ষে শক্ত হবে না। ভয় তাঁর পঞ্চগ্রামী সমাজকে। তারা তো আর তাঁর প্রজা নয়!

কিন্তু ন্যায়পঞ্চাননকে তিনি চেনেন। লাঠির জোরে সমাজকে দাবিয়ে রাখবার প্রসংগ তাঁর মতো নির্ভীক তেজস্বী ব্রাহ্মণ কখনই সহ্য করবেন না। সুতরাং মনের কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করলেন না।

মুখে বললেন, বেশ তো!

সুতরাং পরদিন সকালে তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদের ডাকলেন এবং কথাটা তাঁদের কাছে পাড়লেন। তাঁর যুক্তি-তর্ক সকলে যে খুব বুঝল তা মনে হল না। সমুদ্রযাত্রা, ম্লেচ্ছ সহবাস. ম্লেচ্ছ আহার যদি অপরাধ হয়, তাহলে তার শাস্তিও অপরাধীর প্রাপ্য। সমাজ সেই শাস্তি থেকে যদি কোনো বিশেষ অপরাধীকে নিষ্কৃতি দেয়, তাহলে সমাজের শৃঙ্খলা কি করে থাকবে?

ন্যায়পঞ্চানন তার জবাব দিলেন। বললেন, যার শাস্তি দেবার অধিকার আছে, মার্জনা করারও তার অধিকার আছে। তাতে শাস্তিদাতার শক্তি খর্ব হয় না।

কিন্তু কেন মার্জনা করবে?

অনুতপ্তকে মার্জনা করা অন্যায় নয়।

সেক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে, অপরাধীর এই অনুতাপ আন্তরিক কিনা, অথবা শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের কৌশল মাত্র। মার্জনার সার্থকতা হচ্ছে অপরাধ হ্রাসে। যদি দেখা যায়, কাতারে কাতারে লোকে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, ম্লেচ্ছদেশে অখাদ্য ভোজন করছে আর ফিরে এসে সমাজের কাছ থেকে মার্জনা লাভ করছে, তাহলে তাকে মার্জনা বলে না, প্রশ্রয় বলে। প্রশ্রয়ে অপরাধ কমে না, বাড়ে।

চুরির ক্ষেত্রে, কিংবা অন্য কোনো নৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে। কিন্তু এটা ঠিক সেই শ্রেণীর অপরাধ নয়। একদিন ভারত জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেদিন শিক্ষার জন্যে কারও সমুদ্রযাত্রার আবশ্যক হত না। কিন্তু কালের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত আজ আর জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ নয়। তাকে বড় হতে গেলে, বিদেশ থেকেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ করে আনতে হবে। তার জন্যে কিছু অনাচার অবশ্যম্ভাবী। দেশের ভাবী কল্যাণের দিকে চেয়ে সেই অবশ্যম্ভাবী অনাচারের ত্রুটি যদি সমাজ মার্জনা করতে না পারে, তাহলে সমাজকেই ঠকতে হবে।

এমনি অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। কোনদিনই তর্কের মীমাংসা হয় না। এখানেও হত না। অবশেষে অক্ষয় চক্রবর্তী এই তর্কে ছেদ টানলেন।

অক্ষয় বললেন ঠাকুরমশাই, শাস্ত্র আমরা জানি না। কিন্তু আপনাকে জানি। জানি যে, যা অন্যায়, যা অশাস্ত্রীয় তা নিজেও আপনি কিছুতেই করবেন না, অন্যকেও করতে দেবেন না। সুতরাং আপনি যদি বলেন, জামাতা-বাবাজি প্রায়শ্চিত্ত করলে তাঁকে সমাজে গ্রহণ করা কর্তব্য, তাহলে আমদেরও আপত্তির কোনো কারণ নেই। আমরা আপনার উপরই সমস্ত ভার দিলাম।

অন্যেরাও সায় দিলেন, অক্ষয় সঙ্গত কথাই বলেছেন।

অক্ষয় বললেন, কিন্তু আমরাই তো আর সমগ্র হিন্দুসমাজ নই। পঞ্চগ্রামী সমাজ আছে। তার মতও নিতে হবে।

—নিশ্চয়ই।—ন্যায়পঞ্চানন বললেন,—কিন্তু আপনারা হলেন গ্রাম্য-সমাজ। আপনারাই সকলের আগে। আপনাদের সম্মতি যখন পাওয়া গেল তখন এইবার আমি পঞ্চগ্রামী সমাজের কাছে যাব।

তাঁকে বেশ উৎসাহিত বোধ হল। কালীশঙ্করবাবুও সমস্তক্ষণ নিঃশব্দে ধৈর্যের সঙ্গে এই বিতর্ক শুনছিলেন। বস্তুত তাঁদের গ্রাম্য-সমাজকে তিনি জানেন। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর ভয় বেশি ছিল না। ভয় পঞ্চগ্রামী সমাজ সম্বন্ধেই। এবং সে ভয় রইলই, যদিও গুরুদেবের পাণ্ডিত্যে এবং প্রভাবে তাঁর আস্থা যথেষ্টই।

দার্জিলিং থেকে ফিরে আসার পর প্রণবের যে পরিবর্তনটা সাধারণের চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে তার শারীরিক পরিবর্তন। প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণী এই সাধারণেরই অন্তর্গত। প্রণবের রংটা বরাবরই ফরসা। দার্জিলিং সেই ফরসা রঙের উপর যেন একটা লাল আভার হালকা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। তার স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সকলে খুশি হলেন।

শুধু সৌদামিনীই বুঝলে, তা ছাড়াও পরিবর্তন ঘটেছে। সেটা দেহে নয়, মনে। শুধু তারই চোখে পড়ল, দেহের মতো সেখানেও একটা হালকা লালের ছোপ লেগেছে। খুবই হালকা অবশ্য এবং তার জন্যে সে কিছুমাত্র বিচলিত হল না।

হাইকোর্ট খুলে গেছে। সুতরাং দার্জিলিং থেকে নেমেই প্রণব কাজের মধ্যে পড়ল। এখন আর সে দেরিতে ওঠে না। খুব ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সিনিয়রের বাড়ি যায়। সেখান থেকে দশটায় ফিরে স্নানাহার সেরে কোর্ট। ফিরতে পাঁচটা। তার পরে মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে টেনিস র‍্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে যায় বরদার বাড়ি। সেখানে টেনিস খেলার লন আছে। বরদার বাবা ধনী লোক। যেদিন রাত্রে সিনিয়রের বাড়ি 'কনসালটেশন' থাকে, সেদিন খেলা থেকে বাড়ি ফিরেই আবার সিনিয়রের বাড়ি যায়। যেদিন থাকে না, সেদিন বাড়ি ফিরেই অফিস-ঘরে বসে। মামলার কাগজপত্র সিনিয়রের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করে। কাজ চলে অনেক রাত্রি অবধি। আবার হাতে কাজ যেদিন থাকে না সেদিন সন্ধ্যা এবং খানিক রাত্রি পর্যন্ত বরদাদের ওখানেই কাটায়।

বরদার বাবার সঙ্গীতে অনুরাগ আছে। সুচরিতা নিজেও গান জানে এবং ভালো ওস্তাদের কাছে গান শিখছে। মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গানের মজলিস বসে। সেদিন প্রণব ওদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেলেও ডিনার করে। সেদিন ওর মুখে সৌদামিনী যেন কিরকম একটা গন্ধ পায়। প্রণব বলে, ভিনিগারের। সৌদামিনী ভিনিগারও জানে না, তার গন্ধও চেনে না। সুতরাং মনে তার কোনো সন্দেহ জাগে না।

প্রণবের কাজে অনুরাগ এবং শ্রমের আগ্রহ দেখে প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণী উভয়েই খুশি। প্রসন্নবাবু নিজে উকীল, তিনি জানেন, অন্তত ওকালতির ক্ষেত্রে পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। তার পরিশ্রম এবং কর্মানুরাগ দেখে তাঁদের মনে প্রণবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোনালী আশা জাগে।

সৌদামিনীও খুশি হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। যখন প্রণবের কাজ ছিল না, তার অফিসের টেবিলে ব্রীফ জমেনি, তখন তার মনে জাগত সৌদামিনীর সঙ্গলাভের ক্ষুধা। সৌদামিনীর কাছে সেটা ছিল একটা মস্তবড় ভয়ের ব্যাপার।

সে পল্লীগ্রামের জমিদারের কন্যা। সেখানকার চাল-চলন একেবারে মোগল যুগের। সেখানে সদর থেকে অন্দরে আসার পথে আরও দুটো মহল। সেখানে সকালেই পুরুষেরা বেরিয়ে যায় সদরে। বাইরেই স্নান সেরে অন্দরে একবার খেতে আসে। খেয়ে আবার বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রি ন'টায়। সমস্ত দিন অন্দরে পুরুষের এই অনুপস্থিতিতেই সে অভ্যস্ত। এইটেই তার সংস্কারের মধ্যে রয়েছে। দিনের বেলায় সকলের সামনে প্রণবের ঘরে যাওয়া তার কাছে গভীর লজ্জা এবং কলঙ্কের বিষয়।

সুতরাং প্রণবের কর্মব্যস্ততায় লজ্জা এবং কলঙ্কের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে বেঁচেছে। সেইটিই তার পক্ষে খুশির বিষয়। প্রণবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা সে ঘামায় না, সে বয়সও তার নয়।

প্রণব অবাক্ হয়ে যায়, ওর মধ্যে নারীসুলভ ঈর্ষা এবং অন্য নারী সম্বন্ধে সতর্কতা-বোধের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি দেখে। দার্জিলিং থেকে প্রণব সুচরিতার উল্লেখ করে যে চিঠি দিত, তার উত্তরে সৌদামিনী

সুচরিতাকে ভালোবাসা জানাত শুধু—নারীসুলভ কৌতুকবশে একটা পরিহাসও করেনি।

এখানেও মাঝে মাঝে প্রণব সুচরিতার গল্প করে। হয়তো বলে ঃ

—মেয়েটা যেমন চমৎকার গান গায়, তেমনি চমৎকার টেনিস খেলে।

সৌদামিনী বড় বড় চোখ মেলে শোনে। জিজ্ঞাসা করে, জোরে জোরে গলা খুলে গান গায়?

—নিশ্চয়।

—পাশের বাড়ির বেটাছেলেরা শুনতে পায় তো?

—কেন পাবে না?

—রাস্তার লোকেরাও শুনতে পায়?

—শুনতে পায় মানে? এক এক দিন দেখি, গেটের গোড়ায় রাস্তার লোকের ভিড় জমে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে!

সৌদামিনী এই নির্লজ্জতার নিন্দা করে না, মেয়েমানুষের গান গাওয়ার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। শুধু গভীর লজ্জায় তার নিজের দেহটা যেন শিউরে সংকুচিত হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি সে অন্য প্রসঙ্গ তোলে।

টেনিস খেলা সম্বন্ধেও তার কোনো ধারণা ছিল না। সে ভাবত, তাসখেলার মতো ঘরে বসে কোনো খেলা বুঝি। বারে বারে শুনতে শুনতে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, খেলাটা কেমন?

প্রণব বুঝিয়ে দিতেই সৌদামিনীর বড় বড় চোখ আরও বড়-বড় হয়ে উঠল। সমস্ত মুখে কে যেন এক ঝলক আবীরের ঝাপটা দিলে। মুখ নিচু করে শুধু বললে, মাগো! এমনি ছুটে-ছুটে খেলা!

ব্যস্। আর কিছু নয়।

গভীর রাত্রে প্রণব হয়তো জিজ্ঞাসা করে, সুচরিতাকে তোমার ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন?

—তার সঙ্গে খেলাধুলো করি, মিলি মিশি।

সৌদামিনী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয় কথায় ইঙ্গিতটা আর একটু স্পষ্ট হওয়ায় তাড়াতাড়ি প্রণবের মুখ চেপে ধরলে,

—ছিঃ, ভদ্রঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও ওরকম বলতে নেই।

প্রণব অবাক্ হয়ে যায়। সৌদামিনী কি! শিশু না নির্বোধ!

প্রণব বললে, ভাবছি তোমার জন্যে একজন মেম মাস্টারনী রাখব। তোমাকে লেখাপড়া শেখাবে।

কুণ্ঠিতভাবে সৌদামিনী বললে, আমি কি পারব?

—কেন পারবে না?

—আমার পড়তে ভালো লাগেনা যে! কত কষ্টে যে 'বোধোদয়' শেষ করেছি সে আমিই জানি।

সৌদামিনী লজ্জিতভাবে হাসলে।

—পড়তে-পড়তেই ভালো লাগবে দেখ।

—বেশ। দেখব। মাকে একবার জিজ্ঞেস কোরো কিন্তু।

—করেছি। তাঁর আপত্তি নেই।

—আমি লেখাপড়া শিখলে তুমি খুশি হবে?

—খুব খুশি হব যদি মন দিয়ে পড়।

—বেশ।

কিন্তু গলায় তার জোর নেই। সে যেন নিশ্চিন্তভাবে জানে যে, তার পড়াশুনো হবে না। তবু প্রণব যদি খুশি হয়, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

বললে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা খুব চালাক-চতুর হয়, না?

—হয়ই তো।

—সুচরিতা খুব চালাক-চতুর, না?

—নিশ্চয়ই।

—একদিন আনবে তাকে? তোমার মুখে ক্রমাগত তার কথা শুনে-শুনে তাকে দেখতে ভারী ইচ্ছা হচ্ছে।

প্রণব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর আনত মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। বললে, সেটা ঠিক হবে না, সদু।

—কেন?

—তোমার যদি তাকে দেখে নিজেকে ছোট মনে হয়, তাহলে ভারি কষ্ট পাব আমি।

সৌদামিনী বিস্মিতভাবে বললে, ছোট মনে হবে কেন? সে লেখাপড়া শিখেছে বলে? টেনিস খেলতে পারে বলে?

—হ্যাঁ।

সৌদামিনী খিলখিল করে হেসে ফেললে। বললে, ছাই লেখাপড়া, ছাই টেনিস খেলা! মেয়েদের ছোট-বড় তাতে নয়।

—তবে?

এবারে সৌদামিনী স্বামীর বুকে মুখ লুকোল। বললে, সে আমি বলতে পারব না।

—কেন বলতে পারবে না? বলতেই হবে।

প্রণব জোর করে তার সুন্দর মুখখানা তুলে ধরলে।

বিব্রতভাবে সৌদামিনী বললে, তুমি এত লেখাপড়া শিখেছ, আর এটা জান না?

—না। কিসে ছোট-বড় বল। রূপে?

—ছাই রূপ!

—তবে?

বাধ্য হয়ে সৌদামিনীকে বলতে হল। কোনোরকমে বললে, স্বামী-সৌভাগ্যে।

সুতরাং সুচরিতা কেন, কোনো মেয়ের কাছেই সৌদামিনী নিজেকে ছোট মনে করে না। মন তার ঈর্ষা থেকে মুক্ত।

প্রণব অবাক্ হয়ে ওর লজ্জারুণ সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে কী ভাবলে সেই জানে, অকস্মাৎ তার নিজের মুখও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

প্রণবের খুব ইচ্ছা করে একদিন বরদা আর সুচরিতাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। রাত্রে ওদের বাড়ি প্রায়ই সে খায়। কিন্তু দুটি মস্তবড় অন্তরায়ের জন্যে পারে না। প্রথমত সৌদামিনী কিছুতেই বরদার সামনে বার হতে প্রস্তুত নয়। দ্বিতীয়ত ওরা কায়স্থ। ওদের সঙ্গে বসে সৌদামিনী কিছুতেই খাবে না।

ঝি-চাকরের সামনেই সে প্রণবের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়, আর প্রথমত বরদার সঙ্গে, দ্বিতীয়ত তারই সামনে প্রণবের সঙ্গে কথা বলবে সে—সৌদামিনী? কেটে ফেললেও পারবে না।

একসঙ্গে খাওয়ার কথায় সৌদামিনী হেসেই খুন! একে তো সে বামুনের মেয়ে, কায়স্থের সঙ্গে খাবে? তার উপর মেয়েপুরুষের একসঙ্গে বসে খাওয়ার কথা সে তো বাপের জন্মে শোনেনি! প্রণব কি সত্য বলছে, না ঠাট্টা করছে?

সুতরাং সে আশা ছেড়েছে। বিশেষত তরঙ্গিণীও যখন এই ব্যাপারে বধূর দিকে।

মায়ের সঙ্গে প্রণব তর্ক করেছে, কেন, বন্ধুবান্ধবের সামনে বার হলে দোষ কি?

—দোষ না থাকলে শাস্ত্রে নিষেধ করবে কেন?

—কোন্ শাস্ত্রে নিষেধ করেছে বল?

—সব শাস্ত্রেই নিষেধ করেছে। নইলে মেয়েরা কথা বলে না কেন?

এর উপর তর্ক চলে না।

প্রণব বললে, আচ্ছা, বরদার সামনে না-হয় বার হল না, খেতেও না বসল। সুচরিতার সঙ্গে খেতে দোষ কি?

—দোষ আছে বইকি! তারা কায়েত আর আমরা বামুন।

—আমরা কিসের বামুন! বামুনের কোন্ কাজটা করি?

—নাই করলাম। কিন্তু 'জাত' যখন রয়েছে, তা যখন মিথ্যে নয়, তখন মানবিনে?

—না, মানব না। আমি তো সবই খাই, সকলের সঙ্গেই খাই, বিলেতে ম্লেচ্ছের হাতে ম্লেচ্ছের সঙ্গেও খেয়েছি।

—পুরুষমানুষে সব পারে। তাদের দোষ নেই।

—আর যত দাষ মেয়েদের বেলায়?

এবারে তরঙ্গিণী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁরে! তা হবে না? মেয়েরা হল ঘরের লক্ষ্মী। তারা অনাচারী হলে ঘর-সংসার ভেসে যাবে না?

—বরদার ঘর-সংসার কি ভেসে গেছে?

—যেত, যদি বরদার মা না থাকতেন। নিজের পুণ্যে তিনি সব আটকে রেখেছেন।

—তাই নাকি! তুমি কি বরদার মাকে চেন?

একগাল হেসে তরঙ্গিণী বললেন, কাল যে আলাপ হল।

—তাই নাকি! কোথায়?

—[illegible] ঠাকুরবাড়িতে ভাগবত শুনতে এসেছিলেন। দিব্যি মানুষ, বাপু। কত গল্প হল। আমাদের কোচোয়ানটা তো চেনে ও'দের। সে-ই আলাপ করিয়ে দিলে।

অবাক্ হয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, এইখান থেকে অতদূর গিয়েছিলে ভাগবত শুনতে!

—দূরে আর কি, খোকা! গাড়িতে গিয়েছিলাম, গাড়িতে এসেছি। বৌমাকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

প্রণব এর কিছুই জানে না।

জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে বেটাছেলেরা যায় না?

—কত! আর যা সুন্দর পাঠ হল!

—আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। সেখানে কত বেটাছেলে গিয়েছিল। তাদের চেন না, কেমন লোক তাও জান না। তাতে দোষ নেই। আর যে-বরদা আমার বন্ধু, যাকে খুব ভালো করে চিনি-জানি, তার সামনে ওর বেরনো দোষের! শাস্ত্রের নিষেধ আছে!

তরঙ্গিণী আবার রেগে গেলেন।

বললেন, কী বাজে বকিস, খোকা! সে হল দেবালয়। সেখানে আবার দোষ আছে?

—না। যত দোষ ভদ্রলোকের বাড়িতে। আমার তো মনে হয় যত জঞ্জাল জমে আছে এই দেবালয়গুলোতেই। ইচ্ছে করে, কালাপাহাড়ের মতো এইগুলোকেই সব আগে দিই গুঁড়িয়ে!

—খোকা!

তরঙ্গিণী চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সৌদামিনী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে মায়ে-ছেলের তর্ক শুনছিল। তরঙ্গিণীর চিৎকারে তার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল। শাশুড়ীকে এমন রাগতে, এমন করে চিৎকার করতে সে কখনও দেখেনি।

প্রণবও থমকে গেল।

তার মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার একটা কথা। ও তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ছেলেমহলে তখন একটা নাস্তিকতার ঢেউ এসেছে। ওকেও স্পর্শ করেছে সেই ঢেউ। নবলব্ধ বিদ্যার ঝাপটা দিয়ে ওর অশিক্ষিতা জননীকে সেদিনও এমনি করে আঘাত করতে গিয়েছিল।

বলেছিল, ভগবান মিথ্যা, ভগবান নেই। বলেছিল, তরঙ্গিণীর

ঠাকুরঘরে পটে-বাঁধানো ওই-যে রাধাকৃষ্ণের ছবি,—ওটা নিতান্তই পটুয়ার আঁকা ছবি, ভগবান নয়।

তরঙ্গিণী সেদিনও এমনি করে চিৎকার করে উঠেছিলেন। এমনি করে তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে এসেছিল। ভয়ে প্রণব সেদিনও পালিয়েছিল, আজও পালাল।

সৌদামিনী আস্তে আস্তে ওঁর কাছে এসে দাঁড়াল। তরঙ্গিণীর চোখের বিদ্যুৎ তখন মেঘে শ্যামল হয়ে এসেছে। আঁচলে চোখ মুছে ভারী গলায় তরঙ্গিণী সৌদামিনীকে বললেন, আজ শনিবারের বার-বেলায় যা বলতে নেই ছেলেটা তাই বলে গেল। লেখাপড়া শিখে যেন ভূত হচ্ছে!

ওঁর কথার ভঙ্গিতে ভয়ে সৌদামিনীর বুকের ভিতরটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে। বললে, কি হবে, মা!

ওর ভয় দেখে তরঙ্গিণী হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন ভয় কি, মা! ওর সব পাপ আমি নিলাম। এ ক'দিন আর কিছু খাব না। সামনের মঙ্গলবারে কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীকে পুজো দিয়ে আসব।

—আমিও যাব, মা।

—যেও।

—এ তিনদিন আমিও উপোস করে থাকব, মা।

তরঙ্গিণী হেসে ফেললেন, দূর পাগলী মেয়ে! তিনদিন উপোস করা কি সোজা কথা! তুমি ছেলেমানুষ, পারবে কেন?

কিন্তু সৌদামিনীও ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে, খুব পারব। আপনি দেখবেন, আমার কিছু কষ্ট হবে না।

গর্বিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তরঙ্গিণী ওর দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, হ্যাঁ মা, তুমি পারবে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার তো এখন উপোস করা চলবে না, মা। নইলে, এ তো তোমারও কাজ। তোমাকে আমি বাধা দিতাম না।

শাশুড়ীর কথার ইঙ্গিতে সৌদামিনী লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে রইল। তার ইচ্ছা ছিল, শাশুড়ীর সঙ্গে এই উপবাসটা সে করে। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিঃসন্দেহে শাশুড়ী তাকে কিছুতেই উপবাস করতে দেবেন না।

ওর ক্লিষ্টমুখের দিকে চেয়ে তরঙ্গিণী সান্ত্বনা দিলেন, কিচ্ছু ভয়

পেও না, মা। আমি প্রাশ্চিত্যি করলেই তোমাদের সবারই করা হবে। তুমি সীতারামকে একবার ডাকো তো, মা। একবার বাজারে যাবে।

সৌদামিনী উঠে গেল।

বিকেলে সুচরিতাদের ওখানে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মনটা প্রণবের এমনই খারাপ হয়ে গেল যে, সুচরিতা এবং টেনিস কোনোটাই তাকে টানতে পারলে না।

একা-একা গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। ভালো লাগল না। ফোর্টের পিছনে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। নির্জন তীর। গঙ্গার জলে আধখানায় সূর্যাস্তের সোনা, আধখানায় আসন্ন সন্ধ্যার সীসা। তাইতে দুলছে ক'টি যূথভ্রষ্ট নৌকা।

সেইখানে প্রণব অনেকক্ষণ বসে রইল।

কিন্তু সেও বেশিক্ষণ ভালো লাগল না। মনে পড়ল সুচরিতাকে। বেচারা নিশ্চয় অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে-করে এখন তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওখানে যাবে বলে না-যাওয়া কোনোদিন হয়নি। হয়তো ও ভাবছে, প্রণবের অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? হয়তো খবরটা নেওয়ার জন্যে বরদার উপর চাপ দিচ্ছে।

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে না। খালি মনে পড়ছে মায়ের সেই প্রদীপ্ত ভঙ্গী, সেই বিরক্তি ও আশঙ্কায় রুক্ষ দুটি চোখ। সেখানে এখনই ফিরে যাওয়া যায় না।

কিন্তু এখানে এই নির্জন নদীতীরেই বা একলা কতক্ষণ কাটাবে?

প্রণব উঠল। ধীরে ধীরে গড়ের মাঠ পার হয়ে চৌরঙ্গিতে এসে পড়ল এবং ট্রামে চড়ে বসল। তারপর কখন একসময় সুচরিতাদের ফটকের ভিতর ঢুকে পড়ল নিজেই টের পেল না।

সুচরিতা তার নীচের পড়বার ঘরে এসে ভাবছিল পড়তে বসবে, না গান গাইবে। বরদা প্রণবের খবর নিতে যেতে রাজী হয়নি। মনটা তার সেজন্যে একটু চঞ্চল হয়ে ছিল। তার মনে কি-যেন একটা সুর গুনগুন করছিল। কথা নয়, শুধু সুর। সেই সুরও খুব স্পষ্ট নয়। যেন অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া একটা সুর।

এমন সময় সামনের বাগানের কাঁকর-বিছানো রাস্তায় অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে চাইতেই দেখলে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে প্রণব হনহন করে এদিকে আসছে।

ছুটে বেরিয়ে এল সুচরিতা। মেশিনগানের গুলীর মতো একঝাঁক প্রশ্ন বেরিয়ে এল তার গলা থেকেঃ টেনিস খেলতে আসেননি কেন? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? অমন করে চেয়ে আছেন কেন? শরীর ভালো আছে তো? বাড়িতে অন্য কারও অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।

ভিতরেই আসছিল। হঠাৎ প্রণব বললে, ঘরের মধ্যে আলোয় নয়, সু। আলো সহ্য করতে পারছি না। বরদা কোথায়?

—ওপরে। ডাকব?

—আসবে এখন। চল 'লনে' গিয়ে বসিগে।

উপরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েনি এমন একটা প্রান্তে ওরা দুজনে বসল।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু চায়ের কথা বলে আসিগে দাঁড়ান।

সুচরিতা উঠছিল। প্রণব ওর হাত ধরে বসিয়ে বললে, কিচ্ছু দরকার নেই সু। তুমি বোসো, একটু গল্প কর। আমা রমনটা ভালো নেই আজ।

—কেন? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছেন?

—না, না। তার সঙ্গে ঝগড়ার সুযোগই কম।

—সুযোগ কম কেন?

—কারণ সমস্ত দিন দুজনে দেখাই হয় না।

—সে আবার কি।

—তাই। রাত্রে আমি যখন শুতে যাই তাকে ঘুমন্ত দেখি, খুব ভোরে সে যখন উঠে যায় আমাকে ঘুমন্ত দেখেই যায়।

সুচরিতা খিলখিল করে হেসে ফেললে। বললে, আশ্চর্য কথা! জাগ্রত অবস্থায় কেউ কাউকে দেখেন নি?

—প্রায় সেই রকমই। যেন লুকোচুরি খেলা চলছে।

প্রণবও হাসলে। বললে ,সব কথা শুনলে তুমি হাসবে, সু। সব তুমি বুঝতেও পারবে না।

—বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারব না?—সুচরিতার সুরে কৌতূহল।

—না। তার কারণ যে-বাড়িতে যে-সমাজে ও মানুষ হয়েছে, সে-বাড়ি এবং সে-সমাজ তুমি কখনও দেখনি।

—সেটা কী সমাজ?

—প্রাচীন হিন্দুসমাজ।

—আমরাও কি হিন্দুসমাজের নই?

—তোমরা আধুনিক। হিন্দু সমাজের, প্রাচীন সমাজের নও।

—সে-সমাজ কি এ-সমাজের থেকে আলাদা?

—মনের দিক দিয়ে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে অনেকখানি আলাদা।

—যেমন?

যেমন তোমার দাদার সঙ্গে তোমার বৌদির রাত্রি দশটার আগে দেখা হবে না; এ তুমি ভাবতে পারো?

—সর্বনাশ! কিন্তু আপনাদের এ-বাড়িটা তো আর সে-সমাজের মধ্যে নয়। এখানে প্রাচীন নিয়ম চলবে কেন?

—কারণ মা রয়েছেন। তাঁর ঠাকুরঘরে রাধাকৃষ্ণ রয়েছেন। তা ছাড়া সদু নিজেই রয়েছে।

সুচরিতা সবিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপরে হঠাৎ একসময় মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বললে, সব বাজে! আমাকে ঠকাবার জন্য এই গল্প ফেঁদেছেন!

—তোমার দোষ নেই। গল্প বলেই মনে হয়। অথচ সত্যি।

সুচরিতা তেমনি করে বললে, কক্ষনো সত্যি নয়। সত্যি হতেই পারে না। এ আপনারই দুষ্টুমি। আমি হলে দুদিনে সব দুষ্টুমি বের করে দিতাম।

প্রণব যেন চমকে উঠল। ধীরে ধীরে বললে, তুমি হলে......হ্যাঁ তুমি হলে......কিন্তু তুমি তো হলে না, সদু।

সুচরিতার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একবার দুলেই ফের স্থির হয়ে গেল। তার মাথার উপর তারায়-ভরা নীল আকাশ। আর পাশে একটি রজনীগন্ধার ঝাড় মন্দ মন্দ হাওয়ায় দুলছে।

সুচরিতা বললে, চলুন ঘরের মধ্যে গিয়ে বসা যাক। দাদাকেও খবর দিই। আর, চা একটু খাবেন না।

—না সদু, ধন্যবাদ।

তারপর রিস্টওয়াচটা দেখে বললে, এঃ। দশটা বাজে। এইবার ফিরতে হবে। আর ঘরে যাব না।

—দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—আজ থাক। অনর্থক দেরি হয়ে যাবে।

—তাই বলে এখানে এসে, এতক্ষণ কাটিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া ভালো দেখাবে?

প্রণব ডান হাতখানা ওর কাঁধের উপর রেখে বলল, ভালো নয় মন্দ নয়,—ভালোমন্দের অতীত কোনো লোকের খবর,—আজ নয়, যখন আরও বড় হবে, আরও বুঝতে শিখবে তখন—যদি পাও আমাকে জানিও। এটা ভালো নয়, ওটা মন্দ, এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। সংসারে সমাজ আছে. সদু আছে, মা আছেন, তাঁর রাধাকৃষ্ণ আছেন,—তারই আড়ালে দুটি-একটি দুঃখ মানুষের শীর্ণ কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ক্বচিৎ-কখনও শুনতে পাই। তার বেশি কি কোনো দিনই পাওয়া যাবে না?

প্রণব আর দাঁড়াল না। যেমন হনহন করে এসেছিল, তেমনি হনহন করে চলে গেল।

বিকালবেলা প্রসন্নবাবু প্রণবকে তাঁর অফিস-ঘরে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে একখানা চিঠি।

বললেন, তোমার শ্বশুরবাড়ির গুরুদেব ন্যায়পঞ্চানন মশাইকে মনে আছে? বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তিনি। শুধু পণ্ডিতই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রণবের ঠিক মনে পড়ে না। বিশেষ, সকালেই প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতের প্রসঙ্গে তার মন খুব খুশি হল না। সে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল।

প্রসন্নবাবু বললেন, তোমার বিলেত যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে পল্লী-সমাজে খুব ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে। বেয়াইমশাইরা খুব বিপন্ন এবং বিব্রত। তোমাকে বোধহয় বলা হয়নি, আমাদের দীক্ষার সময় নিমন্ত্রণ পেয়ে ন্যায়-পঞ্চানন মশাই এবং তোমার শ্বশুর দুজনেই এসেছিলেন। আমি তাঁদের এখানে আহারের জন্যে বলিনি. পাছে তাঁরা বিব্রত হন।

প্রসন্নবাবু প্রণবের দিকে চাইলেন।

আবার সেই খাওয়া-ছোঁয়ার প্রশ্ন! প্রণব রিস্টওয়াচটা খুলে এই অবসরে দম দিতে লাগল।

প্রসন্নবাবু বলতে লাগলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো দুটো-একটা উপলক্ষ্যের নয়। আমাদের জন্যে তাঁরা যদি সা[illegible]ভাবে বিপন্ন কিংবা বিব্রত হয়ে থাকেন, তাঁদেরকে আমাদের রক্ষা করা উচিত নয় কি?

এতক্ষণে প্রণব উত্তর দিলে, কিন্তু এতদূর থেকে কিভাবে আমরা

তাঁদের রক্ষা করতে পারি? তাঁরা ধনী, সেখানকার জমিদার, সুতরাং যথেষ্ট প্রভাবশালী। আমাদের কাছ থেকে কি সাহায্যই বা তাঁরা প্রত্যাশা করতে পারেন?

প্রসন্নবাবু হাসলেন। বললেন, না, টাকাপয়সা লোকজন নিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে না। বলেছি তো, তাঁরা সামাজিকভাবে বিপন্ন।

বিপদের পরিমাণটা জানবার জন্যে প্রণব নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে রইল।

প্রসন্নবাবু যেন আপন মনেই বলতে লাগলেনঃ

আমাদের দীক্ষার সময়ে তাঁরা এলেন, কিন্তু এ বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করতে পারলেন না সমাজের ভয়ে। কাল তাঁর ছোট মেয়েটির বিয়ে হবে, বৌমা কিংবা তুমি যেতে পারবে না। কিন্তু সেও তো পরের কথা। আপাতত বৌমার সন্তান হবে। প্রথম সন্তান। প্রসূতির এসময় মায়ের কাছে থাকা খুবই দরকার। কিন্তু......

প্রসন্নবাবু চুপ করলেন।

প্রণব বললে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কি করতে পারি বলুন?

প্রসন্নবাবু বললেন, ন্যায়পঞ্চানন মশাই লিখেছেন প্রায়শ্চিত্তের কথা। সমাজপতিদের মত তিনি আদায় করেছেন।

আবার প্রায়শ্চিত্ত!

প্রণব দেবমন্দিরগুলো ভেঙে দেবার হুমকি দিয়েছিল। উপরে মা তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন,—তিনদিন নিরম্বু উপবাস। আবার প্রায়শ্চিত্ত?

শান্তকণ্ঠে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, আমার অপরাধ কি? কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

প্রসন্নবাবু বললেন, সমাজের বিধি লঙ্ঘনের অপরাধ। কিন্তু সে প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক। আমরা সমাজবন্ধ জীব। ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার অন্য লোকে করবে। আমরা যে-পথে বাধা সবচেয়ে কম, সেই পথটাই বেছে নিই। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গত কি অসঙ্গত সে প্রশ্ন না তুলেই আমাদের তাতে রাজী হয়ে যেতে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না।

উপেক্ষাভরে হেসে প্রণব বললে, তাতেই আমাদের সমাজ বেঁচে যাবে?

—বলেছি তো সে বিবেচনার ভার আমাদের উপর নয়। তার জন্যে বড় বড় পণ্ডিতেরা আছেন, সমাজপতিরা আছেন।

তেমনি করে হেসে প্রণব বললে, আমাদের উপর শুধু যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবার ভার!

অবিচলিতভাবে প্রসন্নবাবু বললেন, হ্যাঁ।

প্রণব নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রসন্নবাবু বললেন ন্যায়পঞ্চানন মশাইকে চিঠির জবাবটা দিতে হবে। তুমি কি ভাববার জন্যে সময় চাও?

প্রণবের বুকের ভিতর একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে বললে, না, সময়ে আর কি দরকার! আপনি কি আদেশ করেন বলুন।

—কোনো আদেশ করি না, খোকা। আমার কোনো আদেশ নেই। —প্রসন্নবাবু ব্যস্তভাবে উত্তর দিলেন।

প্রণবের ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা বিদ্যুচ্চমকের মতো মিলিয়ে গেল। বললে, কিন্তু আপনি তো প্রায়শ্চিত্তের পক্ষে?

—হাঁ। আমি প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করি বলে নয়, শান্তি ফিরে পাবার এইটেই সহজ পথ বলে।

—বেশ। আপনাদের সকলের যদি তাই মত হয়, তা হলে তাই হোক।

—তা হলে ন্যায়পঞ্চানন মশাইকে সেই কথাই লিখে দিই?

—দিন। কি করতে হবে আমাকে?

—তা তো বলতে পারব না। যাগ-যজ্ঞ কিছু হবে বোধ করি।

—মস্তক-মুণ্ডন কিংবা......

প্রসন্নবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন,—না, না। নিশ্চিন্ত থাক। সেরকম কিছু হবে না। আর প্রসন্নবাবুর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হাসির রেখা খেলে গেল,—শাস্ত্রে সেরকম কিছু থাকলে তারও বিকল্প ব্যবস্থা আছে।

—কী ব্যবস্থা?

—চুলের মূল্য ধরে দিলেই ফুরিয়ে যাবে।

কলকেটায় বোধ হয় আর আগুন ছিল না। গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রেখে প্রসন্নবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

প্রণবের মাথায় আর যেন কিছু নিচ্ছে না। তরঙ্গিণীর কঠিন উপবাস তার মনের কবজাগুলো যেন শিথিল করে দিয়েছে। আর যেন তার কাজ

করবার শক্তি নেই। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে সে তার অফিস-ঘরে চলে এল।

অনশনের তৃতীয় রাত্রি। নীচে থেকে উপরে ওঠবার সময় সিঁড়িতেই প্রণব সৌদামিনীর গলা পেলে। তরঙ্গিণীর ঘরে মেঝের বসে সে সুর করে মহাভারত পড়ছিলঃ

"বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব ভাগ্যবলে।
কিন্তু সব নষ্ট হৈল নিজ কর্মফলে॥
কারে কি বলিব আমি, কি করিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি॥"

প্রণব ঘরে এসে দাঁড়াতেই সৌদামিনী একগলা ঘোমটা টেনে পড়া বন্ধ কর দিলে।

রাত্রি দশটা হবে। তরঙ্গিণী খাটে চোখ বন্ধ করে শুয়ে-শুয়ে পাঠ শুনছিলেন। সৌদামিনী পড়া বন্ধ করতেই চোখ মেলে প্রণবকে দেখে হাসলেন।

দুদিন প্রণব লজ্জায় এদিকে আসেনি। দুদিন প্রণবকে তিনি দেখেননি। তরঙ্গিণী হাসলেন, অপূর্ব সে হাসি। মুখখানি উপবাসে কৃশ। তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো শীর্ণ হাসি। চাঁদের মতোই সুধায় ভরা।

বললেন, বৌমা, খোকার খাবার জায়গা এই ঘরের মেঝেয় করে দাও।

প্রণব বললে, বাইরে থেকে আমি খেয়ে এসেছি, মা। আমার খাবার ইচ্ছে নেই।

গত দুদিন ধরে প্রণব খাচ্ছে না। দুপুরে একবার বসতে হয়, বসে। রাত্রে বাইরে থেকে খাওয়ার অজুহাতে না-খেয়েই থাকে। তরঙ্গিণীর কানে গেছে সে কথা।

বললেন, জানি। দুদিন ধরেই তোমার ক্ষিধে নেই, বাইরে থেকে খেয়ে আসছ। দুষ্টুমি না করে খেতে বোসো।

কী শীর্ণ তরঙ্গিণীর কণ্ঠস্বর! কিন্তু স্পষ্ট, কোথাও জড়তা নেই।

শান্ত ছেলের মতো প্রণব খেতে বসল। মায়ের চোখের সামনে তাকে পেট ভরেই খেতে হল। নিঃশব্দে খেয়ে উঠে নিজের ঘরে শুতে গেল।

একটু পরে সৌদামিনী পান দিতে এল। বললে, আমি আজকে মায়ের ঘরেই শোব।

—কেন?

একটু দ্বিধা করে সৌদামিনী বললে, এমনিতে বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু নাড়ীটা ওঁর দুর্বল। রাত্রে একজন কাছে থাকা ভালো। হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয়।

—তাই শোওগে। দরকার মনে করলে আমাকেও ডেক।

একটু থেমে সৌদামিনী বললে, একটা কথায় কী কাণ্ড বাধালে বল তো?

প্রণব প্রথমে লজ্জিতভাবে বললে, হুঁ।

তারপরে বললে, কিন্তু এ বোধ হয় ভালোই হল, সদু।

—কেন?

—মাঝে মাঝে অল্প অসুখ-বিসুখ শুনেছি ভালো। সেই সুযোগে ডাক্তার এসে গোটা শরীরটা দেখে যেতে পারেন। তাতে করে কোনো কোণে কোনো বড় রোগ গোপনে বাসা বাঁধার সুযোগ পায় না।

সৌদামিনী কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে। বললে, তার মানে তুমি বলতে চাও, যার মনে আরও যা বড় পাপ আছে, এই সুযোগেও তাও ধরা পড়ে যেতে পারে?

—পারেই তো— উপবাসটাই মা করছেন। কিন্তুর প্রায়শ্চিত্ত তো আমাদের সবারই আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্তত আমার তো আরম্ভ হয়ে গেছেই।

অবাক হয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার আবার কি বড় পাপ?

—সদু, পাপের কি কোনো বিশেষ একটা চেহারা আছে? কারও বা ধোপদুরস্ত পাপ, কারও বা ময়লা। আবার তুমি যাকে পুণ্য মনে কর, আমি হয়তো তাকে পাপ মনে করি; আমি যাকে পুণ্য মনে করি, তুমি হয়তো তাকেই পাপ মনে কর।

সৌদামিনী অবাক্ হয়ে গেল। অন্য সময় হলে এ কথায় হয়তো তার হাসি আর থামাতে চাইত না। কিন্তু ও-ঘরে মা উপবাসী। হাসির সময় এখন নয়।

তাই বললে, তাই আবার হয় নাকি! পাপ যা তা সবারই কাছে পাপ, পুণ্য পুণ্য।

প্রণব হেসে বললে, সত্যযুগের মানুষের সময় তাই ছিল বটে। কিন্তু এটা তো আর সত্যযুগ নয়। এই লম্বা সময়ের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিতে অনেক গিঁট পড়েছে। এখন আর জিনিসটা অত সোজা নেই। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে সকলের বোধও এখন একরকম নয়, বিচারও তার একরকম হয় না।

সৌদামিনী অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন অনেক কথা এই সময়টুকুর মধ্যে ভাববার চেষ্টা করলে।

বললে, তোমার কথা শুনি যখন, ভারী মিষ্টি লাগে। তারপরে যখন নিরিবিলি ভাবতে বসি, বুঝতে পারিনা তুমি ঠাট্টা করলে, না সত্যি বললে।

—তোমার মেমসাহেব আসছেন?—প্রণব জিজ্ঞাসা করলে।

—এই দুদিন আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।

—আরও কিছুদিন তোমার মেমসাহেব আসুন, আরও খানকয়েক ইংরিজি বই পড়, তখন বুঝবে আমি ঠাট্টা করিনি।

এবারে সৌদামিনী কড়া সুরে বললে, কিন্তু এও তো বাপু অন্যায়! ইংরিজি বই না পড়লে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বোঝা যাবে না?

—যাবে, কিন্তু অন্য রকম করে। ইংরেজদের একটা কি সুবিধা জানো, জাত হিসাবে ওরা খুব ভক্তিমার্গের নয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বিচারে ভক্তির চেয়ে বুদ্ধিটাকেই ওরা ব্যবহার করে। আমরা ব্যবহার করি ভক্তিটাকে। কাজেই আমাদের বুঝের সঙ্গে ওদের বুঝ সব জায়গায় মেলে না।

—তাই তোমার সঙ্গেও আমাদের মিলছে না? কিন্তু বাবাও তো অনেক ইংরিজি পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে তো মেলে।

প্রণব হাসলে। বললে, কি জানি। আমার সন্দেহ আছে, চুপ করে থেকে উনি মিলিয়ে নেন।

একটু চুপ করে থেকে সৌদামিনী বললে, মেমটাকে কাল আমি ছাড়িয়ে দোব জান?

প্রণব চমকে উঠলঃ সে ভদ্রমহিলার অপরাধ?

—অপরাধ কিছু নেই। আমাদের ঠাকুরমশাই বলেন, মানুষের বুদ্ধির একটা সীমা আছে। সব কিছুই বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না। এমন অবস্থায় তার উপর নির্ভর করার চেয়ে ভক্তির উপর নির্ভর করাই সুবিধা।

হেসে প্রণব জবাব দিলে, নিশ্চয়ই সুবিধা। কিন্তু তোমাদের পক্ষে

নয়, সুবিধাটা ঠাকুরমশাইদের পক্ষে। বুদ্ধির সীমা আছে বললে? সত্যি কথা। সেজন্যে তার ভুলেরও সীমা আছে। কিন্তু ভক্তির নিজেরও যেমন কোনো সীমা নেই, তার ভুলেরও না। ঠাকুরমশাইদের।

—আচ্ছা থাক। তুমি আবার সেইরকম কথা আরম্ভ করলে। আমি চললাম। আলোটা কি জ্বলবে?

প্রণব আবার হাসলে। বললে, আমার ঘরের আলো জ্বলবে সদু, ওকে জ্বলতে দাও।

আবার সেই হেঁয়ালি। হেঁয়ালি সৌদামিনী বুঝতেও পারে না, সইতেও পারে না।

বললে, জ্বলুক তাহলে।

ব'লেই সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট করেই প্রণব সিনিয়রের বাড়ি বেরিয়ে গেল।

পুরোহিত মহাশয়ের আসতে একটু দেরিই হল। তিনি আসতেই সৌদামিনী, একজন ঝি এবং আরও দুজন চাকর নিয়ে তরঙ্গিণী গাড়ি করে কালীঘাট যাত্রা করলেন। তখন তাঁর নাড়ী একটু দুর্বল বটে, কিন্তু মন বেশ সবলই রয়েছে। নিজেই সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গাড়িতে উঠলেন। গঙ্গার ঘাটে নিজেই গাড়ি থেকে নেমে স্নান করে এলেন এবং মায়ের মন্দিরেও চমৎকার হেঁটে গিয়ে পুজা দিয়ে এলেন।

পুজার শেষেও একফোঁটা চরণামৃত ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। সৌদামিনীর ইচ্ছা ছিল, তরঙ্গিণীকে একটু সরবৎ খাইয়ে গাড়িতে তোলে। কিন্তু তরঙ্গিণী কিছুতেই রাজী হলেন না। বাড়ির বাইরে পাঁচজনের ছোঁয়া-নাড়া আহার্য-পানীয়ে তাঁর বরাবরই বিতৃষ্ণা।

বললেন, আর তো কিছু নয়. মা। খালি শরীরটা ভীষণ হালকা বোধ হচ্ছে। একটু হাওয়াতেই টলে যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছু অসুবিধা নেই।

দেখা গেল, নিতান্ত মিথ্যা তিনি বলেননি।

বাড়ি ফিরে আধ গ্লাস মিছরির সরবৎ খেয়ে তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ শুয়ে রইলেন। ঘণ্টাখানেকও নয় বোধ করি। প্রণব যখন খেতে বসল,

প্রতিদিনকার মতো তিনি তার খাওয়ার সামনে বসে। মুখে প্রতিদিনকার তেমনি মিষ্টি হাসি।

—তোমার দুর্বল বোধ হচ্ছে না তো, মা?—ভয়ে ভয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে।

—শোনো ছেলের কথা! উপোসে মেয়েদের কি কিছু হয় রে! কিছুই হয় না। বার-ব্রত আমাদের তো লেগেই আছে। কষ্ট হলে কি পারতাম!

প্রসন্নবাবুও পাশেই খেতে বসেছিলেন। অনশনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথাও তিনি বলেননি। এখন তরঙ্গিণীকে অনেকটা সুস্থ দেখে পরিহাসের প্রলোভন সামলাতে পারলেন না।

বললেন, আমি তো বাড়ি বসে প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, এখনই লোক আসবে খবর দিতে যে, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

তরঙ্গিণী হেসে বললেন, সে ভাগ্যি কি করেছি! তোমাকে রেখে, ছেলে ছেলের বৌকে রেখে যেদিন যাব, সে তা আমার সুখের দিন।

প্রসন্নবাবু বললেন, যাই বল, তোমার নাড়ীর অবস্থা দেখে ডাক্তারের মুখের ভঙ্গী যেমন হল, তাতে মনে-মনে আমি ভয়ই পেয়েছিলাম।

তরঙ্গিণী আবার হেসে উঠলেন। বললেন, দেখ তোমার ওই ডাক্তারের কথা আর আমাকে বোল না। ওরা কিছু জানে না। মানুষে যে শুধু নাড়ীর জোরে বেঁচে নেই, এইটেই ওরা বোঝে না। আমার তো কিছু ভয় হয়নি। ডাক্তারে যখন বললে, ও'কে বিছানা থেকে উঠতে দেবে না, আমি তো হেসেই বাঁচি না!

প্রণব বললে, কিন্তু সত্যিই যদি তোমার একটা কিছু হত, মা!

ওর ভীত মুখের দিকে চেয়ে তরঙ্গিণী খুব কৌতুক বোধ করলেন। বললেন, হলই বা রে! ওইখান থেকে ওইটুকু ক্যাওড়াতলা, তোরা আমাকে কাঁধে করে ফেলে দিয়ে আসতে পারতিস না?

প্রণব হাসতে পারলে না। বললে, চিরজীবন এ খেদ আমার রয়ে যেত যে, তোমাকে আমি মেরে ফেললাম।

প্রসন্নবাবু বললেন, কাঁকড়া তার বাচ্চাগুলোকে বুকের মধ্যে রাখে, যতদিন না বেরবার মতো বড় হয়। সেইখানে থেকে তারা মায়ের রক্ত-মাংস কুরে কুরে খেয়ে বড় হয়। তারপর একদিন দেখা যায়, মা'টা মারা গেছে। গায়ের শক্ত খোলাটা ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট নেই।

সেই শুকনো খোলা থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চাগুলো আনন্দে নৃত্য করছে। খোকা, কাঁকড়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত স্থূল ব'লে আমাদের চোখে পড়ে, মানুষেরটা আর চোখে পড়ে না।

প্রণবের হাতের গ্রাসটা মধ্যপথেই থেমে গেল। বললে, আপনি বলছেন মানবশিশুও অমনি করে তার মাকে মেরে ফেলে?

—অবিকল। শুধু অমনি স্থূলভাবে নয়। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে উনি মরতে চলেছিলেন, এটা চোখে পড়বার মতো বড়। কিন্তু প্রতিদিন তোর জন্যে তিল তিল করে উনি যে জীবন দিচ্ছেন, সে তো চোখে পড়ার নয়।

উদ্যত গ্রাসটা মুখের মধ্যে পুরে নিরুত্তরে প্রণব কি যেন ভাবতে লাগল।

তরঙ্গিণীর অনশন প্রণবের মনের উপর প্রকাণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে। সে স্থির করলে, শুধু তরঙ্গিণীর সঙ্গেই নয়, এ বাড়িতেই আর ধর্ম কিংবা সমাজ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নয়। করার কোনো আবশ্যকও নেই। এ বাড়ির কেউ তো তার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। নিজের পথে অবাধে চলবার স্বাধীনতা যখন তার রয়েছে, তখন অকারণে অন্যের পথ মাড়াবার আবশ্যক কি?

কিন্তু এখন থেকে তরঙ্গিণী সম্বন্ধে তার মনে একটা নিদারুণ ভয়ের উদ্রেক হল। তিনি বুদ্ধি দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করেন না। তর্ক করে কাউকে দলে আনতে চান না। তর্ক করে তাঁকে দলে আনাও যায় না। অথচ তাঁর একান্ত আপনজনের বাক্যে অথবা আচরণে যখনই মনে হবে ধর্ম ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তখনই প্রায়োপবেশন করবেন। এও তো বড় ভয়ঙ্কর কথা!

প্রায়শ্চিত্তে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মাকে সে ভালোবাসে এবং মায়ের অনশনে ভয় পেয়ে গেছে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করলে। ন্যায়পঞ্চানন মশাই স্বয়ং এবং শিবশঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত-সভায় উপস্থিত রইলেন। চুলের মূল্য ধরে দেওয়া হল। সুতরাং প্রণবের হাইকোর্ট যাওয়ার কোনো অসুবিধা হল না। এ-কথাটা লজ্জায় বন্ধুমহলে সে বলতেই পারলে না। চেপে গেল।

প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস প্রসন্নবাবুও হয়তো করেন না। তাঁর মতো

আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যাপারটা নিতান্তই একটা সুবিধাজনক সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু উভয় পক্ষের অন্য সকলেই এই শ্রেণীর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী। মোট কথা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই এতে খুশি হলেন।

ন্যায়পঞ্চানন এখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন করলেন। শিবশঙ্করের উপায় ছিল না। সৌদামিনীর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত বৈবাহিক-গৃহে তিনি অন্নগ্রহণ করতে পারেন না। সন্তান হবার জন্যে সৌদামিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার সময় তিনি বেয়াই-বেয়ানকে শাসিয়ে গেলেন. মা আনন্দময়ী যদি মুখ তুলে চান, তিনি নিজেই সৌদামিনীকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন এবং সেই সময় পরীক্ষা হবে তাঁরা কত খাওয়াতে পারেন।

কি একটা পর্বোপলক্ষ্যে সেদিন ছুটি ছিল। প্রণবকে কোর্টে যেতে হয়নি। সেদিন প্রথম সৌদামিনী দিনের বেলায় তার ঘরে এল এবং অনেকক্ষণ রইল।

মনটা তার ভারী।

বললে, সবাই সন্দেহ করে তুমি আমার ওপর রেগে আছ। কিন্তু আমি জানি তা সত্যি নয়।

প্রণব ওর একখানি হাত ধরে নিজের পাশে বসালে। জিজ্ঞাসা করলে, তাই নাকি! কি করে জানলে?

সগর্বে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সৌদামিনী বললে, জানি। তুমি বল না, সত্যি কিনা।

—সত্যি। আমার সম্বন্ধে যা তুমি জানবে, তাই সত্যি।

—কি করে? তোমাকে আমি ভুল বুঝতেও তো পারি।

—পার। কিন্তু তা হলেও সেই ভুলটাই সমস্ত সত্যের চেয়ে বড়।

সৌদামিনী অবাক্ হয়ে গেল। প্রণবের কথা অনেক সময়েই তার হেঁয়ালি মনে হয়।

বললে, সে আবার কি! ভুল কখনও সত্যির চেয়ে বড় হয়?

—হয়। ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হয়।

—কি করে?

—সে বুঝতে গেলে, আজ তো আর ট্রেন পাবে না, সদু। বাপের বাড়ি গিয়ে রাত্রে তেতলার ছাদে উঠে আকাশের শুকতারার দিকে চেয়ে হঠাৎ

যদি মনে হয়—ওটা তারা নয়, আমারই চোখ, তোমারই বিরহে ছলছল করছে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে।

সৌদামিনী একটু চিন্তা করে বললে, তারা দেখে আমার কখনও ওরকম মনে হয় না।

—এবারে হতে পারে। না হলে তুমি ফিরে এসো, তখন বুঝিয়ে দোব।

—তাই দিও।

—বাপের বাড়ি যেতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

—তা আবার হবে না? তবু মাঝে মাঝে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—কেন? উত্তর দাও। কেন বল?

সৌদামিনীকে বলতে হল, তোমার জন্যে।

এবং এইটে বলতেই তার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। তারপর মাথা তুলে বললে, দিনের বেলায় তোমার ঘরে আসি না., তোমার সঙ্গে গল্প করি না, তুমি কত রাগ কর। তুমি তো জান না, তোমার ঘরে না-এলেও তোমার কাছাকাছিই আমি থাকি। আমি চলে গেলে বুঝতে পারবে।

—এখনও পারি। কিন্তু খুব ভালো বুঝতে পারি না।

দুজনেই হেসে উঠল।

এবারে সৌদামিনীই ওর একখানা হাত চেপে ধরলে। বললে, তুমি কবে বর্ধমান যাচ্ছ বলো।

—খোকাকে দেখতে যাব।

সৌদামিনীর মুখ পলকের জন্যে রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা ঝেড়ে ফেলে বললে, তার আগে যাবে না?

—তুমি ডাকলেই যাব।

—আমি তো এখন থেকেই ডাকতে আরম্ভ করলাম। চল।

—তোমার সঙ্গে? গাড়ু-গামছা নিয়ে?

—হ্যাঁ।

বাইরে কার যেন পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি উঠে প্রণবের পায়ের ধুলো নিলে।

প্রণব বাধা দিয়ে বললে, ও আবার কি হচ্ছে?

পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সৌদামিনী বললে, ওই তো আমাদের

সম্বল গো। সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া আর তোমাদের পায়ের ধুলো।

তারপর ব্যস্তভাবে বললে, কে বোধ হয় ডাকতে এসে ফিরে গেল। কী লজ্জা। তুমি কিন্তু যেতে দেরি কোর না, বুঝলে?

দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে তখনই আবার সে ফিরে এল। বললে, আমার কেন-যেন ভয় করছে, জানো?

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

—না, ভয় কি? ভয় কিসের?

—কি জানি কিসের। বাবার মুখের সেই কাঁকড়ার গল্পটা কিছুতে ভুলতে পারছি না। যাই হোক, তুমি কিন্তু যেতে দেরি কোর না।

আবার একবার প্রণবের পায়ের ধুলো নিয়ে চোখের জল মুছে সৌদামিনী চলে গেল।

সৌদামিনী চলে যাওয়ার পরে দুটো তত্ত্ব প্রণবের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথম, সৌদামিনী সত্যই সব সময় তার কাছে কাছে ছিল; দ্বিতীয়, সুচরিতার উপর তার যে আকর্ষণ সেটা অহেতুক নয়। সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথম তত্ত্ব পরিষ্কার হল সহজেই। দেখলে, তার কোর্টে যাওয়ার পোশাক এখন আর ঠিক ধোপ-দুরস্ত থাকে না। শার্ট, কোট এবং ট্রাউজারের ভাঁজ ভেঙে যাচ্ছে। ভুলে খালি সিগারেটের টিন পকেটে করে নিয়ে গিয়ে মুশকিলে পড়ে। সকালের দ্বিতীয় পেয়ালা চা-টা সব দিন আসে না। নিয়মিতভাবে জুতোয় কালিও পড়ে না। দুপুরের টিফিনটাও যেন একঘেয়ে হচ্ছে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটা এত সহজে বোঝা গেল না। বিকেল হলেই সুচরিতা তাকে টানে। প্রণব মনকে প্রবোধ দেয়, ওটা সুচরিতার জন্যে নয়, টেনিস খেলার জন্যে। কিন্তু যখন দেখলে সুচরিতার আসন্ন পরীক্ষার সামনে টেনিস খেলা বন্ধ থাকলেও টান একটা বাজছে এবং তার আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের সামনে ভাসছে টেনিস-বল নয়, সুচরিতার মুখখানি এবং পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও বোসেদের টেনিস-লন তাকে টানতে পারছে না, তখন মনে হল এই টানটা অহেতুক নয়। এর সম্বন্ধে সতর্ক হবার সময় এসেছে।

কিন্তু কি সতর্ক হবে সে? কি সতর্ক হতে পারে? সে সুচরিতাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু কী অজুহাতে ছেড়ে দেবে? বন্ধুর বাড়ি, যেখানে ঘন ঘন তার যাতায়াত, সুচরিতা ছাড়াও যেখানে আরও অনেকে আছে, যাদের সঙ্গে তার মনের বন্ধন পড়েছে—তাদের সে ছাড়বে কি বলে? তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে না?

জাগুক। প্রণব নিজেকে শক্ত করলে। সে-সব প্রশ্নের জবাব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবেই। না পাওয়া যায়, না যাবে। কিন্তু সুচরিতাদের বাড়ি আর নয়।

এক মাসেরও উপর সে সুচরিতাদের বাড়ি গেল না।

তখন সবে শীতের আমেজ পড়েছে। সেদিনটা কিসের যেন ছুটি। সকালে সিনিয়রের বাড়িও যাবার নেই। প্রণব সকালবেলায় খবরের কাগজ পড়ছে। এমন সময় একখানা গাড়ি এসে ওদের বাড়ির গেটে থামল। আর তার থেকে কলরব করতে করতে নেমে এল সুচরিতা ও বরদা।

ওর হাত থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নিয়ে সুচরিতা বললে, চলুন।

—কোথায়?

—বোটানিক্সে।

—সেখানে কি?

—পিকনিক।

—তার মানে?

বরদা মানেটা বুঝিয়ে দিলেঃ সুচরিতার টেস্ট-পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। মা ওকে ক'টা টাকা দিয়েছেন পিকনিকের জন্যে। এবং যেহেতু আমাদের আজ কোর্ট নেই, সেহেতু আমাদেরও ওর সঙ্গে যেতে হবে।

প্রণব হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে তুমি এবারে এণ্ট্রান্স দিচ্ছ, এ-কথা এখন বলা চলে?

—না। এখনও না।—সুচরিতা জবাব দিলে,—টেস্টের ফল না-বেরনো পর্যন্ত নয়। চলুন, উঠুন। আমাদের আবার মার্কেট হয়ে যেতে হবে।

—সর্বনাশ!—কপালে চোখ তুলে প্রণব বললে,—রাঁধছেন কে?

—আমি।—সগর্বে সুচরিতা জবাব দিলে।

বরদা সঙ্গে সঙ্গে বললে, কিন্তু মা সঙ্গে এত ফল আর মিষ্টি দিয়েছেন যে, তুমি নির্ভয়ে আসতে পার।

ঘাড় বেঁকিয়ে তীক্ষ্ন কণ্ঠে সুচরিতা বললে, তার মানেটা কি হল? আমি রাঁধতে জানি না, আমার রান্না মুখে দেওয়া যাবে না—এই তো?

বরদা সবিনয়ে বললে, তা জানি না। তবে, আমার অবশ্য নয়, কিন্তু প্রণবের মনে সেই প্রশ্নটাই উঠেছে। মুখে ওর একফোঁটা রক্ত নেই, দেখছিস না?

—দেখছি। তোমরা দুজনেই খুব সাধু!—তারপরেই প্রণবকে আবার একটা তাড়া দিলে,—নিন, উঠুন। 'The taste of the pudding is in the eating", খেয়ে বুঝবেন রাঁধতে পারি কিনা।

তাড়া খেয়ে প্রণব বিব্রতভাবে বললে, এই পোশাকে যাব?

—ক্ষতি কি! শ্বশুরবাড়ি তো আর যাচ্ছেন না!

—তা হলেও এই মর্নিং-গাউনটা।

—আচ্ছা, ওটা বদলে একটা চাদর গায়ে দিয়ে আসুন। তিন মিনিট সময় দিলাম।

অন্যরূপ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও প্রণবকে যেতে হল।

ওরা যখন খেতে বসল, সুচরিতা ওদের তাক লাগিয়ে দিলে। প্রত্যেকটি রান্না ভালো হয়েছে।

বরদা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোকে তো রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় কোনোদিন যেতে-দেখলাম না, সু। এমন রান্না শিখলি কোথায়?

—খাওয়া যাচ্ছে?

—চমৎকার হয়েছে!

সুচরিতা প্রণবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার অভিমত কি? বাড়ি গিয়ে নিন্দে করবেন তো?

—সে যদি করি তো স্বভাবের দোষে। সুচরিতা, তুমি কি বাড়ির মাপে রেঁধেছ, না বাইরের মাপে?

—বাড়ির আর বাইরের মাপ কি পৃথক?

—নিশ্চয়ই। বাইরে ক্ষিধে বাড়ে।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসেছিল। সামনে রান্নাগুলো সাজানো ছিল। যার যা প্রয়োজন, বাঁ হাতে করে চামচ দিয়ে তুলে নিচ্ছে।

সুচরিতা বললে, আপনার যত খুশি প্লেটে তুলে নিতে পারেন, যদিও জানি দুর্জনের স্বভাব বদলায় না। খাওয়ার পরে নিন্দে আপনি করবেনই।

হঠাৎ প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, সুচরিতা, চাকরটার রান্না খাইয়ে ব্রাহ্মণের জাত মারলে না তো? এবারে তাহলে আর মাকে বাঁচানো যাবে না।

—সে আবার কি?

প্রণব মায়ের অনশনের গল্পটা ওদের শুনিয়ে দিলে। শুনে ওরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আহারান্তে সুচরিতা বললে, সাহেবরা তো খাবার খেয়ে সারা সকাল দিব্যি ঘুরে বেড়ালেন, আর আমি বেচারি সমস্তক্ষণ হাঁড়ি ঠেললাম।

বরদা ঘাসের উপর মিষ্টি রোদে শুয়ে পড়ে বললে, এবার মেমসাহেব ঘুরে আসুন, সাহেবরা ঘাসে গড়াগড়ি দিক!

—বারে! আমি একা-একা কোথায় ঘুরব?

—'মুক'কে সঙ্গে নাও। ও গল্প করেছে বেশি, খেয়েছে কম, হয়তো পারবে তোর সঙ্গে ঘুরতে। আমার নড়বার ক্ষমতা নেই।

সুচরিতা প্রণবের দিকে চাইতেই সে বললে, কি আর দেখবে, সু। খালি গাছ!

—গাছই দেখব। উঠুন।

প্রণবকে উঠতে হল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে সুচরিতাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বললে, খেয়ে-দেয়ে বেশি ঘোরা যায় না। এইখানে একটু বসি আসুন।

বসার পরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এতদিন আমাদের বাড়ি আসেননি কেন বলুন তো?

—তোমার পরীক্ষার জন্যে।

—আমি কি চব্বিশ ঘণ্টাই পড়ি? আধ ঘণ্টা আপনার সঙ্গে গল্প করতে পারতাম না?

প্রণব চুপ করে রইল।

সুচরিতা ওকে ঠেলে দিলেঃ বলুন, কেন আসেন নি?

—সে একটা খুব আশ্চর্য কারণ। না-ই শুনলে।

—না, শুনব। বলুন।

—যদি সইতে না পার?

—তবু শুনব। দেখি সইতে পারি কিনা। বলুন।

—তা হলে শোন। আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে গেছেন।

—স্ত্রী-মাত্রেই মাঝে মাঝে গিয়ে থাকে। তার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে?

—আশ্চর্যটা তার মধ্যে নয়, পরে।

—তাহলে সেই পরের কথাটাই আগে বলুন।

—তিনি যাওয়ার পরে আবিষ্কার করলাম, তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। অথচ সে পথে বহু সামাজিক বাধা। সুতরাং সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। তাই যাইনি।

তার স্বীকৃতির দুঃসাহসী ঋজুতায় সুচরিতা মুহূর্ত কয়েক স্তম্ভিত হয়ে রইল। তার দৃষ্টি আটকে গেল ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথায়—যেখানে একফালি দুর্বল রোদ ঝলমল করছে, সেইখানে। কিন্তু পৃথিবী একটু দুলেই ফের স্থির হয়ে গেল।

সেইদিকে চেয়েই সুচরিতা বললে, কিন্তু তবু আপনাকে আসতে হল। বুঝলেন, যথেষ্ট সতর্ক কিছুতেই হওয়া যায় না?

—তোমার হাতের সুন্দর রান্নার বিনিময়ে তাও বুঝলাম।

সুচরিতার দৃষ্টি তখনও সেই ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথার উপরেই। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি।

কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করলে, এখন হয়তো আমার শেষ পরীক্ষার পড়া আরম্ভ হবে। তার পরেও তো আসবেন না?

—না আসাই তো বাঞ্ছনীয়, সু।

—কোনোদিনই তো আর আমাদের দেখা হবে না?

—না হওয়াই কি উচিত নয়?

সুচরিতা জবাব দিলে না। তার ঠোঁটের কোণে আবার একটা বাঁকা হাসি ঈষৎ ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল।

বললে, চলুন, ওঠা যাক এইবারে।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলে, পাস করতে পারলে কী পড়ব বলুন তো,—সায়েন্স না আর্টস?

প্রশ্ন শুনে প্রণব থমকে গেল। এতক্ষণ ধরে আড়চোখে সুচরিতাকে সে লক্ষ্য করে আসছিল। একটা হালকা মেঘ তার মুখের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে খেলে যাচ্ছিল। এর মধ্যে কখন তার মুখ সহজ হয়ে গেছে টের পায়নি। এমন সহজ একটা প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে বললে,—তোমার কোন্‌টা ভালো লাগে?

সুচরিতা হেসে জবাব দিলে, ভালো লাগালাগি আর কি। আমরা তো খুব ভালো ছাত্রী নই। আমাদের ভালো লাগিয়ে নিতে হয়।

—তবে আর কি! বিয়ের বাজারে আর্টস আর সায়েন্সের একই মূল্য।

—যা বলেছেন!

বলে সুচরিতাও ওর সঙ্গে হাসতে লাগল।

মাঘের মাঝামাঝি হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল ঃ সৌদামিনীর অবস্থা উদ্বেগজনক; চলে আসুন।

তরঙ্গিণী কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর যাবার উপায় নেই। ছেলের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায় না। প্রসন্নবাবু বোঝালেন, তিনি গিয়েই সৌদামিনীর অবস্থা সম্বন্ধে টেলিগ্রাম করবেন। দরকার বুঝলে লোকও পাঠাতে পারেন।

প্রথম যে ট্রেনটা পাওয়া যায়, তাইতেই প্রসন্নবাবু এবং প্রণব বর্ধমান চলে গেলেন। সঙ্গে ঝগড়ু চাকর। বাচ্চা চাকর, সৌদামিনীর বড় অনুগত। সে কিছুতেই ছাড়লে না।

তরঙ্গিণী বললেন, নিয়ে যাও ওকে। বৌমাকে বড় ভালোবাসে ছেলেটা। দরকার বুঝলে ওকেই পাঠিয়ে দিও এখানে। ও রাস্তা চেনে। স্টেশন থেকে একলাই আসতে পারবে।

গাড়িটা ওঁদের স্টেশনে পেঁাছে দিয়ে ফিরে আসতেই তরঙ্গিণী একটা ঝি সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট চলে গেলেন। বৌমার জন্যে মায়ের কাছে ধর্ণা দেবেন। সরকারকে বলে গেলেন, যখন যে খবর আসবে তৎক্ষণাৎ কেউ গিয়ে যেন তাঁকে জানিয়ে আসে।

প্রসন্নবাবুরা গিয়ে পেঁাছলেন বিকেলবেলায়। শিবশঙ্করবাবু অনুমান করেছিলেন—শুধু প্রণব নয়, প্রসন্নবাবুও আসবেন। সুতরাং স্টেশনে দুখানি পাল্কি গিয়েছিল।

সেখানেই গমস্তার কাছে তাঁরা খবর পেলেন—একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, কিন্তু প্রসূতির অবস্থা ভালো নয়। শহর থেকে বড় ডাক্তার এসে কাল রাত্রি থেকে রয়েছেন। আর, টাকা যা খরচ হচ্ছে, বাবু!

টাকার কথা শোনবার ধৈর্য ওঁদের নেই। তৎক্ষণাৎ পাল্কি করে ওঁরা ছুটলেন।

গিয়ে দেখলেন, বালাখানার বাইরে দুপ্রান্তে দুখানা তক্তপোশে কালীশঙ্কর ও শিবশঙ্কর বসে।

কালীশঙ্কর কাঁদছেন না। চোখে তাঁর জল নেই। শুধু থেকে থেকে তাঁর বিশাল বপু কেঁপে উঠছে আর কেমন একটা আশ্চর্য কণ্ঠে মাঝে মাঝে ডাকছেন—মা, মা! সে ডাক শুনলে মানুষের বুকের রক্ত স্তব্ধ হয়ে যায়।

আর ওপাশের তক্তপোশে তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে অঝোরে কাঁদছেন শিবশঙ্কর। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অবরুদ্ধ কান্নার দমকে দেহটা আন্দোলিত হচ্ছে, সেইটে বোঝা যাচ্ছে।

বালাখানার ভিতরে শহরের বড় ডাক্তার এখানকার দু'জন ডাক্তারের সংগে ফিসফিস করে কী আলোচনা করছেন।

প্রসন্নবাবু এবং প্রণব কালীশঙ্করের সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁর শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। শিবশঙ্কর ছুটে এসে প্রসন্নবাবুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সে কান্না এমনই যে ওঁদের সন্দেহ হল বুঝিবা সব শেষ।

ব্যাপার দেখে ভিতর থেকে স্থানীয় একজন ডাক্তার বেরিয়ে এসে ধমক দিলেন, ও কি করছেন, বড়বাবু! ওঁদের ভিতরে নিয়ে যান। ওরে, কে আছিস—

চাকরকে দিয়ে প্রসন্নবাবুদের আসার খবর ভিতরে পাঠানো হল। শিবশঙ্কর ওঁদের সংগে করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

অন্দর নিস্তব্ধ। শুধু একটা চাপা কান্না যেন গুমরে গুমরে উঠছে। তার ফলে সেই স্তব্ধতা যেন অসহ্য ভারী হয়ে উঠেছে।

তখনও সব শেষ হয়নি।

নিচে একটা বিছানায় সৌদামিনী শান্তভাবে শুয়ে। দুর্বল দেহ নড়াচড়া করার শক্তি রাখে না। ক্লান্ত চোখ অর্ধনিমীলিত। অদূরে পৃথক শয্যায় নবজাত শিশু শুয়ে।

নীচের তলায় এই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কুঠুরিটিই এ বাড়ির সনাতন আঁতুড়ঘর। সন্তান প্রসবের প্রথম কয়েকটি দিন, যে ক'টি দিন প্রসূতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এইখানেই তাকে কাটাতে হয়।

আরও নোংরা ছিল। শহরের বড় ডাক্তারের ধমকে পরিষ্কার করা হয়েছে। তবু এই পরিষ্কৃত ঘর দেখেই প্রসন্নবাবু এবং প্রণব উভয়েই শিউরে উঠলেন।

কিন্তু প্রতিবাদের সময় এটা নয়। সময় যদি হত, তা হলেও প্রতিবাদ নিষ্ফল। যে শুনবে, সেই হাসবে। সূতিকাগার শাস্ত্রমতে অশুচি। সেটা তো আর সত্যিই শয়নঘর হতে পারে না। আবহমান কাল থেকে ভারতবর্ষের লোক এমনি ঘরেই জন্মে আসছে। তার ফল যে বিশেষ খারাপ হয়নি, ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা তার প্রমাণ। আজ দুপাতা ইংরিজী পড়ে সনাতন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উলটে দেবার চেষ্টা করলে চলবে কেন?

ওঁরাও কিছু বললেন না। নিঃশব্দে ভিতরে এলেন।

প্রসন্নবাবু ডাকলেন, বৌমা!

সৌদামিনী শুনতে পেলে কিনা বোঝা গেল না। শুধু একখানা হাত এলোমেলো ভাবে ওঁদের দিকে বাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। প্রণব ওর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সেই হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলে।

প্রণবের হাতখানিকে সেই শীর্ণ অবশ হাত যেন ধীরে ধীরে আকর্ষণ করতে লাগল গলার দিকে, গালের দিকে, ঠোঁটের দিকে। সৌদামিনী একটুখানি হাঁ করলে এবং প্রণবের হাতটা মুখের ভিতরে আসতেই যেন জোরে কামড়ে ধরতে গেল।

স্থানীয় একজন ডাক্তার এসে গিয়েছিলেন, বোধ হয় একটু আগে যে ঔষধটা দেওয়া হয়েছে তার ফলাফলটা দেখবার জন্যে।

প্রণবের হাতটা ওর মুখের মধ্যে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি সাবধান করে দিলেন,—কামড়ে দেবে। সরিয়ে নিন হাতটা। ও বিকারের ঘোরে রয়েছে।

তাই বটে! প্রণব তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিলে।

প্রসন্নবাবু রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তারের পিছু পিছু। ঘরে বসেই প্রণব শুনতে পেলে, ডাক্তার ইংরিজিতে প্রসন্নবাবুকে বললেন, কোনো আশা নেই। আর কয়েকটা মিনিট।

নিঃশব্দে একা বসে রইল প্রণব। শাশুড়ী ধীরে ধীরে পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

কোনো আশা নেই! আর কয়েকটা মিনিট—কয়েকটা গুরুভার স্তব্ধ মিনিট। ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দ হবে না, কিন্তু মিনিট কয়টি কেটে যাবে। মনে হবে, সেকেণ্ড নেই, মিনিট নেই, ঘণ্টা নেই, বার-মাস-বৎসর কিছুই নেই। কিছুই নড়ছে না, কিছুই চলছে না, অনন্ত কালের মধ্যে সমস্ত স্তব্ধ, স্থির, অচঞ্চল। সমস্ত গতি এবং সমস্ত শব্দ যেন মৃত্যুর প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সৌদামিনীর বুকের পেণ্ডুলামও তখনই বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রণবের চোখের সামনে ভেসে উঠল সৌদামিনীর সেই আশঙ্কা-পাণ্ডুর মুখ, বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ, আর সেই কথা—আমার কেমন ভয় করছে গো, তুমি যেতে দেরি করো না যেন।

কিন্তু দেরিই হয়ে গেল,—অত্যন্ত বেশি দেরি।

এখন শুধু একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে—এবারে সমস্ত ভয় ঘুচেছে কি? মৃত্যুলোকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে? প্রেমে অতৃপ্তি, বিরহে মাধুর্য, মিলনে শঙ্কা আছে? সেখানেও কি একটা হৃদয় আর-একটি হৃদয়ের মধুচক্র বিন্দু বিন্দু করে পিপাসা দিয়ে পূর্ণ করে রাখে?

প্রণব চমকে দেখলে, ক'টি লোক এসে সৌদামিনীর মুমূর্ষু দেহ উঠানে তুলসীতলার নিচে নামিয়ে রাখছে। শাশুড়ী এসে শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়েছেন। বাড়ি কান্নার রোলে পূর্ণ।

প্রণব আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাইরে।

শহরের বড় ডাক্তার অনাবশ্যক বিবেচনায় আগেই চলে গেছেন। কালী-শঙ্কর স্তব্ধ অসহায়ভাবে তাঁর জায়গাটিতে বসে। কান্নার রোল উঠতেই শিবশঙ্কর ভিতরে চলে গেছেন।

তাঁর তক্তপোশে প্রসন্নবাবু এবং স্থানীয় ডাক্তার দুজন বসে বসে রোগের আনুপূর্বিক অবস্থা বিবৃত করছেন। প্রসন্নবাবু মনোযোগের সঙ্গে সেই বিবরণ শুনছেন।

প্রণবের সে .সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ নেই। কারণটা যাই হোক, সৌদামিনী নেই,—এই পৃথিবী খুঁজে কোথাও আর তাকে পাওয়া যাবে না।

প্রণব ধীরে ধীরে কালীশঙ্করবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। ডাকলে, দাদু!

কালীশঙ্কর চমকে ওর দিকে চাইলেন। কী অসহায় সেই দৃষ্টি! অতবড় দুর্দান্ত জমিদার, কিন্তু সমস্ত তেজ যেন তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেছে,—পড়ে আছে একতাল ছাই।

ও'র অবস্থা দেখে প্রণবের ভারী কষ্ট হল। আরও সরে ও'র কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকলে, দাদু!

কালীশঙ্কর উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর ঠোঁটটা কেঁপে উঠল

শুধু। একখানি লোলচর্ম শিথিল বাহু নিঃশব্দে প্রণবের কাঁধের উপর রাখলেন।

প্রণব বললে, চলুন, আমরা ওদিকে যাই।

উত্তরে কালীশঙ্করের গলার ভিতর থেকে প্রথমে একটা অব্যক্ত ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরল শুধু। তারপর গলা ঝেড়ে অনেক চেষ্টা করে কোনো রকমে বললেন, কি করে যাব!

—কেন?

—আমি উঠতে পারছি না। দুপুর থেকে এইখানেই বসে। হাঁটু-দুটো জমে গেছে যেন।

প্রণব একটু কী ভাবলে। বললে, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি চলুন।

ওদের মূল বাড়ির বাইরে একটা আটচালা। সেটা কাছারিবাড়ি। প্রণব ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে কালীশঙ্করকে সেইখানে একখানা চেয়ারের উপর বসালে।

আর একখানা চেয়ার টেনে এনে প্রণব নিজে তাঁর পাশে এসে বসল।

দুজনেই নিঃশব্দ।

হঠাৎ কালীশঙ্কর যেন একটু হাসলেন। প্রণব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ও'র দিকে চাইতেই উনি বললেন, আমি কেন এখনও বেঁচে আছি বলতে পার?

প্রণব চুপ করে রইল।

কালীশঙ্কর বলতে লাগলেন, শাস্ত্রে বলে, কেউ কারো নয়। সবই মায়া। মানলাম। বলে, যার যখন কাজ ফুরিয়ে যায়, সে তখন চলে যায়। তা হলে এই সতেরো বছর বয়সেই সদুর কাজ ফুরিয়ে গেল, আর সাতাত্তর বছর বয়সেও আমার কাজ ফুরোল না!

প্রণব তথাপি চুপ করে রইল।

—এবারে এসে আমার কাছে নিরিবিলি বসে কেবল তোমারই গল্প করত। কবে কী কথায় তোমাদের ঝগড়া হয়েছিল, কেমন করে ভাব হল,—কত তোমার রূপ, কত তোমার গুণ, কত তোমার বিদ্যা—কেবলই এইসব কথা। কথা বলতে বলতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এবং বোধ করি সেই উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি ভাববার জন্যেই বৃদ্ধ নিষ্প্রভ চোখদুটি একবার বন্ধ করলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন:

—এবারে তোমার চিঠি এলে সহজে পড়তে দিত না। একটি টাকা নিয়ে তবে পড়তে দিত। জিগ্যেস করতাম, টাকা কিসের জন্যে? হেসে জবাব দিত, পরের চিঠি পড়ার জরিমানা।

—আপনাকে একটু তামাক দিতে বলি, দাদু?

—কাকে বলবে? কেউ কি আছে? সব বাড়ির ভিতরে। তারপরে শোন।

বৃদ্ধ অকস্মাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি কি ভুলে গেলেন, সৌদামিনী নেই?

প্রণব বললে, দেখি দাঁড়ান। ওহে, কি তোমার নাম? এদিকে শোন।

লোকটি ভিতর থেকে হনহন করে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। কাছে এসে প্রণাম করে জানালে, তার নাম রামপদ।

—রামপদ, বাবা, বাবুকে একটু তামাক দিয়ে যাও তো।

রামপদর এতক্ষণে খেয়াল হল, বাবুকে অনেকক্ষণ তামাক দেওয়া হয়নি। লজ্জিতভাবে জিভ কেটে বললে, এই যে, দিই বাবু।

কালীশঙ্কর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগলেনঃ তার পরে শোন ভাই—

সৌদামিনীর মৃত্যুর পর কয়েকটা মাস প্রণবের জীবনে একটা প্রচণ্ড অবসাদ এল। বন্ধুসংস্পর্শ ভালো লাগে না, কাজ ভালো লাগে না, অবসরও ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। যে দু'একটা দিন সেখানে থাকে, বৃদ্ধ কালীশঙ্করের সঙ্গে বসে গল্প করে,—শুধুই সৌদামিনীর গল্প।

এমনি করে মাস-ছয়েক কাটল। খোকা হামা দিতে শিখল। তার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রসন্নবাবু তাকে বাড়ি নিয়ে এলেন, ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন দিলেন, আর মামারবাড়ি পাঠালেন না।

নাম দেওয়া হল বিমানবিহারী।

বিমান ঠাকুরমার গলার হার, দাদুর বুকের পাঁজর।

তাকে পেয়ে প্রণবও যেন আবার একটু সুস্থ হল। ধীরে ধীরে কর্মে

স্পৃহা আসতে লাগল। আবার নিয়মিতভাবে কোর্টে এবং সিনিয়রের বাড়ি যাওয়া আরম্ভ করলে।

তরঙ্গিণী এবং প্রসন্নবাবু প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও সৌদামিনীকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সুতরাং তার অকালমৃত্যু তাঁদেরও খুব বেজেছিল। কিন্তু প্রণবের দিকে চেয়ে সে শোকেরও তাঁরা অবসর পেলেন না।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে এল যেন বিমানই। তাকে নিয়ে, শুধু প্রসন্নবাবু আর তরঙ্গিণীই নয়, প্রণবও যেন এই প্রবল শোকে একটা অবলম্বন পেলে। বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে সিনিয়রের বাড়ি যাওয়ার আগে যেটুকু সময় পায়, প্রণব ওকে নিয়ে খেলা করেই সময় কাটায়।

কিন্তু বাঙালী সমাজে বৈবাহিক ক্ষেত্রে শূন্যতার অবকাশ নেই। চারিদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে হাওয়া ছুটে আসে সেই শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্যে। প্রণবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। কিন্তু কি তরঙ্গিণী, কি প্রসন্নবাবু কেউই এরকম কোনো প্রস্তাবে আমল দিলেন না,—নিজেদের আগ্রহের অভাবের জন্যে নয়, প্রণবের দিকে চেয়েই। নিজেদের স্বল্পবাক্, উদারহৃদয়, স্নেহপ্রবণ সন্তানকে তাঁরা ভালো করে চেনেন।

সুতরাং সেদিক দিয়ে প্রণবের জীবনযাত্রা নিরঙ্কুশভাবেই চলতে লাগল। সকালে সিনিয়রের বাড়ি, দুপুরে কোর্ট, বিকেলে বিমান-বিহারী, সন্ধ্যায় হয় সিনিয়রের বাড়ি, নয় ব্রীফ। ধীরে ধীরে তার পসার বাড়তে লাগল এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে জুনিয়র ব্যারিস্টারদের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আয়ও তখন—সুতরাং চালচলনও—মোটের উপর ভালোই।

ওদের ঘোড়ার গাড়িটা এখনও আছে। কিন্তু প্রণব নিজের জন্যে একখানা মোটরগাড়ি কিনেছে। প্রসন্নবাবু কোর্টে যান ঘোড়ার গাড়িতেই। কোর্টে যেতে এখন আর তাঁর খুব ইচ্ছা করে না। কিন্তু কিছুটা অভ্যাস; পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। কিছুটা বা মক্কেলের জেদাজেদি। সুতরাং একবার করে যেতে হয়। ফেরবার সময় রোজই বিমানের জন্যে হয় পোশাক, নয় খেলনা, নয়তো খাবার কিনে আনেন। সেটা ক্রমেই একটা অভ্যাসে দাঁড়াচ্ছে।

বন্ধুমহলে প্রায়ই দুঃখ করেন, আর এ ছ্যাঁচড়ামি ভালো লাগে না,

ভাই। ছেলেটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। এইবার ইচ্ছে করে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাকী জীবনটা ঠাকুরের আশ্রমে গিয়ে কাটাই। তরঙ্গিণী যে এবিষয়ে বাধা দিচ্ছেন তাও নয়। বরঞ্চ তাঁরও এতে সাগ্রহ সম্মতি আছে।

তবু হচ্ছে না। প্রসন্নবাবুর জীবনের স্রোত সেই পুরাতন খাতেই বয়ে চলেছে। তার আর ইতরবিশেষ নেই।

ইতরবিশেষ বরং কিছুটা ঘটেছে তরঙ্গিণীর। ও'দের তবু বাইরের একটা জগৎ আছে। মক্কেল আছে, ব্রীফ আছে, কোর্ট আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। কিন্তু তরঙ্গিণীর কী আছে বিমান ছাড়া?

এবং বিমানের দুষ্টুমিও যেন দিন দিন বাড়ছে। সেদিন সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে রক্তারক্তি! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তার জঠরের মধ্যে। সুতরাং সামনে যা পাচ্ছে, তাই মুখে পুরছে। জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করছে। সবচেয়ে যেন বেশি আক্রোশ তার ঠাকুরমার ঠাকুরঘরের উপর। সুযোগ পেলেই সেখানে হানা দেয় এবং সিংহাসন থেকে ঠাকুরকে নিচে নামিয়ে নিজে সেইখানে গিয়ে বসে।

ভয়ে তরঙ্গিণীর বুক দুরুদুরু কেঁপে ওঠে। কী অনাসৃষ্টি ছেলে বাবা! একটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! বিমানকে তিনি খুব তিরস্কার করেন। কিন্তু কিসের তিরস্কার! প্রত্যুত্তরে বিমান তার কচি কচি দুধে-দাঁত ক'টি বের করে কৌতুকভরে হাসে!

ওকে নিয়ে তরঙ্গিণীর ঝামেলার আর অন্ত নেই। ঠাকুর গেছেন, পুজো গেছে, এমন কি সংসাবের কাজকর্ম পর্যন্ত গেছে। এর উপর যদি বিমানের অসুখ করে, তা হলে তো নিজেও গেছেন।

এই অবস্থায় একদিন গুরুদেব এলেন।

তিনি বেরিয়েছিলেন তীর্থ-পর্যটনে। পদব্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে পাঁচ বৎসর পরে তিনি ফিরলেন। ক'দিন ধরেই সন্ধ্যার পরে প্রসন্নবাবুর মস্তবড় হল-ঘরে তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের সমাগম হতে লাগল। স্বামীজি তাঁর ভ্রমণের গল্প করতে লাগলেন। কত মঠ, কত মন্দির, কত বন, কত পর্বত, গুহাবাসী অগ্নিসম তেজস্বী কত সন্ন্যাসী, [illegible] কত বিভিন্ন শাখা, কত মত কত পথ,—সেই সব অপূর্ব কাহিনী সুললিত স্বরে তিনি বর্ণনা করতে লাগলেন।

বিমানও এই সভায় তরঙ্গিণীর পাশে সেজেগুজে গম্ভীরভাবে বসে থাকে। অনেক অপরিচিত লোকের মধ্যে হয়তো ভয়েই দুষ্টুমি করে না। তার দৃষ্টি স্বামীজির গেরুয়া-রঙের অদ্ভুত টুপিটির উপর। স্বামীজি যতক্ষণ আলোচনা করেন, একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে সেই টুপিটির দিকে।

একদিন সেইটেকে সে সরিয়ে ফেলে তার খেলাপাতির মোটরগাড়ির ঢাকা বানিয়ে ফেললে।

খুঁজতে খুঁজতে স্বামীজি তাকে ধরে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধুতে-চোরে একটা অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল! এতদিন দুপুরবেলায় তরঙ্গিণীই বিমানের একমাত্র সাথী ছিলেন, এখন থেকে আর একজন জুটে গেলেন, স্বামীজি।

একদিন দুজনে খেলা খুব জমে উঠেছে, এমন সময় বিমানকে খুঁজতে খুঁজতে তরঙ্গিণী সেইখানেই এসে উপস্থিত!

স্বামীজি তাঁকে দেখে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, এ হরিণ-শিশু কোথায় পেলি, মা!

বিমানকে কোলে টেনে নিয়ে তরঙ্গিণী হেসে জবাব দেন, খোকার ছেলে। মা তো নেই!

সে দুঃখের কথা স্বামীজি এসেই শুনেছেন।

স্বামীজি বললেন, তা হোক। পালা, পালা। এরা দামোদরকে পর্যন্ত বাঁধতে পারে। যশোদা পারেনি, কিন্তু এরা পারে। বাঁচবি যদি, পালা। ভরতের হরিণ-শিশুর গল্প জানিস্ তো? এ-যে আমাকেই বাঁধে!

তরঙ্গিণী সেইখানে বসে পড়লেন। সভয়ে বললেন, কি হবে, বাবা! আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা, জীবনের বাকি ক'টা দিন আপনার কাছেই কাটাই। কিন্তু একে কার কাছে রেখে যাই, বাবা?

স্বামীজি হাসলেন ঃ তুমি ভাবছ মা, তুমি ছাড়া ওকে দেখবার কেউ নেই? ওর মা গেছে, তবু মানুষ হচ্ছে। আর তুমি না থাকলে ও মানুষ হবে না?

তরঙ্গিণী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে যেন আপন অন্তরের মধ্যে এই অতি সারবান কথাগুলি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বললেন, সবই বুঝি, বাবা। তাঁর কোটি চক্ষু প্রতিটি মানুষের দিকে নিয়ত জেগে রয়েছে। কিন্তু সংসারী জীবের তবু তো মন মানে না।

স্বামীজি ধর্মজগৎ থেকে এবার কর্মজগতে নামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, প্রণব কি বিবাহ করতে রাজী নয়?

—খুব চাপ অবশ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে যেন রাজী নয়, বৌমাকে যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

স্বামীজি আর কিছু বললেন না। কিন্তু বিকেলে নিজেই প্রণবকে নিয়ে পড়লেন। বোঝাতে লাগলেন, হিন্দু-বিবাহের তত্ত্বকথা এবং অন্য বিবাহের সঙ্গে কোথায় এর পার্থক্য। শাস্ত্রীয় চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যও একটা আশ্রম এবং বানপ্রস্থের মতোই পবিত্র। বলতে লাগলেন, হিন্দু-বিবাহে দেহটা বড় নয়, এও ধর্মানুষ্ঠানের একটা অঙ্গ, —বানপ্রস্থের প্রস্তুতি। তাই অগ্নি এর দেবতা, প্রজাপতি এর ঋষি এবং অনুষ্টুপ এর ছন্দ।

বললেন, হিন্দু বিবাহ করে তার ধর্মজীবনে সহায়তা লাভের জন্যে। যেখানে বিবাহ তার পরিপন্থী, সেখানে আমি বিবাহের উপদেশ দিই না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। সেজন্যে আমি তোমাকে বিবাহ করাই উপদেশ দোব।

প্রণব নিঃশব্দে স্বামীজির কথা শুনে যাচ্ছিল। হিন্দু-বিবাহের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা যে প্রণবের কাছে খুব হৃদয়গ্রাহী হচ্ছিল, তা হয়তো নয়। কিন্তু তর্ক অনাবশ্যক বিবেচনাতেই সে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল। তা ছাড়া তরঙ্গিণীর বিগত অনশনের পর থেকে সে এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে, তরঙ্গিণী যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে সমাজ অথবা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সে যোগ দেবে না, এই প্রতিজ্ঞা করেছিল।

এখন শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আমার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র কিসে?

—তোমার বাপ-মায়ের জন্যে। আজকেই তোমার মা বলছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা ছিল শেষ জীবনটা আমার আশ্রমেই কাটাবেন। পারছেন না শুধু ছেলেটার জন্যে। তাকে কার কাছে রেখে যাবেন?

এ একটা গুরুতর প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক বাড়িতে মা থাকতেও আয়া রেখে ছেলে মানুষ করা হয়। তরঙ্গিণী এবং প্রসন্নবাবু যদি আশ্রমে চলেই যান, তাহলে বিবাহ না করে সেই ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে না? বিবাহে প্রণবের ইচ্ছা নেই।

স্বামীজির কাছে সেই ইচ্ছা সে ব্যক্ত করলে।

—না, বাবা। —স্বামীজি আপত্তি জানালেন,—তাতে ছেলে মানুষ হয় না। তোমার যদি বিবাহে একান্তই অনিচ্ছা থাকে, তাহলে থাক।

তোমার মা-বাবা এখানেই থাকুন, অন্তত তোমার ছেলে আরও কিছু বড় না হওয়া পর্যন্ত। আয়ার হাতে বাচ্চাকে রেখে ওঁরা স্বর্গে যেতেও রাজী হবেন বলে মনে হয় না।

প্রণব বিপন্ন হয়ে পড়ল।

বহুদিন পরে তার মনে পড়ল সুচরিতাকে। সৌদামিনীর মৃত্যুর পর সুচরিতাদের বাড়ি একদিনও যায়নি। বরদার কাছে খবর মাঝে মাঝে পায়। শুনেছে, সে এম-এ পড়ছে। বাপ-মা বিবাহের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক ভালো পাত্রও পেয়েছিলেন, কিন্তু সুচরিতার জেদ এম-এ পাস করার আগে ও-কথা সে ভাববেই না। মেয়ের অধ্যয়নে এই ঐকান্তিকতা দেখে তাঁরা আর জেদ করেন নি।

এসব কথা শুনেছে সে। মাঝে মাঝে মনেও পড়েছে সুচরিতাকে। কিন্তু কোনো দিন তার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ বোধ করেনি। আজ, বহুকাল পরে, তারই সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। রবিবারে ছুটি, সেদিন বিকেলে গেলেই ভালো হয়। কিন্তু তার এখনও দুটো দিন দেরি। ততখানি সবুর করার সামর্থ্য তার নেই।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই সে ছুটল সুচরিতাদের বাড়ি।

সুচরিতা একাকী লনে পায়চারি করছিল। দূর থেকে প্রণবকে দেখে সে থমকে গেল। হঠাৎ প্রণব! এতকাল পরে? অবাক্ হয়ে গেল সে।

কিন্তু হনহন করে এগিয়ে এল প্রণব। সুচরিতার সামনে এসে সেও কম অবাক্ হয়ে গেল না। কত পরিবর্তন হয়েছে সুচরিতার! কত শান্ত, কত গম্ভীর হয়েছে সে!

হাসিমুখে সুচরিতা ওকে অভ্যর্থনা করলে ঃ আসুন আসুন! কত কাল পরে এলেন! কিছু কি দরকার আছে?

—হ্যাঁ।

—দাদার কাছে?

—যদি বলি, না? যদি বলি তোমারই কাছে?

—তাহলে চলুন. বসবার ঘরে। খোকা ভালো আছে তো? কী যেন নাম রেখেছেন তার? আর সব ভালো?

—আর সবাই ভালো আছে। কিন্তু ঘরে কেন, সুচরিতা? ওই বেঞ্চিটার ওপরেও তো বসতে পারি।

—না, অন্ধকারে কেন? কতদিন পরে এলেন, ঘরে চলুন। বাবা, মা সবাই আপনাকে দেখে খুশি হবেন।

ওঁর কণ্ঠস্বরে এবং ভাবভঙ্গিতে সুচরিতা যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে। মেয়েদের ষষ্ঠ একটা ইন্দ্রিয় আছে, যাতে করে পুরুষের মনের কথা আগে থেকেই ওরা অনুমান করতে পারে। সুচরিতা তাই নিরিবিলি ওর সঙ্গে আলোচনা করতে ভয় পাচ্ছে।

অন্যমনস্কতায় সুচরিতার এই অভিপ্রায় প্রণবের চোখে পড়ল না। সে বললে, যাচ্ছি। তার আগে একটা কথা বলে নিই। আমি খুব বিপন্ন, সুচরিতা!

ওর কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতায় সুচরিতা চমকে উঠল। বললে, কী বিপদ?

—সে অনেক কথা। আমার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, সু। এইখানে এই ঘাসের ওপরই একটু বসি।

সুচরিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই সেইখানেই সে ধপ করে বসে পড়ল। তারপরে ধীরে ধীরে স্বামীজির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তা বলতে লাগল। শেষে বললে, আমি তো কোনোই কুলকিনারা দেখতে পাই না, সুচরিতা। মনে পড়ল তোমাকে। মনে হল, তুমি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পার। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি আমাকে সাহায্য করবে সু?

সুচরিতার বুকের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেল। গলা শুষ্ক। কথা বলার শক্তি নেই।

ব্যাকুলকণ্ঠে প্রণব বললে, তুমিও চুপ করে থাকবে? আমাকে কোনো সাহায্য করবে না?

কোনোমতে সুচরিতা বললে, আমার কাছে কী সাহায্য প্রত্যাশা করেন?

প্রণব তৎক্ষণাৎ বললে, তোমার কাছে আমার প্রত্যাশাও অনন্ত, জিজ্ঞাসাও অনন্ত। কিন্তু সে-পিপাসা কোনোদিনই তৃপ্তির কিনারায় গিয়ে পৌঁছুবে না। সুতরাং সে থাক।

সুচরিতার বুকে আবার ধীরে ধীরে রক্ত-চলাচল শুরু হল।

বললে, তাহলে?

—আমাকে তুমি সব পথ বলে দাও। বলে দাও, এখন কী আমি করব।

সুচরিতা ম্লান হাস্যের সঙ্গে বললে, আমার বুদ্ধি কি আপনার চেয়ে বেশি?

—তা তো জানি না, সু। কিন্তু ভয় হচ্ছে আমার বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। সুতরাং অবশিষ্ট রইলে তুমি। মনে হল, তুমিই আমাকে পথ বলে দিতে পার। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম।

সুচরিতা আবারও তেমনি করে হাসলে। বললে, বিপদ আমারও অনেক গেছে, প্রণববাবু। কিন্তু পথের জন্যে আপনার কাছে ছুটিনি।

—না। তার কারণ তুমি আমার চেয়ে শক্ত। তোমার বুদ্ধি স্থির। বিপদের সময় আমি গুছিয়ে ভাবতেই পারি না।

—পারবেন। সময় পেলে সবাই পারে। তা-ছাড়া উপায়ও নেই।

—কেন?

—কারণ নিজের কথা নিজে যেমন ভাবতে পারে এমন আর কেউ নয়। কেউ কারও জন্যে ভেবে দিতে পারে না। সময় নিয়ে নিজেই ভেবে নিতে হয়।

সুচরিতা একটা প্রকাণ্ড বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

সেই শব্দে চমকে উঠে প্রণব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে, ক্ষুধার্ত দুটি চোখ মেলে।

সে-দৃষ্টি সুচরিতা সইতে পারলে না। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলে।

একটু পরে যেন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে, দাদার বিয়ে সামনের মাসের তেসরা, জানেন?

—তাই নাকি? বলেনি তো কিছু।

—খুব ইচ্ছে ছিল না দাদার। তবু করতে হচ্ছে। চলুন অভিনন্দন জানাবেন।

—চল।

সে-রাত্রে প্রণবের ফিরতে অনেক দেরি হল। ফিরেই মাকে বিবাহে সম্মতি জানালে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তরঙ্গিণী তখনই ছুটলেন প্রথমে প্রসন্নবাবুর কাছে, তারপরে স্বামীজির কাছে।

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, পাত্রী আমার হাতেই আছে, হরকালীর মেয়ে।

—কে হরকালী?—প্রসন্নবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—তোমাদের এইচ, সি, চ্যাটার্জি গো! পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের।

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইচ. সি. বুঝি হরকালী!

—হ্যাঁ। ও 'সি' দিয়ে কালী লেখে। আমি কালকেই ওর সঙ্গে দেখা করব।

তাই হল। স্বামীজি যেন প্রণবকে দম নিতে দিতে চাননা। কনে দেখা, পাত্র দেখা, উভয় পক্ষের পাকা দেখা, বিবাহ—পর পর অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘটে গেল,—বরদার বিয়ের আগেই।

মেয়েটির নাম অরুণা।

প্রণব মাথা তুলবার সময় পেলে না। ঘটনা-পরম্পরার তীব্র গতিবেগে তার স্নায়ুমণ্ডলী যেন মুহ্যমান হয়ে গেল। বিচার করবার, বিবেচনা করবার শক্তিই যেন সে হারিয়ে ফেললে। অনিবার্যতার সেই গতিবেগের কাছে মোহগ্রস্তের মতো সম্পূর্ণ শিথিলভাবে যেন সে আত্মসমর্পণ করলে।

মনকে প্রবোধ দিলে, এক্ষেত্রে আর তার করবারই বা কী ছিল!

কিন্তু এই কি সত্য! করবার কি কিছুই তার ছিল না? অথবা এমন করেই মানুষ নিজেকে ভোলায়? নিজের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করে? নাকি মহাকালের দুর্বার তরঙ্গে মানুষের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিও কুটোর মতো ভেসে যায়?

এ নিয়ে প্রণব অনেক ভেবেছে। যতই ভেবেছে ততই দেখে অবাক্ হয়েছে, নিজেকেই সে ভালো করে জানে না।

সৌদামিনীকে সে কি যথার্থই ভালোবেসেছিল? নাহলে সুচরিতা তাকে অমন করে টেনেছিল কেন? আজও কি সুচরিতা তাকে টানে না? তাহলে অরুণা এল কেন!

প্রণব জবাব খুঁজে পায় না।

দার্জিলিং থেকে ফেরবার পর থেকে সৌদামিনীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার নিজের মনে মাঝে-মাঝেই সন্দেহ এসেছে তার ভালোবাসার স্রোতঃপথের উপরিতলে যেটা দৃষ্টিগোচর, সেখানে ছায়া পড়েছে সৌদামিনীর। কিন্তু নিম্নস্রোতঃপথে সুচরিতা ছাড়া আর কেউ নেই।

তার ভাবালু ভদ্র মন এতে পীড়িত হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রতিকার করতে পারেনি।

সৌদামিনীকে সে যে ভালোবাসত এবং গভীরভাবেই ভালোবাসত, তা সে টের পেলে সৌদামিনীর মৃত্যুর পর। তার মনে হল, আশ্চর্য মেয়ে সৌদামিনী! বরাবর দূরে দূরে রইল। কখন সে সরে আসত, কখনই বা চলে যেত, বোঝা যেত না। অথচ কত কাছে-কাছেই না ছিল! আশ্চর্য মেয়ে সৌদামিনী! অমন লতার মতো লজ্জাবতী, আবার অমন পাথরের মতো শক্ত। নিজের ইচ্ছা কখনও কারও উপর সে চাপায়নি সুগম্ভীর নম্রতায় পথের একপাশে সরিয়ে রেখেছে। তবু সেই কুণ্ঠিত ইচ্ছাই লঙ্ঘন করার শক্তি যেন কারও ছিল না।

মনে পড়ে সুচরিতাকে নিয়ে কতরকম তাকে আঘাত দেবার জন্যে কত চেষ্টাই না প্রণব করেছে। কিন্তু সে শুধু হেসেছে। নিজের উপর, নিজের ভালোবাসার উপর কতবড়ই না তার প্রত্যয়! জটিল গ্রন্থিবহুল এই জগৎকে কত সহজ করে, সবল করে, সুন্দর করেই না সে পেয়েছিল! স্বামী যে স্ত্রী ছাড়া অন্য কাকেও কোনো কারণে ভালোবেসে ফেলতে পারে, এ যেন তার কল্পনারও অগোচর। চোখে দেখিয়ে দিলেও অবিশ্বাস্য।

প্রণবের মনে আজও সংশয় আছে, অনভিজ্ঞ শিশুর মতো পৃথিবীকে যে-চোখে সে দেখে গেল তাই পৃথিবীর সত্যকার রূপ, না, আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে পৃথিবীর যে জটিল রূপের পরিচয় নিত্য তার চোখে পড়ছে —তা-ই সত্য।

বস্তুত সৌদামিনীর মৃত্যুর পরে সৌদামিনীর সম্বন্ধে যত সে ভেবেছে, এমন অবসর তার জীবিতকালে প্রণব পায় নি। এবং যতই ভেবেছে ততই মনে হয়েছে, হায়, যদি আরও কিছুদিন সৌদামিনী বাঁচত, তাহলে একনিষ্ঠ চিত্তে ভালোবাসা দিয়ে তার হৃদয় পরিপূর্ণ করে দিত।

কিন্তু সৌদামিনী বাঁচল না।

আর আজ কোথায় সৌদামিনী, কোথায় বা তার দিকে নবোদ্গত একনিষ্ঠ প্রেম, কোথায় বা সুচরিতা! প্রণব চলেছে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে।

প্রণব দিশা পায় না, এ কী করে সম্ভব হতে যাচ্ছে।

তবে কি সবই ফাঁকা! মিথ্যে তার সৌদামিনীকে ভালোবাসা, মিথ্যে সুচরিতাকে ভালোবাসা? অথবা সে কি দুর্বল? শক্ত করে যে তাকে

ধরে বসে, তাকে সে 'না' বলতে পারে না। 'না' বলতে পারলেনা সে গুরুদেবকে—'না' বলতে পারলেনা পিতামাতার আশ্রম-জীবনের সাধকে। অথবা কে জানে, পাতালের অন্ধকারে বয়ে চলে যে ভোগবতী, তারই গতি হয়তো দুর্জ্ঞেয়।

কে জানে!

অরুণা যেন একটি-গোছা কৃষ্ণচূড়া। সকল সময়েই হাওয়ায় দুলছে। এক মুহূর্ত স্থির থাকে না।

ফুলশয্যার রাত্রেই বললে, মাকে কত করে বললাম বিয়ে আর-দুটো দিন পিছিয়ে দিতে! মায়ের মত ছিল, কিন্তু আর বিয়ের দিন ছিল না।

প্রণব সবিস্ময়ে বললে, তাতে কি সুবিধা হত?

—বা-রে! কালকে ক্যালকাটা-মোহনবাগান ম্যাচ আছে না?

—তোমার বুঝি খেলা দেখার খুব শখ?

—ভীষণ।

—যাবে কালকে?

বিমনা হয়ে অরুণা বললে, যাব বললেই তো হয় না। কে নিয়ে যাবে?

—আমি।

অরুণা উৎসাহিত হয়ে বললে, যাবে নিয়ে? সত্যি?

কিন্তু তখনই দমে গিয়ে বললে, কিন্তু তা কি করে হবে? অন্য লোকে কি বলবেন?

—কি আর বলবেন? খেলা দেখা তো আর অন্যায় কাজ কিছু নয়। কি বল?

—আমি তো তাই বলি। কিন্তু ওঁরা হয়তো বলবেন, বিয়ের কনে, একি বেহায়াপনা! যেন বিয়ের কনেরা মানুষ নয়, তাদের খেলা দেখবার শখ থাকতে নেই, তাদের বাড়ির বাইরে বেরুতেই নেই!

অরুণা ব্যঙ্গভরে হাসলে।

প্রণব বললে, খেলা দেখার আমারও ভীষণ নেশা। কালকে যাবও। তোমার যদি ভয় না করে, আমার সঙ্গে যেতে পার।

অরুণা হেসে বললে, তুমি জোর করে নিয়ে গেলেই আমার আর

ভয় থাকে না। দোষ হলে তোমার নামেই হবে। কিন্তু আমার জন্যে সে দোষ তুমি কেন ঘাড়ে নেবে বল? পরের জন্যে কেই বা নেয়?

প্রণব হেসে বললে, নারী কখনও পর হয় না,—সকল সময়ই আপন। তাদের জন্যে চরমতম অপযশ যে-পুরুষ স্বেচ্ছায় হাসিমুখে ঘাড়ে নিতে না-পারে, সে পুরুষ-নামের কলঙ্ক। অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে! আমি প্রস্তুত।

সুতরাং অরুণা স্বচ্ছন্দে খেলা দেখতে চলে গেল।

এর কয়েক দিন পরেই অরুণা প্রণবকে সঙ্গে করে একটা ডিনার-টেবিল কিনে নিয়ে এল এবং আরও কিছু বিলাতী আসবাব। প্রণবের অন্দরমহলে বিলাতী সজ্জা ছিল না। চেয়ার-টেবিল-আলমারি প্রভৃতি বিলাতী আসবাব এ-ঘরে ও-ঘরে কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু সজ্জাটা বিলাতী নয়, দেশী।

তরঙ্গিণীর ঠাকুরঘর এবং শোবার ঘর বাদে অন্য ঘরগুলিকে সে বিলাতী কেতায় সাজিয়ে ফেললে। এখন থেকে বিমানকে নিয়ে ওরা টেবিলে খেতে আরম্ভ করল এবং খাবার সময় অরুণা আক্ষেপ করতে লাগল যে, এই ঠাকুরটা শুক্তো-চচ্চড়ি-ডালনা ছাড়া আর কিছুই রাঁধতে জানে না। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে এখানে প্রণব চুপ করে থাকে।

বিমানের স্কুলটা ছিল একেবারেই দেশী। আর পোশাকটা ছিল অর্ধেক দেশী, অর্ধেক বিলাতী,—হরগৌরীর মতো। দেশী ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে অরুণা ওকে একটা খাস বিলাতী স্কুলে ভর্তি করে দিলে। সেটা এখানে নয়, দার্জিলিং-এ। সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে গেল।

ভাগ্যদেবতার এই নিদারুণ সক্রিয় পরিহাসে প্রণব হাসল।

—হাসছ কেন?—তীক্ষ্মকণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞাসা করলে।

—বিমানকে পাঠানো সম্বন্ধে মাকে যে তুমি এত সহজে রাজী করতে পারবে, আমি ভাবিনি।

—এ বিষয়ে মায়ের মত করানো কি তুমি খুব শক্ত ভেবেছিলে?

—ভেবেছিলাম। তোমাকে তাহলে বলি শোনঃ

প্রণব বলতে লাগলঃ

বিমানকে জন্ম দিয়েই ওর মা যখন মারা গেলেন, তখন প্রথম কয়েকটা মাস ও মামার বাড়িতেই ছিল। একটু শক্ত হতেই মা ওকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তারপর থেকে বিমানই ওঁর পুজো-আর্চা, ধ্যান-ধারণা, বার-ব্রত হয়ে দাঁড়াল। বাবা-মায়ের তখন ইচ্ছা বাকী

জীবনটা ওঁদের গুরুদেবের সান্নিধ্যে কাটানো। কিন্তু সে কি করে সম্ভব? আমার বিবাহে অনিচ্ছা, ওঁরাও দাসী-চাকরের হাতে বিমানকে সমর্পণ করে আশ্রমে যেতে পারেন না।

—সেইজন্যে তোমার ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে আমাকে বিয়ে করলে?

—প্রধানত তাই বটে। তবে, স্বামীজি বলেন, হিন্দু-বিবাহে স্বামীই তো শুধু স্ত্রীকে বিয়ে করে আনে না।

—কে বিয়ে করে আনে তবে? পাড়া-প্রতিবেশীরা?

—অতখানি না হলেও কাছাকাছি বটে। আমাদের বিবাহে দেহটাই মুখ্য নয়। স্ত্রী এখানে সহধর্মিণী। স্ত্রী এখানে সমস্ত পরিবারের মধ্যেই স্বামীকে পায়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়।

—অর্থাৎ শুধু দেহ নয়, হৃদয়টাও বিবাহ-ব্যাপারে নিতান্ত অবান্তর। কি বল?

অরুণার কণ্ঠে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিলে।

প্রণব বললে, অনেকটা। তার মানে, হৃদয়াবেগটা সংযত করতে হবে। স্বামীজির মতে, আবেগ বস্তুটা উচ্ছৃঙ্খল। একমাত্র ঠাকুরের জন্যে আবেগ ছাড়া অন্য সমস্ত আবেগকে সংযত করে না রাখতে পারলে বিপদ ঘটে। সেইটেই নাকি সাধনার গোড়ার কথা—চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

—ইংরিজিতে তাকেই বলে 'ডিসিপ্লিন'। বিমানকে যেখানে পাঠানো হল সেখানে শুধু মনের নয়, দেহের ডিসিপ্লিন-এর ওপরও জোর দেওয়া হয়।

—কিন্তু মন আর হৃদয় এক নয়।

—সম্ভবত নয়। ঠিক যেমন স্বামীজি আর আমি এক ব্যক্তি নই। যে জন্যে তাঁর সকল কথা আমি মানি না।

—শুনেছ, স্বামীজি আবার আসছেন?

—না। শুনেছি তিনি আসাম গেছেন।

—হ্যাঁ। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে আশ্রমে ফিরবেন। তোমার বাবাও তো তাঁর শিষ্য।

—জানি। কিন্তু বাবা আর আমিও এক ব্যক্তি নই।

অরুণা হাসল।

প্রণব বললে, আশ্রমে ফেরবার সময় বাবা আর মাকেও বোধ হয় তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

অরুণা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—আশ্রমে।

—সেখানে কি?

—বললাম তো, বাবা আর মায়ের ইচ্ছা, শেষ জীবনটা সেখানেই কাটান।

এবারে অরুণা চিন্তিত হল। তার ইস্পাতের মতো ধারালো কণ্ঠ যেন কোমল হয়ে এল।

জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি তাঁদের কোনো কষ্ট হচ্ছে?

—জানি না। হলেও, সেজন্যে বোধ হয় যাচ্ছেন না।

—তবে?

—দেখ, আশ্রমের ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না। বোধ হয় সাধন-ভজনের সুবিধার জন্যেই সেখানে যাওয়া। তা ছাড়া

—তা ছাড়া?

—বিমান চলে গেল—ওঁদের বোধ হয় মনে হয়েছে, এখানে থাকার প্রয়োজন আর নেই। বিমানের জন্যেই তো থাকা।

—শুধু সেইজন্যে? আর কোনো প্রয়োজন নেই?

—আবার কি?

—কেন, তুমি আছ, আমি আছি।

প্রণব হাসল। বলল, আমরা বড় হয়েছি। নিজেদের সংসার দেখে নিতে শিখেছি। আমাদের জন্যে এই বয়সে ওঁদের সংসারে আটকে থাকার কোনো কারণ নেই।

অরুণা চুপ করে কি-যেন ভাবতে লাগল। ওঁদের চলে যাওয়ার কথাটা তার ভালো লাগল না। এ তো ক'দিনের জন্যে তীর্থভ্রমণে যাওয়া নয়। এমন কি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়াও শুধু নয়। এ যে একেবারে সংসার-ত্যাগ!

ওর চিন্তিত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে প্রণব বললে, একটা কথা জিগ্যেস্ করব?

—কর।

কিন্তু অরুণার কণ্ঠে সেই তীক্ষ্ণতা আর নেই।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, বিমানকে পাঠানো নিয়ে মা কিংবা বাবা কোনো আপত্তি করেননি?

—না তো। তুমি কি কোনো আপত্তি আশঙ্কা করছিলে?

প্রণব প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, দুজনেই সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন?

—সানন্দে কিনা জানি না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মত দিয়েছিলেন। কোনো আপত্তি করেন নি।

প্রণব আর কিছু বলল না। একটু যেন বিস্মিত হল। কিন্তু ভাবল, হয়তো সংসার-ত্যাগের ব্যাকুলতাতেই আপত্তি করেননি। কিংবা হয়তো ভেবেছেন, এ ভালো হল যে, অরুণার সুখপরায়ণ অযোগ্য হস্ত থেকে বিমানকে মানুষ করার ভার শিক্ষিতা ইংরেজ-রমণীর হাতে গেল। কে জানে কি তাঁরা ভেবেছেন। প্রণব ওঁদের মনের কথা জানে না।

অরুণা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওঁরা আমার জন্যেই চলে যাচ্ছেন না তো?

—তা তো জানি না, অরুণা। তুমি তো জান, ওঁদের সঙ্গে এ আলোচনা আমি কখনও নিজে থেকে করি না।

অরুণা ম্লানমুখে নিঃশব্দে বসে রইল।

প্রণব বললে, তোমার জন্যে নয় বোধ হয়। কেননা আশ্রমে যাবার ইচ্ছা ওঁদের অনেক দিনের। তুমি আসায় হয়তো সেই সুযোগ ঘটেছে।

অরুণা তথাপি সাড়া দিল না।

স্বামীজির থাকবার কথা দুদিন। কিন্তু থাকতে হল প্রায় এক সপ্তাহ। তরঙ্গিণীদের গোছগাছ করা আছে; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেওয়া আছে। অনেক কিছুই করার আছে, যা দুদিনের কাজ নয়।

সুতরাং ওঁদের জন্যে স্বামীজিকেও থাকতে হল।

প্রণবের এই সময়টা যেন কাজ অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। সকালে যে-সময়ে সে সিনিয়রের বাড়ি যেত, কাজের চাপে এখন তার চেয়ে অনেক আগে যাচ্ছে। ফিরে এসে বিশ্রামের অবসর নেই। তখনই দুটো নাকে-মুখে গুঁজে কোর্টে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেক দিন সিনিয়রের বাড়ি থেকেই হয়তো কোর্টে বেরিয়ে যায়। কোন দিন হয়তো কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে পারে না। একেবারেই সিনিয়রের বাড়ি চলে যায়। ফেরে রাত্রি এগারটায়।

অরুণা অনুযোগ করে,—মা'রা চলে যাচ্ছেন। হয়তো আর কোনো দিনই ফিরবেন না। আর এই সময়টায়

বাধা দিয়ে প্রণব বললে, কি করব বল? মক্কেলের কাজ, তারা তো শুনবে না।

নয়তো বলে, কি হবে মায়া বাড়িয়ে, অরুণা। সংসারে এসে পর্যন্ত মায়ের কোলে আমি একেশ্বর। কখনও কাউকে অংশ দিতে হয়নি। তারপরেও যদি আশ না মিটে থাকে, কোনোদিন মিটবে না। কিন্তু সেই স্বার্থের লোভে মাকে তো আমি আটকে রাখতে পারি না!

অরুণা কুণ্ঠিতভাবে তরঙ্গিণীর পিছু পিছু ঘোরে। তাঁর ফাইফরমাস খাটে। বাঁধা-ছাঁদা করে। কুণ্ঠিতভাবে, কেননা তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে যে, হয়তো বা তারই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এ'রা চলে যাচ্ছেন।

অথচ তরঙ্গিণীর ব্যবহারে সেরকম কোনো ভাব প্রকাশ পায় না। তিনি বেশ হাসিখুশি। কথায় কথায় তাঁর অরুণাকে প্রয়োজন হচ্ছে। সন্ধ্যায় ছাদে বসে তাকে তিনি সংসার সম্বন্ধে কত উপদেশ দিচ্ছেন। গৃহলক্ষ্মীর কর্তব্য কি,—গুরুজন, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় শিক্ষা দিচ্ছেন। তার কিছু অরুণার মনের মতো হচ্ছে, কিছু বা হচ্ছে না। না হলেও, নিঃশব্দে সমস্তই সে শুনে যাচ্ছে।

অরুণা নানা ব্যাপারে বুঝতে পারছে তার উপর তরঙ্গিণীর কত স্নেহ। কখনও পুরাতন বৃদ্ধা ঝি বাসিনীকে বলছেন, বাসিনি, বৌমা আমার ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানে না। তুই রইলি। আমার মতো করে সব দিক সামলে নিবি, সমস্ত কিছু চালিয়ে নিবি। যেন কারও কোনো কষ্ট-অসুবিধা না হয়।

কখনও ডাকছেন ঠাকুরকে। বলছেন, ঠাকুর, কে কী খায়, কে কী খেতে ভালবাসে, বৌমা ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। তুমি সমস্ত কাজ গুছিয়ে করবে।

সন্ধ্যাবেলায় বললেন, খোকা আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছে, বৌমা। কেন জান?

—বলছেন, কাজের নাকি খুব চাপ।

স্বামীর প্রসঙ্গে সৌদামিনী নিরুত্তর থাকত। কিন্তু অরুণা কথা বলে।

—ছাই চাপা!—তরঙ্গিণী হেসে উঠলেন,—বড়ো ছেলে, পাছে তোমাদের সামনে কেঁদে ফেলে, তাই অমন করছে। বুঝতে পারছ না?

—তাই হবে, মা! বোঝা যায়, ওঁর মন ভালো নেই। কিন্তু ভয়ানক চাপা তো!

—তুমি ঠিক ধরেছ, মা। ভয়ানক চাপা। বাইরে থেকে মনে হয়, খুব গম্ভীর, খুব শক্ত। আসলে কিন্তু ভয়ানক নরম।

সে-রাত্রেও প্রণব ফিরে এল অনেক রাত্রে। এসে মাকে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। বললে, আজ আমি তোমার ঘরে খাব, মা।

—বেশ তো। অ বৌমা, বাসিনীকে বল খোকার খাবার জায়গা এই ঘরে করে দিতে।

খেতে বসে কিন্তু প্রণব একটা কথাও বললে না। মুখ নিচু করে নিঃশব্দে খেয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই তরঙ্গিণীরা চলে যাবেন।

খেয়ে উঠে প্রণব বললে, আমি তোমার ঘরেই শোব, মা।

—বেশ তো।

বিমানের জন্যে তরঙ্গিণীর ঘরে ছোট খাটের বদলে একটা বড় খাট পাতা হয়। সেটা এখনও আছে। সুতরাং আর এক জনের শোয়ার কোন অসুবিধা নেই।

সেইখানে শুয়ে সারারাত্রি মাতা-পুত্রে একান্তে কত গল্প হল। সৌদামিনীর গল্প আর বিমানের গল্প। নতুন বিবাহের পর সৌদামিনীর গল্প সে আর কারও সঙ্গে করেনি। বিবাহের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত আনন্দ সে সৌদামিনীর কাছে পেয়েছে, স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তাই সে বলতে লাগল।

তারপর বিমানের গল্প :

—সেখানে সে কেমন আছে মা, কে জানে! তোমার কাছে না শুলে তার ঘুম হত না। কে জানে, এখন কি করে ঘুমুচ্ছে।

শুনে তরঙ্গিণীর বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। মুখে বললেন, ভালোই আছে সে, ভাবছিস কেন? আমি ভাবি না, তুই ভাবছিস! সবই ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে যায়। ওর বয়সী আরও কত ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে সেও দেখবি বেশ আছে।

—সেই কথাই তো মেমসাহেব লিখেছে। নিজে তো সে এখনও চিঠি লিখতে পারে না। তার নিজের হাতের চিঠি পেলে সুস্থ হতাম। আর

নিজের হাতের চিঠি এলে প্রথম চিঠিখানা তখনই আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দোব। কেমন?

—দিস। আমার ঠিকানাও দিয়ে দিস। মেমসাহেব যেন মাঝে মাঝে আমাকেও চিঠি দিয়ে ওর কথা জানায়।

—বড়দিনে ও তো আসছে, মা। সেই সময় একবার আসবে?

—না বাবা। আর ফেরার ইচ্ছা নেই। তোমাদের আর একটি যখন খোকা-খুকু হবে, বিমানকে সুদ্ধ নিয়ে তখন একবার বরং যেও। আর একটা কথা বলে যাই। ভগবান যেদিন তাঁর চরণে টেনে নেবেন, তখন টেলিগ্রাম পেলে সমস্ত কাজ ফেলেও যেন ছুটে যেও। যত শক্ত হবারই চেষ্টা করি, মনে হচ্ছে সে সময় তোদের মুখ না দেখতে পেলে বুঝি শান্তি পাব না।

প্রণব চট্ করে বললে, না-ই গেলে, মা। এখানে থেকে কি ধর্ম করা যায় না?

তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি বললেন, না, বাবা। ও সব কথা বলিস না। ভোর হয়ে আসছে। ঘুমো এবার।

ব'লে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

অনেক দিন পরে বিমানের একখানা চিঠি এল। এইটেই তার প্রথম চিঠি। বাঁকা-বাঁকা, ভাঙা-ভাঙা অক্ষরে ইংরিজিতে লেখা। বেশ বোঝা যায়, ওর পিছনে বসে আছেন ওর শিক্ষয়িত্রী, অথবা কোনও বড় ছেলে।

প্রণব তখন অফিসে বসে একটা জটিল মামলার সমাধান খুঁজছিল। চিঠিখানা পড়ে খুশি হয়ে তখনই সে চলল উপরে অরুণাকে চিঠিটা দেখাবার জন্যে।

অরুণা তখন একটা শোফায় বসে তার বাচ্চা ফক্স-টেরিয়ারটাকে আদর করছিল। এটা ক'দিন হল অরুণার জামাইবাবু ওকে উপহার দিয়েছেন। আপাতত এটাকে নিয়েই তার সময় কাটছে।

যেটা আগে ছিল তরঙ্গিণীর ঠাকুরঘর, সেইটেই হয়েছে কুকুরটার শয়নঘর। ওর জন্যে একটা ছোট্ট খাট কেনা হয়েছে এবং কম্বল। কম্বলের একটা জামাও ওর জন্যে তৈরি হয়েছে।

প্রণব চিঠিখানা ওর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে পাশের একটা চেয়ারে

বসে পড়ল। বলল, বিমানের চিঠি। নিজের হাতের লেখা। পড়।

অরুণা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে ফেলল। বলল, ইংরিজিতে লিখেছে। কী আশ্চর্য!

—সত্যি। ও যে এত শিগগির লিখতে শিখবে ভাবিনি। আজকেই এটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। তিনি বলে গিয়েছিলেন।

—নিশ্চয়। মা তো পড়তে পারবেন না। কিন্তু তবু খুব খুশি হবেন। বাবা পড়ে শোনাবেন এখন।

—তাঁদের ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে। হয়তো সেখানেও বিমান চিঠি দেবে। তবু এটা পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আর শোন, আমার একটি সাহেব-মক্কেল একটা ভালো বাবুর্চির কথা বলেছে। আজকে তাকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন। তার সঙ্গে কথা বোলো। কিন্তু তাই বলে ঠাকুরকেও তাড়িও না যেন।

—রাঁধবার জন্যে দুজন লোক থাকবে?

—তা থাক। অনেক দিন আছে, বুড়ো বয়সে যাবে কোথায়? তা ছাড়া তোমার ঝি-চাকরের রান্নাও তো দরকার। তারা তো আর বাবুর্চির হাতে খাবে না।

—সে ঠিক। ওটাও থাকবে তাহলে। কিন্তু দুটো রান্নাঘরও তো দরকার হবে তাহলে?

—বাবুর্চির রসুইখানা নিচে করো।

—তাই হবে। কিন্তু তুমি সন্ধ্যার আগে ফিরছ তো?

—কেন বল তো?

—বাঃ! ভুলে গেলে? বায়োস্কোপের টিকেট কেনা হয়েছে না?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো আজকেই? ফিরব।

অরুণা একটা কটাক্ষ হেনে বললে, দেখ, ডুবিও না যেন! আর শোনো আমি বলছিলাম কি, বাবুর্চি পাওয়া গেলে, পার্টিটা সামনের রবিবারে না করে পরের রবিবারে করলে ভালো হয় না?

— তাতে কি সুবিধা হবে?

—বিমান থাকতে পারবে। তার তো ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

—সেই ভালো। বিমানের কথা আমার মনে ছিল না। সে খুব খুশি হবে।

—তা ছাড়া বড়দিনের বন্ধে সুচরিতাও নিশ্চয় কলকাতায় আসবেন। তিনিও যোগ দিতে পারবেন। চোখে তো দেখলাম না, শুধু নামই

শুনেছি। এই সূত্রে পরিচয় হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের লন্‌টা ঠিক করে ফেলতে হবে।

অন্যমনস্কভাবে প্রণব জবাব দিলে, হ্যাঁ।

—কেন বল তো?

প্রণবের ধ্যান ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—তোমার সুচরিতা কেমন টেনিস খেলেন, একবার দেখব।

—ও।

প্রণব আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বললে, আমি চললাম। কতকগুলো জরুরী দলিল নিচে ফেলে রেখে এসেছি।

কুকুরটাকে একটু আদর করে প্রণব নিচে চলে গেল।

সেদিন সকালে প্রণবের হাতে কোনও কাজ ছিল না। নিচের বসবার ঘরে একটা শোফায় বসে অলসভাবে একটা সিগারেট খাচ্ছিল। বাইরে একটা গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে দেখে সর্বনাশ।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়কে তার নতুন বেয়ারাটা আটকেছে। ভিতরে ঢুকতে দেবে না। তারও দোষ নেই। ন্যায়পঞ্চাননের পায়ে একজোড়া তালতলার চটি, গায়ে শুধু একটা বনাতের আলোয়ান। বেয়ারাটা ভেবেছে, কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ অথবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা,—এসেছে বোধ হয় ভিক্ষার জন্যে। এ-বাড়িতে যে এমন ভিক্ষুক প্রায়ই আসে তা নয়। হয়তো সে তার অতীত অভিজ্ঞতার উপর কিছু বুদ্ধি খরচ করে এই ধারণায় উপস্থিত হয়েছে।

সুতরাং ন্যায়পঞ্চানন যত বলছেন, তিনি ভিতরে যাবেন, প্রণবের সঙ্গে দেখা করবেন, বেয়ারা ততই তাঁকে ধমকাচ্ছে, সাহেব এখন ছোট-হাজিরায়, এখন দেখা হবে না।

ছোট-হাজিরা কী বস্তু ন্যায়পঞ্চানন জানেন না। ধমক খেয়ে ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে উঠেছেন। তিনি তবু তাকে বোঝাচ্ছেন, যে-হুজুরই আসুন বাপু, আমার তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

বেয়ারা গম্ভীর চালে নিঃশব্দে শুধু ঘাড় নাড়ছে, যাওয়া হবে না।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে প্রণব ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম করলে। বললে, আসুন আসুন। খবর সব ভালো তা? কখন এলেন আপনি?

ন্যায়পঞ্চানন তখন ঘেমে উঠেছেন। বললেন, দাঁড়াও ভাই, আগে একটু সামলে নিই, তারপরে জবাব দিচ্ছি।

সোফায় আরাম করে বসে বললেন, এসেছিলাম তকিপুরের রাজবাড়িতে শ্রাদ্ধের পণ্ডিত-বিদায় নিতে। কালকের দিনটা সেইখানেই গেছে। ওঁরা তো আজকাল আর দেশে থাকেন না। এখানেই হল। তা খুব ধুমধাম করেছে ভায়া।

ন্যায়পঞ্চানন শ্রাদ্ধের ফর্দ দিতে লাগলেন।

অন্যমনস্কভাবে প্রণব বললে, তারপর?

—তারপর সকালে ভাবলাম, তোমার সঙ্গে, তোমার নতুন গিন্নীর সঙ্গে একবার দেখা করে না গেলে তোমার শ্বশুর দুঃখ করবেন। আবার দুদিন পরে খবর হয়তো তুমি পাবেই, তখন তুমিও দুঃখ করবে। তা এসে কি বিপত্তি দেখ! তোমার বেয়ারাটা

ন্যায়পঞ্চানন হাসতে লাগলেন। বললেন, বেশি বসবার সময় নেই। আমাকে আবার যেতে হবে সেই বাগবাজার।

—সেখানে কি?

—সেখানে একবার যেতে হবে রামজয় শিরোমণি মশায়ের কাছে। একটা অনুপপত্তি আছে। চল. তোমার গিন্নী দেখে আসি। না, পরদানশীন করে রেখেছ?

প্রণব হেসে বললে, না না। চলুন, আশীর্বাদ করে আসবেন। কিন্তু আপনার আহারাদি? এইখানে দুটি খেয়ে গেলে

—সে পরে হবে। এখন চল তো।

অরুণার সম্বন্ধে প্রণবের ভয় আছে। এই স্বল্পবাস ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্পর্কে বেয়ারার মতো তারও ভুল করার সম্ভাবনা যে নেই, তা নয়। প্রণবের ইচ্ছা ছিল অরুণাকে আগে এঁর সম্বন্ধে সতর্ক এবং সচেতন করে দিয়ে তারপরে এঁকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আপন খেয়ালেই রয়েছেন। সে সুযোগ প্রণব পেলে না। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তার সঙ্গেই চলেছেন।

সুতরাং সিঁড়ি থেকেই প্রণব হাঁকতে লাগল : এই দেখ, কাকে নিয়ে আসছি। চিনত পার কি না দেখ।

অরুণা তখন দোতলার বারান্দায় শোফায় বসে তার সারমেয়-শাবককে নিয়ে মত্ত। প্রণবের চিৎকারে সে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণ।

হতাশভাবে সে আবার শোফাতেই বসতে যাচ্ছিল।

প্রণব বলল, সৌদামিনীর পিতৃকুলের গুরুদেব। মস্ত বড় পণ্ডিত। প্রণাম কর।

অরুণা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যে কখনও দেখেনি, তা নয়। কিন্তু এই শ্রেণীর উত্তরীয়মাত্রসম্বল পণ্ডিতদের উপর তার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তবু স্বামীর কথায় এবং স্বাভাবিক ভদ্রতাবশত ঈষৎ হেসে দুহাত কপালে তুলে ছোট্ট একটি নমস্কার করল।

এই বারান্দায় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আরও একবার এসেছেন। তখন এটা খালি ছিল, শোফা-সেট্‌টা ছিল না। এই খালি বারান্দায় আসন পেতে সৌদামিনী পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেইখানে, অঙ্কে সারমেয়-শাবক নিয়ে, অপূর্ববেশা এই তরুণীর ক্ষুদ্র নমস্কারের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কুকুরের বাচ্চা থেকে তাঁর হতচকিত দৃষ্টি গিয়ে আটকে গেল অরুণার পায়ের হাল্‌কা চটি-জোড়ায়।

অরুণার নমস্কারের উত্তরে স্খলিতকণ্ঠে একবার বললেন, জয়োঽস্তু। তারপর আবার বললেন, বেশ বেশ।

প্রণব দাঁড়িয়ে প্রমাদ গণতে লাগল।

কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিত তখনই নিজেকে সামলে নিলেন। উচ্চ হাস্যসহকারে বললেন, বাঃ! তোমার স্ত্রীভাগ্য তো বড় ভালো হে! চমৎকার বউ পেয়েছ!

ওঁর সহজ রসিকতায় প্রণব যেন বুকে বল পেলে। উনি বসতে দ্বিধা করছেন দেখে তাড়াতাড়ি ওঁর দিকে একটা কাঠের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, এতে আপনার অন্তত ঈর্ষার কিছু নেই। স্ত্রীভাগ্য আপনার মতো ক'জনের?

—তুমি কি আমার ব্রাহ্মণীকে দেখে বলছ, না অনুমানে বলছ?

ন্যায়পঞ্চানন চেয়ারটায় বসে খানিকটা নস্য আরাম করে নাসিকা-বিবরে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রণব সহাস্যে বললে, তাঁকে দেখার আবশ্যক করে না। আপনার পরিতৃপ্ত মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

—তাই নাকি? তা তোমরা ব্যারিস্টার মানুষ, লোকের মুখ দেখেই তার ভিতরের কথা টের পাও।

—ঠিক টের পাই কিনা বলুন।

—তা কি করে বলি বল? এমন তো হতে পারে, পাছে তোমার

চন্দ্রাননা গৃহিণীকে নিয়ে পলায়ন করি, সেই ভয়ে এ একটা আত্মরক্ষার কৌশল মাত্র।

বলেই ন্যায়পঞ্চানন অট্টহাস্য করে উঠলেন।

এই রসিকতা সহ্য করা অরুণার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, এক মিনিট, আপনারা গল্প করুন, আমি এখনই আসছি।

ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গি ন্যায়পঞ্চাননের দৃষ্টি এড়াল না। রসিকতা বন্ধ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খোকাকে দেখছি না,—কী যেন তার নাম?

—বিমান। সে তো এখানে নেই। দার্জিলিং-এ পড়ে।

সবিস্ময়ে ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে কেন? এখানে অসুবিধা কি হল?

—না। অসুবিধা নয়। সেখানে শিক্ষা-দীক্ষাটা খুব ভালো হয়।

—ও! বাবা-মা?

—তাঁরা তো স্বামীজির আশ্রমে চলে গেছেন।

—তাই নাকি? শুনিনি তো। বাঃ। বাঃ! উত্তম! 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ'। খুব ভালো। চিঠিপত্র পাও?

—খুব কম।

—কমই তো হবে, ভাই। এই মায়া-প্রপঞ্চময় সংসার যাঁরা পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের কাছে ঘন ঘন সংবাদ তো প্রত্যাশা করতে পার না। বেশ, বেশ! তাঁদের কল্যাণ হোক! লিখ, আমি তাঁদের আশীর্বাদ করছি। স্বামীজিকেও নমস্কার জানিও।

তারপর বললেন, তাহলে এ-বাড়িতে তোমরা দুজনে কপোত-কপোতী। নিরন্তর কূজন চলেছে। অ্যাঁ!

প্রণব হেসে বললে, আপনি ভুল করছেন। এখনকার তরুণদের আপনাদের কালের মতো অখণ্ড অবকাশ তো নেই। কূজন করবে কখন?

—তাই নাকি? তা তো জানতাম না। তোমরা তাহলে আর বর্ষায় 'মেঘদূত' পড় না?

—না। সময় কই? তার বদলে গাদা-গাদা ব্রীফ পড়তে হয়।

—অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমি ভাবতাম,......যাই হোক, এবারে উঠতে হবে। এটা কে?

বাবুর্চিটা কী প্রয়োজনে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। তার দীর্ঘ

শ্মশ্রু এবং বিচিত্র পোশাক দেখেই ন্যায়পঞ্চানন সবিস্ময়ে প্রশ্নটা করেছেন।

এবং প্রণব উত্তর দেবার পূর্বেই বাবুর্চি একটা দীর্ঘ সেলাম ঠুকে বললে, জি হজুর! আমি এনায়েৎ। সাহেবের খানা পাকাই।

সর্বনাশ!

ন্যায়পঞ্চানন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, হুঁ। আচ্ছা, উঠলাম ভাই। কল্যাণ হোক, তোমাদের কল্যাণ হোক।

এর পরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে তাঁকে আটকানো নিষ্প্রয়োজন। প্রণব গেট পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

ফিরে আসতেই অরুণা যেন প্রণবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লঃ

—কে ওই অসভ্য লোকটা? সরাসরি ওপরে এনে হাজির করেছিলে?

প্রণব হাসলে। বললে, ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম, ওঁর সঙ্গে ব্যবহারে তুমি আর-একটু স্থিরবুদ্ধি এবং কৌশল দেখাবে।

—স্থিরবুদ্ধি এবং কৌশল? কেন? গরজটা কিসের?

তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, সিঁড়ি থেকে যেমন উচ্ছ্বসিত-ভাবে চেঁচাতে লাগলে, মনে হল বুঝি মিঃ জাস্টিস হোয়াইটকে নিয়ে আসছ!

—না। ইনি মিঃ জাস্টিস ব্রাউন, এখন অবসর নিতে চলেছেন।—প্রণব গম্ভীরভাবে বললে,—অরুণা, ইংরেজ আমাদের অভিভূত করেছে। সেই স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। সেই দুর্বার গতিপথে ন্যায়পঞ্চাননদের বাধা কুটোর মতো ভেসে যাবে, তাও জানি। তবু নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে কটিবস্ত্রসম্বল যে ভিক্ষোপজীবীর দল আমাদের সনাতন ধর্ম এবং প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের অশ্রদ্ধা কোরো না।

—করব না। কিন্তু তাই বলে যা বিশ্বাস করি না, তোমার মতো তারই ফাটা-পায়ের ধুলো নিতে পারব না। মাগো! বেয়ারা-খানসামারা কী হাসাহাসিই করলে!

—আমি কিন্তু হাসিনি। বিদায় দিলাম, কিন্তু ভক্তিভরে প্রণাম করেই বিদায় দিলাম।

—কেন? বিদায়ই যদি দিই, তাহলে ভক্তিটা আবার কেন? ভণ্ডামি নয় সেটা?

—না। তার কারণ বোধ হয়, ইংরেজিয়ানায় তোমার মতো এখনও আমি পোক্ত হতে পারিনি। বোধ হয়, ওঁদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশা এখনও নিঃশেষ হয়নি।

—প্রত্যাশাটা কিসের শুনি?

—আগুনের।

—আগুনের! তার মানে?

—তার মানে, অনেক দিন পরে একদিন হয়তো 'ইংরেজ হওয়া' সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ব। এঁদেরও বংশ সেদিন হয়তো নিঃশেষিতপ্রায় হবে। আমার কেমন মনে হয়, সেইদিন কোন অগ্নিহোত্রী কোথাও কোনো গুহায় যদি আত্মগোপন করে থাকেন, তাঁরই কাছে গিয়ে হয়তো আমাদের হাত পাততে হবে।

এ-সমস্ত কথা অরুণার মেমসাহেবের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে। সুতরাং দুর্বোধ্য।

বিস্ফারিত চোখে সে বললে, সর্বনাশ! তুমি যে গির্জার পাদরি-সাহেবের মতো গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিতে শুরু করলে!

প্রণব হেসে বললে, তাই তোমার মনে হবে। কারণ, গুরুগম্ভীর বক্তৃতার নমুনা হিসাবে ও-ছাড়া আর কিছুই তোমার সামনে নেই। কিন্তু অরুণা, ঢালের আর একটা দিকও আছে। ভাববার কথা উভয় দিকেই যথেষ্ট।

—তুমিও এসব ভাব নাকি? আমি তো জানি, ভাববার সময় কাটে তো তোমার ডিনারের পর। তখন তো নেশার মৌজে গোলাপী-লোকে থাক।

অরুণা উপহাসভরে হাসতে লাগল।

প্রণব স্বীকার করলে, তুমি নিতান্ত মিথ্যা বলনি, অরুণা। সুস্থভাবে ভাববার সময় আমার নেই। তবু এক একদিন কী হয় জান, চোখে গোলাপী নেশার আমেজ, হাতের সিগারেট থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে, আর মাথার ওপরে উদার অনন্ত আকাশে লাখো-লাখো তারা চিকমিক করে তখন, মাঝে মাঝে, এসব চিন্তাও মাথায় আসে। যাই হোক, তোমার জন্যে একখানা মোটরের অর্ডার দিয়েছি।

আজ দুপুরে নিয়ে আসবে। চড়ে দেখ, পছন্দ হলে ওদের বলে দিও। না হলে, অন্য গাড়ি আনতে বোলো।

অরুণা উৎফুল্ল হয়ে উঠলঃ তাই নাকি! আজকেই আসবে?

—সেইরকমই তো কথা। আর তোমার লন্‌ও তো প্রস্তুত।

—দেখেছ? কেমন হয়েছে?

—চমৎকার!

—সত্যি। এই মালিটা ভালো। এটাকেই রাখব ভাবছি। একটু মাইনে হয়তো বেশি নেবে। তা হোক, লোকটা কাজের।

—আচ্ছা, পল্টু বোসের পার্টিটা কবে?

—থার্টিন্থ, রবিবারে।

—বিমান আসছে কবে?

—টোয়েণ্টিয়েথ, দার্জিলিং মেলে। সেদিন হাতে কোনো কাজ রেখ না যেন।

—না। সুচরিতাও আসছে তার পরের দিন।

—আমরা কি স্টেশনে যাব রিসিভ করতে?

—কি দরকার? পরের দিন সকালে গেলেই চলবে।

প্রণব নিচে নেমে গেল।

জলপাইগুড়ি পৌঁছুবার কিছুদিন পরে কী মনে করে সুচরিতা প্রণবকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। নিতান্ত মামুলী চিঠি। তাতে ছিল, জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক বিবরণ, তার নতুন কর্মজীবনের কাহিনী এবং প্রণবদের কুশল প্রার্থনা। এর উত্তরে প্রণব একটা আবেগপূর্ণ চিঠি দেওয়ার ফলে উভয়ের হৃদয়দ্বার অনর্গল হয়ে যায়। চিঠিগুলি ইংরিজিতে লেখা। তার অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়ঃ

প্রণব জবাব দিয়েছিলঃ

শিক্ষাবিভাগে চাকুরি নিয়ে তোমার জলপাইগুড়ি যাওয়ার খবর বরদার কাছ থেকে আগেই পেয়েছিলাম। এতদিন পড়াশুনার অজুহাতে তুমি বিবাহে সম্মত হওনি। কিন্তু এম-এ পাস করার পরেও যখন

হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে তুমি জলপাইগুড়ি চলে গেলে, তখন তোমার বাড়ির সকলে বিস্মিত এবং ব্যথিত হন। তোমার এই ব্যবহারের কারণ তাঁদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু আমার কাছে ঠিক ততখানি দুর্জ্ঞেয় নয়। সেজন্যে আমিও মনে-মনে খুব কষ্ট পাচ্ছি।

অথচ কী-ই বা করা যেতে পারত?

তুমি বোধ হয় জেনেই গেছ যে, পড়বার জন্যে বিমানকে দার্জিলিং পাঠানো হয়েছে। সুবিধে পেলে তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরো।

অরুণা এবং আমি নিজে ভালোই আছি।

এর উত্তর দিতে সুচরিতার ক'দিন দেরি হয়েছিল। হবারই কথা। মনটা তার কিছুতে তৈরি হতে চাইছিল না। ওদের মন তৈরি হতে সময় নেয়। কিন্তু একবার তৈরি হলে আর দ্বিধার লেশমাত্রও রাখে না।

সুচরিতা লিখেছিল প্রথমেই বিমানের কথা। তার ফলে চিঠিটা শুরু করা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কয়েক দিনের একটা ছুটি পেলেই বিমানের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। তার পরেঃ

আমার চাকুরি নেওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছে দুর্জ্ঞেয় বোধ হলেও তোমার কাছে হয়নি কেন বুঝলাম না। কী কথা মনে করেই বা তুমি কষ্ট পাচ্ছ? আমার অবিবাহিত জীবনের কথা? আমাদের দেশে মেয়েরা বড় একটা অবিবাহিত জীবনযাপন করে না সত্য। কিন্তু কেউ কেউ তো করছে এখন। বিবাহিত জীবনের শৃঙ্খল কেউ কেউ পছন্দ করেন না। অন্য কোনোও কারণে হয়তো কারও বিবাহে অনিচ্ছা জন্মে। আজকের দিনে সেটা এমনই কি অস্বাভাবিক?

তা ছাড়াও আরও কিছু কি তুমি ভেবেছ? যেমন ধর, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, এমনই গভীর ভালবাসা যে, তোমাকে পাওয়ার কোনও আশাই যখন রইল না, তখন অবিবাহিত থাকারই সংকল্প করলাম? তা যদি হয়, তাহলে পুরুষের পক্ষে সে তো কষ্টের কথা নয়, গর্বের কথাই। তুমি কষ্ট পাচ্ছ কেন তাহলে?

এই খোঁচা প্রণবকে বিঁধল। তার সংযমের বাঁধ ভাঙল। সে লিখলে একখানা লম্বা চিঠি। লিখলে :

কষ্ট পাচ্ছি কেন? যে কষ্ট অপরাধী বিবেককে পেতেই হবে, তার থেকে কে আমাকে বাঁচাবে বল? সুচরিতা, জীবনটা যদি সত্যই স্বপ্ন হত আর স্বপ্নটা জীবন, কী আনন্দই না হত তাহলে! কিন্তু বিধাতার পরিহাস কোন্ পথে চলে কেউ জানে না। একটা অনিবার্য বিধানে তোমার কাঁধে চিরকৌমার্য চাপিয়ে দিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলাম অনুশোচনার বোঝা। বাইরে থেকে মনে হবে এ আমারই কাজ, এর দায়িত্ব আমারই। অথচ আমি জানি, তুমিও জান, এ ঘটনাপ্রবাহের উপর আমার কোনই হাত ছিল না।

অবসর বড় একটা পাই না। এও বিধাতার আর একটা পরিহাস, তিনি আমাকে প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিস্টার করবার জন্যে যেন উঠে-পড়ে লেগেছেন। সুতরাং শান্তভাবে, সুস্থভাবে, গভীরভাবে নিজের কথা ভাববার সময়েরও একান্ত অভাব।

তারই মধ্যে ক্বচিৎ কোনও রাত্রে আইন-ঘটিত কোনও ব্যাপারে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের জন্যে চোখে ঘুম আর নামে না, মনে পড়ে তোমাকে। পাশে শুয়ে অরুণা, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কল্পনা কর সুচরিতা, পাশে শুয়ে অরুণা,—অসতর্ক, অসজ্জিত, নিরস্ত্র এবং নিশ্চিন্ত; ভাবছি তোমার কথা! একজন বিবেকবান ভদ্রলোকের পক্ষে এ কি সহজ শাস্তি!

তোমার বিবেক পরিষ্কার। তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ। তোমার জীবন নির্মল। চোখে তপস্যার অঞ্জন। আমার বিবেক দংশন-পরায়ণ, হৃদয় শূন্য, জীবন জ্বালাময়, চোখে কলঙ্কের কালিমা! তোমার জন্যে রইল কৃচ্ছ্রসাধনার সমস্ত গৌরব, আমার জন্যে অপকলঙ্ক। অথচ—কে জানে তুমি নিজে কী ভাব,—বাইরের লোকে ভাববে আমিই সব-পাওয়াদের দলে, তুমি সব-হারাদের।

একে তুমি বিধাতার পরিহাস বলবে না তো কি বলবে?

এই চিঠিখানা পাওয়ার পর কয়েকদিন সুচরিতার দেহ যেন শোলার মতো হালকা হয়ে গেল। তার পা যেন মাটি ছোঁয়-ছোঁয়-ছোঁয় না। তার হৃদয়ের কোষে-কোষে যেন অনবরত মধুক্ষরণ হচ্ছে, আর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে স্বপ্ন। সকল কথা যেন সে শুনতে পায় না। অনেক কথা শুনতে পায়, কিন্তু বুঝতে পারে না। বক্তার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

এ তার হল কি?

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে যায়। অকারণেই হয়ত কাছের মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে ছোট ছোট মেয়েদের গল্প বলতে বলতে হঠাৎ খেই হারিয়ে যায়,—খেই খুঁজে না পেয়ে লজ্জা পায়। না যায় খেলার মাঠে, না বেড়াতে।

কত বার যে দোয়াত-কলম নিয়ে প্রণবের চিঠির জবাব দিতে বসল তার আর ইয়ত্তা নেই। কখনও একটা লাইনও লিখতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়। কখনও এক লাইন লিখেই সেটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একটি বিশেষ কথা বিশেষ একটি ভঙ্গিতে সে লিখতে চায়। কিন্তু না খুঁজে পাচ্ছে সেই বিশেষ কথাটি, না সেই ভঙ্গিটি। এবং যে জিনিসটি সুনিশ্চিত আছে, হারায়নি,—সেই জিনিসটা খুঁজে না পেয়ে যেমন মনের মধ্যে অস্বস্তি ভারী হয়ে ওঠে, তেমনি একটা অস্বস্তি ওর মনের উপর সব সময় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে রইল।

অবশেষে লিখলে শুধু দুটি লাইন :

২২শে কলকাতায় ফিরছি। দেখা করবে তো? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাত্র দুটি লাইন। কিন্তু মনে হল লেখা ও না-লেখা মিলিয়ে যেন দুশো লাইন। এবং এইতেই তার সকল কথা লেখা হয়ে গেল।

প্রণব কিন্তু তবু সংক্ষিপ্ত হতে পারলে না। অবশ্য হবার চেষ্টাও করেনি সে। লিখলে :

সমুদ্রে যার জাহাজ-ডুবি হয়ে যায়, তরঙ্গ যার একমাত্র অবলম্বন, পৃথিবীতে তার চেয়ে অকুতোভয় আর কেউ নেই। সে খোঁজে মণি নয়, মাণিক্য নয়,—ভেসে-চলার যে-কোনও একটা অবলম্বন। সম্ভব হলে হাঙরের পিঠে চড়েও সে সমুদ্র পাড়ি দিতে প্রস্তুত।

আমার অবস্থাও তাই।

সুতরাং কাউকে আমার ভয় নেই। তোমাকেও না। আর আমাকে? না, আমাকেও কারও ভয় নেই,—তোমারও না, অরুণারও না।

অতএব নির্ভয়ে তুমি আসতে পার। তুমি এলেই আমি দেখা করব। সম্ভবত সস্ত্রীক। তা ছাড়া বাড়ির পার্টিটা শুধু তোমার আর বিমানের

জন্যেই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা আছে। আর আছে টেনিস। আমাদের লনটা কী সুন্দর হয়েছে দেখবে এসে। তোমার সঙ্গে একটা গেম খেলবার জন্যে অরুণা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

এই চিঠিটা পাওয়ার পরে, সুচরিতার দেহের যেটুকু ওজন ছিল তাও যেন আর রইল না। সে যেন বাতাসে উড়তে লাগল। ২২শের তখনও হপ্তা-খানেক দেরি। কিন্তু তার যেন মনে হল সাতটা বছর! এবং এই সাত বছর যেন কোনও দিন কাটবে না।

অতএব দেহটা যদিচ তার জলপাইগুড়িতেই পড়ে রইল,—হাজিরা দেয় আর ক্লাস করে,—মনটা অতদিন অপেক্ষা করতে না পেরে বিনা টিকিটেই একদিন কলকাতা পালিয়ে গেল, এমন সঙ্গোপনে যে বাইরের লোকে তো জানতে পারলেই না, সে নিজেও পারলে না।

সকালে প্রণব কাজের চাপে সুচরিতাদের বাড়ি যেতে পারলে না। টেলিফোনে জানিয়ে দিলে সন্ধ্যায় অরুণা এবং বিমানকে নিয়ে যাবে। এবং সন্ধ্যাবেলায় সবসুদ্ধ গিয়ে উপস্থিত হল।

ঘরে তখন সুচরিতা আর তার মা বসে গল্প করছিলেন। বরদা কী একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছে। প্রণবদের আসার কথা সে জানে। বলে গেছে শীঘ্র ফেরার চেষ্টা করবে।

প্রণবের অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে সে কথা জানিয়েই সুচরিতার মা বললেন, এবারে ওকে আটকাও, প্রণব। জিগ্যেস কর ওকে, কী দুঃখে ও চাকরি করতে গেছে, কেনই বা বিয়ে করতে চাইছে না। তোমার কথা শোনে। তুমিই জিগ্যেস কর। উনি তো জিগ্যেস করেনই না। আমি জিগ্যেস করলে হাসে। অথচ চাকরি করে মেয়ের চেহারা কী চমৎকার হয়েছে দেখ!

প্রণব বললে, সত্যি, সু। তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখাচ্ছে না। শরীর কি ভালো ছিল না?

—ওটা তোমাদের চোখের ভুল। শরীর ভালো থাকবে না কেন?

সুচরিতা হাসতে লাগল। বিমানকে কোলে টেনে নিয়ে বললে, ওসব

বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে মিসেস মুকার্জির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। তুমি কবে এলে, বিমান?

বিমান জবাব দিলে, পরশু। আমাদের পার্টিতে আসছেন তো?

—তোমার মা-বাবা নেমন্তন্ন না করলে কি করে যাই, বাবা? অনেক নেমন্তন্ন পাওনা আছে তোমার মায়ের কাছে। তোমাদের লন দেখার নেমন্তন্ন, তোমার মায়ের টেনিস খেলা দেখার নেমন্তন্ন,—তারপরে

বাধা দিয়ে অরুণা সহাস্যে বললে, ওসব আবার কোথায় শুনলেন?

—শুনব কেন? 'ইংলিশম্যানে' বেরিয়েছে যে! সবাই দেখেছে।

—তাই বুঝি! 'ইংলিশম্যানে' বেরুবে আপনার খেলার খবর; আমাদের নয়।

সুচরিতার মা বিমানকে টেনে নিয়ে বললেন, ওরা ঝগড়া করুক, ভাই, আমরা ও-ঘরে বসে-বসে গল্প করিগে চল।

গল্পের নামে বিমান খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, কী গল্প বলবেন, অ্যাডভেঞ্চারের?

—না ভাই, আমি মুখ্যু মানুষ, ওসব ইংরিজি গল্প জানিনে। আমি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প জানি। আর যদি আরও ভালো গল্প শুনতে চাও, তাহলে ভীম-অর্জুনের গল্প বলতে পারি।

বিমান উৎসাহভরে বললে, তাই বলুন। ভীমের গল্প সেই ঠাক্‌মার কাছে শুনেছি, আর শুনিনি। ভুলেই গেছি প্রায়।

ঠাক্‌মার নামে সুচরিতার মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মায়ের খবর কি, প্রণব? চিঠিপত্র দেন তো?

প্রণব জবাব দিলে, মাঝে-মাঝে দেন। খুব বেশি নয়।

—আহা! শান্তি পেয়ে গেছেন আর কি! আমার মতো মহাপাপী তো নন!

সুচরিতার মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সুচরিতা হেসে বললে, অমন করে নিশ্বেস ফেল না, মা। এঁরা ভাববেন সত্যিই বুঝি তুমি মহাপাপ করেছ।

—করেছি বই কি—সুচরিতার মা জবাব দিলেন,—নইলে প্রণবের মা দিব্যি হাসতে হাসতে আশ্রমে চলে গেলেন, আর তোমার বিয়ের ভাবনা ভাববার জন্যে আমি এখানে পড়ে আছি?

—দোহাই তোমার! তুমি আর আমার বিয়ের ভাবনা কোর না। তার

চেয়ে হাসতে হাসতে আশ্রমে চলে যেতে চাও তো বল, আমি নিজে তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি এই ছুটির মধ্যে।

—তাই তো বলবি! চল ভাই, ওর সঙ্গে আমরা কথা বলব না, ও-ঘরে গিয়ে গল্প করব। তুমি নোনতা ভালোবাস, না মিষ্টি?

বিমান উত্তর দেবার আগেই সুচরিতা বললে, দুই-ই।

—দুই ই? বেশ, বেশ। চল, দেখি দুই-ই কতখানি ভালোবাসতে পার।

বলে বিমানকে নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

যাবার সময় বিমান সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, ঠাক্‌মার কাছে গল্প শুনেই আমি আবার আসব, মাসিমা।

ওর গাল টিপে দিয়ে সুচরিতা বললে, নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে মাসিমা বলতে কে শিখিয়ে দিলে বিমান, বাবা?

কেউ শিখিয়ে দেয়নি। বিমান নিজেই বুদ্ধি করে বলেছে।

কিন্তু সে উত্তর দেবার আগেই অরুণা বললে, আমি। বলে দিয়েছি পিসিমা না-বলে মাসিমা বলতে। আপনার আপত্তি আছে?

সুচরিতা হেসে বললে, কিছুমাত্র না। শুধু বুদ্ধিটা কার, তাই জানতে চাইছিলাম।

অরুণা চট্‌ করে বললে, তাহলে আর 'আপনি' নয়। আমরা এক-বয়িসীই হব। আমি তোমাকে সুচরিতাদি বলব, তুমি বলবে অরুণাদি। অথবা পরস্পরের শুধু নাম ধরেও ডাকতে পারি। কেমন?

—তাই হবে।

বিজয়িনীর মতো স্বামীর দিকে চেয়ে অরুণা বললে, তোমরা পরস্পরকে 'তুমি' বলছিলে, এমন হিংসা হচ্ছিল!

—জানি। মেয়েরা বড়ই ঈর্ষাপরায়ণ।—প্রণব সগর্বে বললে।

—তাই বুঝি!—ওরা দুজনেই হেসে উঠল,—আর পুরুষদের মনে ঈর্ষা-দ্বেষ কিচ্ছু নেই, না?

—না। তারা সাধু লোক।—প্রণব জবাব দিলে।

—তার নমুনা তুমি। কি বল?

বলে সুচরিতা কিরকম করে হাসতে লাগল।

অরুণা জিজ্ঞাসা করলে, কাল বিকেলে আসছ তো, সুচরিতাদি?

—কাল বিকেলে? কি ব্যাপার!—সুচরিতা বললে।

প্রণব অরুণার হয়ে জবাব দিলে, ওর নতুন লনে তোমার সঙ্গে এক গেম খেলবার জন্যে অরুণা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

—তাই নাকি?—সুচরিতা হাসতে লাগল,—আর তো খেলি না, অরুণাদি। খেলা ভুলেই গেছি বলতে পার।

—আহা! এত ভালো খেলতে, এর মধ্যে সেই খেলা আবার ভোলা যায়!—অরুণা বিশ্বাস করতে পারছে না।

প্রণব বললে, যায়। সাধনা করলে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেও ভোলা যায়। আমি তোমাকে বলিনি অরুণা, সুচরিতা এখন ভোলার সাধনায় মত্ত। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ভুলেছে, আর টেনিস খেলা ভুলতে পারবে না? কী যে বল তুমি!

সবাই হাসতে লাগল।

সুচরিতা বললে, ভোলার সাধনাই বটে! ভোলানাথের সাধনা।

অরুণা ঠাট্টা করে বললে, উমার মতো নাকি?

—কি জানি কার মতো! কিন্তু আমার র‍্যাকেটটা কি আছে? খুঁজে দেখতে হবে।—সুচরিতা চিন্তিতভাবে বললে।

প্রণব বললে, তাই দেখ। দেখে একটা গেম খেল। দেখা যাক কে হারে কে জেতে?

সুচরিতা তখনই ওর দিকে ফিরে বললে, সে কথা জানবার জন্যে খেলা দেখতে হবে প্রণববাবু? আমি তো না-দেখেই বলতে পারি, আমি হেরে যাব। তোমার সঙ্গেই বা ক'দিন জিতেছি বল।

বলে তখনই কথার সুর ফিরিয়ে অরুণাকে বললে, তুমি প্রণববাবুর কাছে কী শুনেছ জানি না। কিন্তু খেলতে সত্যিই আমি ভালো পারি না। শেষ পর্যন্ত হারি।

প্রণব হেসে বলল, ঠিক তার উলটো, অরুণা। তোমাকে ও ভাঁওতা দিচ্ছে। ওর খেলায় তোমার মতো জৌলুস নেই। তোমার মতো চক্ষের পলকে আশ্চর্য মার মারতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত স্টেডি। অনেক দিন তাই ওকে হারাতে-হারাতে নিজেই হেরে গেছি।

অরুণা বললে, এই দেখ! একে একে তোমার কৃতিত্ব প্রকাশ হচ্ছে!

—সব বাজে কথা, অরুণাদি—সুচরিতা হেসে বললে,—আমি হারব

সুনিশ্চিত জেনেই প্রণববাবু সান্ত্বনা দিচ্ছে আমাকে। ওর কথা শুনোনা।

প্রণব বললে, না শুনতেও পার। কিন্তু জেতবার ইচ্ছা থাকলে শুনতেই হবে। ওর সঙ্গে জিততে গেলে, অরুণা, তোমাকে তোমার চমক-লাগানো খেলা ছাড়তে হবে। ওর মতো সতর্ক হয়ে ধীরভাবে খেলে যেতে হবে। নইলে সুচরিতাকে হারানো অসম্ভব।

এমন সময় বরদা হৈ-হৈ করে ঢুকল।

অরুণার দিকে চেয়ে বললে, কতক্ষণ এসেছেন?

কোপ-কটাক্ষ হেনে অরুণা জবাব দিলে, সে খবরে দরকার কি! এলেন তো আমাদের ওঠবার সময়ে। আর দু'মিনিট পরে এলে দেখাই হত না। কোথায় গিয়েছিলেন? গিন্নী কোথায়?

হাতজোড় করে বরদা বললে, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় ছিল না। বাঁ হাতটা একেবারেই ভেঙে গেছে। প্রতিমাকে সেখানেই রেখে আসতে হল সেজন্যে।

অরুণা চমকে উঠলঃ কোথায় রেখে এলেন? কার হাত ভেঙেছে?

—আপনারা শোনেননি কিছু?—বরদা বললে,—আমার শালার।

—কি করে হাত ভাঙল? কতবড় ছেলে?

—কলেজে পড়ে। ঘোড়ায় চড়া শিখতে গিয়ে এই বিপত্তি। দেখুন কাণ্ড! বাঙালীর ছেলে, করবি তো চাকরি! আবার ঘোড়ায় চড়া কেন বাপু? হয়েছেও তেমনি শাস্তি!

বরদা হাসতে লাগল। সবাই আশ্বস্ত হল, আঘাত বেশি হলেও খুব ভয়ের কিছু নেই।

বরদা জিজ্ঞাসা করলে, কি কথা হচ্ছিল তোমাদের? মনে হচ্ছে আমি এসে যেন রসভঙ্গ করলাম।

অরুণা বললে, সুচরিতাদির খেলার সুখ্যাতি হচ্ছিল।

বরদা বললে, মুক বলছিল তো? কলকাতা শহরে সু'র খেলার ওই একমাত্র সমঝদার।

সুচরিতা জোর পেয়ে গেলঃ তুমি বল তো, দাদা, তুমি তো অরুণাদির খেলাও দেখেছ।

বরদা বললে, মিসেস মুখার্জির খেলা তোর চেয়ে ঢের ব্রিলিয়াণ্ট। ও'কে

যদি তুই হারাতে পারিস তাহলে এইজন্যে পারবি যে, তুই খুব স্টেডি।

অরুণা মনে মনে খুব খুশি হচ্ছিল।

প্রণব বললে, আমিও সেই কথাই বলছিলাম স্যার। তার বেশি কিছু নয়।

বরদা বললে, তাহলে অন্তত একবারের জন্যে তুমি চাটুবাদিতার অভিযোগ থেকে মুক্ত হলে। কিন্তু খেলাটা হচ্ছে কবে?

অরুণা বললে, কাল।

—আমার নিমন্ত্রণ আছে তো?—বরদা জিজ্ঞাসা করলে।

—নিশ্চয়ই। আপনিই তো আম্পায়ার।—অরুণা বললে।

—কেন মুকের ওপর ভরসা হচ্ছে না?—বরদা হাসলে।

—না।—অরুণাও হাসলে।

—কিন্তু খেলার শেষে খাওয়া-দাওয়া আছে তো?

—নিশ্চয়ই। রাত্রে ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে আসবেন।

সুচরিতার দিকে চেয়ে প্রণব বললে, অর্থাৎ ঘুষ। এই ঘুষেই বাঙালী জাতটাকে খেলে! তুমি খেল না, সুচরিতা।

—না, খেলব।—সুচরিতা বললে।

—আম্পায়ার ঘুষ খাবে জেনেও খেলবে?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি মরীয়া হয়ে উঠলে, সু? ভয় বলে কিছু নেই?

—না।—সুচরিতা গম্ভীরভাবে বলতে লাগল,—"সমুদ্রে যার জাহাজ-ডুবি হয়ে যায়; তরঙ্গ যার একমাত্র অবলম্বন, পৃথিবীতে তার চেয়ে অকুতোভয় আর কে আছে? সে খোঁজে মণি নয়, মাণিক্য নয়,—ভেসে চলার যে-কোনো একটা অবলম্বন। সম্ভব হলে হাঙরের পিঠে চড়েও সে সমুদ্র পাড়ি দিতে প্রস্তুত।"

—সর্বনাশ!—বিস্ময়ে বরদা গালে হাত দিলে।—তুই কি জলপাইগুড়ি থেকে কাব্যের ইনজেকশন নিয়ে এসেছিস?

বরদার কথার ভঙ্গিতে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু নিজেদের হাস্যে মশগুল হয়ে না থাকলে বুঝতে পারত, প্রণবের হাসিটা নিতান্তই কাষ্ঠহাসি। সে যেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে।

এমন সময় সুচরিতার মা এসে জানালে, ন'টা বাজে।

অরুণা চমকে উঠলঃ ন'টা! সে কি! ওঠ, ওঠ। বিমান কোথায়?

সুচরিতার মা বললেন, সে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুচরিতা সঙ্গে সঙ্গে বললে, তাহলে তাকে আর তুলে কাজ নেই। কাল সকালে পৌঁছে দিয়ে আসব।

বলে এমন করুণভাবে প্রণবের দিকে চাইলে যে, অরুণা আপত্তি করার আগেই প্রণব বললে, বেশ তো! থাক্‌ না। চল অরুণা, আর দেরি করা নয়।

—চল।

বিমানকে ফেলে যেতে অরুণার মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিন্তু প্রণবের কথার উপর আর কিছু বলতেও পারলে না।

সুচরিতা এবং অরুণা পরস্পরের খেলা না দেখলেও, প্রণব এবং বরদা উভয়েরই খেলার সঙ্গে পরিচিত। দুজনেই যে ভালো খেলে সে বিষয়ে ওদের সন্দেহ নেই। বিশেষ আজকে জেতবার আগ্রহে দুজনেরই হাত খুলে গেছে। একটা দেখবার মতো খেলা! এবং দেখতে দেখত প্রণব আর বরদা দুজনেই উল্লসিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রণব যে কতগুলো ছবি তুললে তার ইয়ত্তা নেই। লনের মধ্যে দুজনে যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো ছুটে বেড়াতে লাগল। সে একটা দৃশ্য!

খেলায় কোনও মীমাংসা হল না। দুজনেই সমান।

খেলার শেষে সুচরিতা এবং অরুণা দুজনেই দুজনের নৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা করতে লাগল।

বরদা বাধা দিয়ে বললে, পরস্পরের পিঠ-চুলকানির জন্যে যথেষ্ট সময় রয়েছে। সে সব পরে হবে। আপাতত আম্পায়ারি করে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। কী আছে বের করুন।

অরুণা হেসে বললে, আসুন আমার সঙ্গে। দেখি গলা-ভেজাবার মতো কিছু পাওয়া যায় কি না।

তারপরে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, খেলা দেখে তোমারও কি গলা শুকিয়ে গেছে?

—একটু গেছে বইকি!

—এস তাহলে।

—চল, আমি এখনই আসছি।

ওরা চলে যেতেই প্রণব সুচরিতার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। সুচরিতা চোখ নামিয়ে নিলে।

প্রণব শান্তকণ্ঠে বললে, তুমি ইচ্ছে করে জিতলে না, সু।

জড়িত কণ্ঠে সুচরিতা বললে, না না, অরুণাদি চমৎকার খেলে।

প্রণব বললে, টেনিস খেলাটা আমিও কিছু বুঝি। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। অরুণা ভালো খেলে সত্যি। তবু তুমি আজ ইচ্ছে করে জিতলে না।

সুচরিতা চুপ করে রইল।

প্রণব ধীরে ধীরে বলতে লাগলঃ তুমি আশ্চর্য মেয়ে, সু! তোমার খেলা দেখতে-দেখতে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলাম। খেলায় হার-জিত দুই-ই আছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের মনে সন্দেহমাত্র না জাগিয়ে না-জিততে গেলে কতখানি নিপুণতা দরকার, আজকে তোমার খেলা দেখে তা বুঝতে পারলাম।

সুচরিতা তথাপি নিরুত্তর।

প্রণব বললে, কিন্তু তুমি জেত না কেন, সু? জেতবার জন্যে মানুষের মনে যে স্বাভাবিক এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, তোমার কি তাও নেই?

এবারে সুচরিতা হাসলে। কান্নার মতো হাসি। ওর চোখেও যেন সেই কান্নার স্বচ্ছ ছায়া।

বললে, খেলাটা আয়ত্ত হয়ে গেলে হার-জিতের আর কী মানে হয়, প্রণববাবু? বড় কোন্‌টা? খেলাটা, না হার-জিতটা?

—হার-জিতটা। খেলা একসময় শেষ হয়, কিন্তু হার-জিতটা তারপরেও থাকে।

—নিরর্থক থাকে, থাক। আমি ওর কোনো মূল্য দিই না।

রেগে প্রণব বললে, কেননা তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর। তোমার পৃথিবী, তোমার আনন্দ, তোমার স্বপ্ন তোমার নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ।

ওর রাগ দেখে সুচরিতা হেসে ফেললে। বললে, ব্যারিস্টার সাহেব, তোমার সঙ্গে কথায় পারা কঠিন। কিন্তু গলা তোমার অনেকক্ষণ থেকে শুকিয়ে রয়েছে, মিছে তর্ক করে তাকে আরও কষ্ট দিও না। ওই দেখ, অরুণাদি ডাকাডাকি করছে। যাও।

গটগট করে প্রণব চলে গেল।

ওর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে সুচরিতা আপন মনেই হাসতে গেল।

কিন্তু কোথায় ছিল কান্নার সমুদ্র, বাঁধ ভেঙে ওর দু'চোখের কূল ছাপিয়ে উথলে উঠল।

আপন মনেই বলতে লাগল: টেনিস খেলায় তুমি তো দিক্‌পাল। তোমার চোখে তো খেলার অতি সূক্ষ্ম মারটাও এড়িয়ে যায় না মনে কর। কিন্তু আজকের খেলায় আমি যে জিতলাম না এইটেই তোমার চোখে পড়ল, হেরে গেলাম সেটা আর চোখে পড়ল না?

—মাসিমা!

বিমান কখন এসে পাশে বসেছে টের পায়নি। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি সাড়া দিলে, কি বাবা?

—খেলতে গিয়ে তোমার কি লেগে গেল?

—না, বাবা।

—তবে কাঁদছ কেন?

ব্যস্তভাবে আড়ালে চোখের জল মুছে ফেলে সুচরিতা সভয়ে বললে, কী বোকা ছেলে তুমি! কাঁদিনি তো। কাঁদব কেন?

বিমান দেখলে, তাই বটে। চোখে কান্নার চিহ্নও নেই। লজ্জিতভাবে বললে, আমি ভাবলাম তুমি কাঁদছ বুঝি!

সুচরিতা ওকে বুকে জড়িয়ে হেসে উঠল।

অরুণা এসে জিজ্ঞাসা করলে, ছেলের সঙ্গে এত হাসি কিসের?

মাথা দুলিয়ে সুচরিতা জবাব দিলে, হাসির কথা পৃথিবীতে কতই আছে, সব তুমি নাই শুনলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?

অরুণা বললে, একটু ক্লারেট ছিল। বের করে গলাটা ভিজিয়ে দিয়ে এলাম।

—তাহলে মন ভিজতে এখনও বাকি আছে। ওই দেখ, প্রণববাবু তোমাকে ডাকাডাকি করছেন।

সুচরিতা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

অরুণা সেদিকে ফিরেও চাইলে না। বললে, ডাকুক। তুমি তো জান না, সুচরিতাদি, মন ওর একেবারে সাহারা মরুভূমি। সপ্তসিন্ধুর জলেও ভিজবে না।

অরুণা হাসতে লাগল। বললে, মনের জন্যে ভাবি না, সুচরিতাদি। ও মন ভেজবার নয়। ভাবনা গলাটার জন্যে। একটু সময় নিলেও শেষ পর্যন্ত ওটা ভেজে। আর না ভিজলে ডাকে।

সুচরিতা হেসে বললে, ওই দেখ, আবার ডাকছে!

পাশ দিয়ে একটা বেয়ারা যাচ্ছিল। অরুণা তার হাতে এক থোলো চাবি দিয়ে সাহেবকে দিতে বলে দিলে। বললে, ওই বড়টা সেলারের চাবি।

তারপর সুচরিতাকে টেনে উঠিয়ে বললে, ডিনার তৈরি। চল, আমাকে একটু সাহায্য করবে। ডিনার না পড়লে ওঁরা উঠবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তোমার বৌদি তো আসতে পারলেন না। তাঁর ভাইটি আছে কেমন?

—এখনও চিন্তার কারণ রয়েছে।—সুচরিতা অরুণার সঙ্গে যেতে যেতে বললে।

অরুণা সৌদামিনী নয়। সৌদামিনী যা ভাবতেই পারে না, অরুণা তা বিশ্বাস করতে পারে। বয়সে সৌদামিনীর চেয়ে বড় না হলেও সে অনেক দেখেছে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি শুনেছে।

সুচরিতার সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে প্রণবের কাছে কিছু কিছু শুনেছে। সে এমন বেশি কিছু নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অরুণার কাছে প্রণব এ সব কথা সংযতভাবেই বলে। তাতেই অরুণার মনে সন্দেহ জেগেছে, ব্যাপারটা প্রণব যতটা সহজভাবে বলে, হয়তো ঠিক ততটা সহজ নয়। কিন্তু সুচরিতাকে নিজের চোখে না দেখে এই সন্দেহ সে প্রণবের কাছে প্রকাশ করতে চায় না।

আজ তার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়েছে। স্বামীর সম্বন্ধে যে সন্দেহ এতদিন তার মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে, সুচরিতাকে দেখে সেই সন্দেহ আরও গভীর হয়েছে। এমন গভীর যে, এ কথা এখন সে স্বামীর কাছে স্পষ্ট করে উত্থাপন করতে পারে।

কিন্তু সেইসঙ্গে সুচরিতা সম্বন্ধে তার মনে শ্রদ্ধাও জেগেছে! কী ধীর, কী কঠিন, অথচ কী শান্ত মেয়ে! যে মেয়ে কিছুতেই কোনো নিন্দনীয় কাজ করতে পারে না, তেমনি মেয়ে।

না, সুচরিতার উপর তার কোনো রাগ নেই। ঈর্ষা? তা হয়তো একটু আছে। কিন্তু সুচরিতার প্রদীপ্ত চরিত্রের সামনে অরুণার মনের অন্ধকার এক কোণে নিতান্ত সংকুচিত হয়েই আছে। সেই ঈর্ষা প্রকাশ-যোগ্য নয়। এমন কি, পরিহাসচ্ছলে স্বামীর কাছেও না।

সে-রাত্রে প্রণবের কাছে এ প্রসঙ্গ সে তুললেও না। একটু বেশিমাত্রায় মদ্যপানের ফলে প্রণব ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না। তার বেশিমাত্রায় মদ্যপানটা

অরুণার কাছে বড়ই কৌতুকের বস্তু। যেদিন বিশেষ কোনো দুঃখের কারণ ঘটে,—এবং এমন কারণ মাঝে মাঝেই ঘটে,—সেদিন সেই বিশেষ দুঃখের জ্বালা ভোলবার জন্যে তাকে পানের মাত্রা বাড়াতে হয়। যেদিন বিশেষ কোনো আনন্দের কারণ ঘটে,—তাও প্রায়ই ঘটে,—সেদিনও আনন্দের আতিশয্যে সে পানের মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না! এখন প্রশ্ন, এ-দিন সে মাত্রা বাড়ালো কেনঃ দুঃখে? আনন্দে? না, বরদার পাল্লায় পড়ে?

অরুণা ভেবে পেলে না, কোন্‌টা ঠিক কারণ। কিন্তু কারণ যাই হোক, এই অবস্থায় এমন কোমল স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সঙ্গত নয়।

প্রসঙ্গটা পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে অতি সুকৌশলে সে তুললে।

—এমন চমৎকার মেয়ে! এই অল্প সময়ের মধ্যেই কত আপনার হয়ে গেছে!

প্রণব অন্য কথা ভাবছিল। চমকে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে অরুণা বললে, সুচরিতার কথা বলছি। ভারী সুন্দর মেয়েটা।

—হ্যাঁ।

ওর পেয়ালাটা ওকে এগিয়ে দিয়ে অরুণা তেমনি নিবিষ্ট চিত্তে নিজের পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল। বললে, ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

প্রণব চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। থমকে গিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললে, সত্যি।

অরুণা চকিতে ওর দিকে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। বললে, ওকে আটকে রাখা যায় না?

—কী করে? ছুটি নেই যে।

অর্থাৎ ছুটি যদি থাকত, ওকে আরও কয়েকদিন আটকে রাখার বিষয়ে প্রণব নিশ্চয়ই অরুণাকে সাহায্য করত।

অরুণা তেমনি ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করে চলল ঃ চাকরি ছেড়ে দিক না।

এইটি ওর সরলতা বলে ভ্রম করে প্রণব উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। বললে, হলে তো ভালো হয়। তোমাদের টেনিস খেলাটা রোজ চলে। কিন্তু তাহলে খাবে কি? তোমার যে সুবিধা আছে, সে সুবিধা তো ওর নেই।

অরুণা তেমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, নেই কেন?

—কারণ তোমার বোঝা বইবার জন্যে আমার মতো একটি গর্দভ পেয়েছ। ও তা পায়নি।

—পায়নি কেন? রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা আছে,—না পাবার কোন কারণ ছিল না।

প্রণব হাসতে হাসতে বললে, বোধ করি ওর অদৃষ্টে নেই বলে।

—একি একটা কথা হল! বাপের পয়সার অভাব নেই। ওর নিজেরও মূলধনের অভাব নেই। পাত্র কি একটা পাওয়া যেত না?

—অদৃষ্টে না থাকলে কি করে পাবে?

অরুণা যেন সেটা শুনতেই পেল না। আর একখানা কেক ওর প্লেটে তুলে দিয়ে তেমনি করে বলতে লাগলঃ ওর মতো মেয়েকে পাবার জন্যে কত লোক লালায়িত!

প্রণব আবারও হাসলে। বললে, কত লোক লালায়িত হলে হবে কি, ও নিজে যে বিবাহ করতে চাইলে না।

—তাই বল। আর একখানা স্যাণ্ডুইচ নাও।

—না। আর না।

অরুণা তার নিজের স্যাণ্ডুইচটা একটুখানি কামড়ে নিয়ে বললে, বিয়ে করতে চাইলে না কেন?

—সেটা আমি কি করে বলব, অরুণা। কৌতূহল খুব বেশি হলে ওকে জিগ্যেস করতে পার।

বাপ-মায়ের সকল অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ও যে নিজেই বিবাহ ব্যাপারটা এড়াবার জন্যে চাকরি নিয়ে চলে যায়, বরদার স্ত্রীর কাছে তা কতবার অরুণা শুনেছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য রকম।

বললে, আমার মনে হয়, তুমি জোর করলে হয়তো বিয়ে করতো।

—আমি!—কেকের টুকরোটা যেন প্রণবের গলায় আটকে গেল। —বাপ-মার কথা শোনেনি, আমার কথা শুনত!

এবারে অরুণা একটা অম্লমধুর কুটিল কটাক্ষ হেনে বললে, শুনত গো, শুনত। আমি কী বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তুমি কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেছ।

বলেই চায়ের টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল। আর, প্রণব আঘাতের আকস্মিকতায় বোকার মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সুচরিতা তখন বরিশালে। তার মায়ের গুরুতর অসুখের টেলিগ্রাম যখন পৌঁছুল সে গেছে তখন মফঃস্বলে স্কুল-পরিদর্শনে। সুতরাং সে টেলিগ্রাম তার পেতে দেরি হল দিন-পাঁচেক। তখনই ছুটির জন্যে উপরে'একটা টেলিগ্রাম করেই সে কলকাতা ছুটল।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে তার দেখা হল না।

যখন পৌঁছুল তখন বাড়ি থমথম করছে। নিঃঝুম। গাড়িবারান্দার নিচে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যখন পিছন ফিরে চাইলে, দেখলে পুরোনো চাকর তিনকড়ি নিঃশব্দে তার বাক্স-বিছানা নামাবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

অনেক দিনের চাকর তিনকড়ি। ওদের দুই ভাইবোনকেই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। বুড়ো হয়ে গেছে। অন্য অন্য বার যখনই সে এসেছে, তিনকড়িই সোৎসাহে তাকে গাড়ি থেকে অভ্যর্থনা করে নামিয়েছে। এবারেও সে এসেছে বটে, কিন্তু নিঃশব্দে। যেন সুচরিতার চোখে চোখ ফেলতে অনিচ্ছুক।

সুচরিতার বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল।

ব্যস্তভাবে বললে, তুমি ওগুলো নিয়ে এস, তিনকড়ি। আমি ওপরে চললাম।

মা কেমন আছেন এ-কথা জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হল না। পাছে এখনই কিছু শুনে বসে।

তিনকড়ি আর থাকতে পারল না। দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে চেয়ে বললে, উপরে গিয়ে কিন্তু কান্নাকাটি কোরোনি, দিদিমনি। বাবুর অসুখটাও বেশি।

—বাবার!

সুচরিতার পথশ্রম-ক্লিষ্ট রাত্রিজাগরণ-কাতর দেহটা একবার যেন টলে উঠল। দেওয়ালটা ধরে সামলে নিলে।

সেইজন্যেই বাড়ি নিস্তব্ধ নিঃঝুম।

জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, মা?

ট্যাক্সিওয়ালা তাড়া দিলে হোল্ড-অলটা নামিয়ে নেবার জন্যে। সেইটে নামিয়ে নেবার জন্যে তিনকড়ি অকস্মাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। কি একটা বললেও যেন, কিন্তু তা ঠিক বোঝা গেল না।

সুচরিতা ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তার পা যেন আর চলে না।

দোতালার প্রথম ঘরটাতেই তার বাবা থাকেন। বারান্দায় পা দিয়ে ঘরের ভিতর প্রথমেই তার নজর পড়ল বরদা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। খাটের কাছে বৌদি।

সুচরিতাকে দেখেই বরদা খাটের কাছে এগিয়ে গেল। বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, সুচরিতা এসে গেছে বাবা। শুনছেন! সুচরিতা এসে গেছে।

কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুনতে পেলেন বলে মনে হল না।

সুচরিতা তখন ঘরের মধ্যে এসে গেছে।

তার দিকে চেয়ে বরদা বললে. এখন জ্ঞান নেই। মাঝে মাঝে একবার জ্ঞান হচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে।

সুচরিতা বাবার খাটের পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। তার শুষ্ক চোখে পলক পড়ছে না।

বরদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বড় দেরি করলি, সু।

সুচরিতা তার উত্তর দিলে না। কিছুক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে পিতার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বরদা বুঝলে, ও মাকে খুঁজতে যাচ্ছে। স্ত্রীর দিকে ইশারা করতেই সে সুচরিতার অনুসরণ করলে।

মায়ের ঘরের সামনে এসে সুচরিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শূন্য ঘর।

ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বরদার স্ত্রী ধীরে ধীরে বললে, মা চলে গেছেন ঠাকুরঝি, আজ চারদিন হল।

সুচরিতা বৌদির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। সে যেন বুঝতে পারছে না একটা শব্দও। কিংবা হয়তো হিসাব করছে চারদিন ক'দিনে হয়।

তারপরে অস্ফুটে একবার 'মাগো' বলেই মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

তার বাবাও ভোরের দিকেই চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবে বাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রণবও এল। কিন্তু তখন সুচরিতার দিকে চেয়ে দেখবার কারও ফুরসত নেই।

বিকেলের দিকে প্রণব এবং অরুণা আবার এল।

প্রণব বরদার কাছে রইল। অরুণা গেল সুচরিতার খোঁজে উপরে।

বরদা বললে, সুচরিতার জন্যে বড় চিন্তায় পড়েছি মুক। শেষ সময়ে

বাবা মা কারও সঙ্গে দেখা হল না, এই আঘাত ও যেন কিছুতেই সইতে পারছে না। কাঁদছে না, কিছু না, শুধু ওপরের দিকে চেয়ে ঝিম ধরে বসে আছে। ওর জন্যে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

প্রণব বললে, চল ওর কাছেই যাওয়া যাক।

দুজনে উপরে গেল। ওদের উপরের বসবার ঘরে একটা বড় সোফায় সুচরিতা আর অরুণা পাশাপাশি ব'সে। পাশের সোফায় বরদার স্ত্রী। কারও মুখে কোন কথা নেই। শোকার্তের কাতর বিলাপে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যায়, এ প্রণব দেখেছে। কিন্তু শব্দহীন গৃহকোণে শোকার্তের মৌন মুখে বেদনার গাঢ় ছায়া যেমন মর্মন্তুদ এমন বুঝি আর কিছুই নয়।

কত সান্ত্বনার কথা বলবার জন্যে তৈরি হয়ে প্রণব এসেছিল। কিন্তু মৌনতাও বোধ করি সংক্রামক। প্রণবের মনে হল এখানে কথা নয়। মৃদু গুঞ্জনও বুঝি এই প্রগাঢ় পবিত্রতার পক্ষে হানিকর।

দিন দুই পরে সুচরিতা প্রণবকে টেলিফোন করলে। তখন সে হাইকোর্ট থেকে ফেরেনি। অরুণা টেলিফোন ধরে তাই জানিয়ে দিলে।

একটু ভেবে সুচরিতা তাই জিজ্ঞাসা করল, তুমি অরুণাদি?

—হ্যাঁ ভাই।

—প্রণববাবুর ফিরতে কি খুব দেরি হয়?

—না, ফেরবার সময় হয়েছে।

—ফিরলে তাঁকে একটু বলবে যে, আমি ফোন করেছিলাম। তিনি যেন সন্ধ্যার দিকে একবার আসেন।

—বলব।

আর কোন কথা সুচরিতা বললে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে দিলে। অরুণা একটু ক্ষুণ্ণই হল, সুচরিতা তার সঙ্গে একটা কথাও বললে না।

প্রণব ফিরলে অরুণা একটু চিমটি কেটেই বললে, তোমার সুচরিতা যে ফোন করেছিল গো।

—কেন?

—তা আমাকে বলবে কেন? বোধ হয় কোন গোপনীয় কথাই আছে। তলবটা খুব জোর। ফিরলেই তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বললে।

প্রণব শক্ত কলারটা খুলতে যাচ্ছিল। আঙুলটা সেইখানেই থমকে গেল।

ব্যস্ত হয়ে বললে : তাই নাকি?

অরুণা খিলখিল করে হেসে উঠল : পোষাকটা ছাড়বারও তর সইছে না নাকি! তলব যত জোরই হোক্, চা খেয়ে যাবে তো?

অপ্রস্তুতভাবে প্রণব কলার-টাই খুলতে খুলতে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। না, তা নয়, আমি ভাবছিলাম হঠাৎ কি জন্যে ডাকছে!

অরুণা তেমনি করেই হাসতে হাসতে বললে, হঠাৎ আবার কি গো! ক'দিনই হল এসেছে, এর মধ্যে যে ডাকেনি একবারও, সেই তো আশ্চর্য!

তারপরে বললে, গোপন কথাই হয়তো আছে। নইলে আমাকেও যেতে বলত নিশ্চয়।

—যাবে তুমি?—প্রণবের কণ্ঠস্বর একটু গম্ভীর মনে হল।

—না। আমাকে তো যেতে বলেনি।

—বেশ তো, না হয় আমিই বলছি, চল।

—আমার কোনো দরকার তো নেই।

—নেই-ই বা কেন? আর কোন দরকার না থাক, আমাকে পাহারা দেওয়া তো হবে। সেটাও তো কম দরকার নয়!

অরুণার দুই চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠলো। রাগে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই প্রণব বলতে লাগল, অরুণা, কাউকে নিয়ে পরিহাস করারও সময় আছে। কাল যার বাপ-মা মারা গেছেন, তাকে নিয়ে পরিহাস করা জঘন্য নোংরামি। কই, চা নিয়ে এস।

প্রণবকে রাগতে অরুণা এই প্রথম দেখলে, যদিচ কি তার কণ্ঠস্বরে, কি তার মুখভাবে ক্রোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিল না। রাগ অরুণারও কম হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে কথা বাড়াতে তার ইচ্ছা হলনা। নীরবে চায়ের ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল।

মিছামিছি কথা বাড়াবার লোক প্রণবও নয়। চা-পানের পর টুপি আর ছড়িটা নিয়ে সে সুচরিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

সুচরিতা একাকী লনে বসে বোধ হয় তারই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু প্রণব কাছে আসতেই অভ্যর্থনাসূচক একটা কথাও বলতে পারলে না। চোখ তুলে তার দিকে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে।

এই ক'টা দিনেই ওর চোখ-মুখ এবং সমস্ত দেহের উপরই যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে।

প্রণব নিঃশব্দে অদূরে বসল।

কারও মুখে কোনো কথা নেই।

অনেকক্ষণ পরে সুচরিতা বললে, তোমাকে ফোন করেছিলাম। বলেনি অরুণাদি?

—বলেছেন।

সুচরিতা আবার চুপ করে রইল।

তারপরে বললে, নিজের খেয়ালে চলতে গিয়ে যত ভুল করেছি, এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হল।

প্রণব বুঝলে, সুচরিতা যেজন্যে ডেকেছে এ তার ভূমিকা। সুতরাং নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগল।

সুচরিতা বলে যেতে লাগল। একটুখানি বলে আর থামে, কি যেন ভেবে নেয়। তারপর আবার বলে। চিন্তার স্রোতে মাঝে মাঝে খেইও হারিয়ে যায়। কখনও খুঁজে পায়, কখনও পায় না। সেই একই কথা। মায়ের বড় ইচ্ছা ছিল, সুচরিতা বিয়ে করে, ঘর বাঁধে। সেইজন্যেই হয়তো এত শীঘ্র চলে গেলেন। বাবা মুখে কিছু বলতেন না বটে, কিন্তু তাঁরও এই একই ইচ্ছা ছিল। আজ তার মনে হচ্ছে, সে-ই যেন একখানা খেয়ালের ছুরি দিয়ে একসঙ্গে পিতৃমাতৃহত্যা করলে। এই দুঃখ সে সহ্য করতে পারছে না।

বললে, মাঝে মাঝে মনে হয় চাকরি ছেড়ে দিই। কিন্তু দিয়ে করব কি? ধর্মে মতি নেই যে সন্ন্যাস নোব। কী আশ্রয় করে মন শান্তি পাবে?

একটু থেমে আবার বললে, অরুণাদিকে বিয়ে করার আগে একদিন তুমি এসেছিলে আমার কাছে সাহায্য নিতে। মনে পড়ে?

পড়ে। সেদিন সুচরিতা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, মানুষ নিজেরটা নিজে যেমন ভাবতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। বলেছিল, কেউ কারও জন্যে ভেবে দিতে পারে না। কিন্তু সে চুপ করেই রইল।

অত্যন্ত করুণভাবে হেসে সুচরিতা বললে, আজ আমার হয়েছে সেই দশা। বল আমি কি করব!

প্রণব বললে, উতলা হয়ো না, সু। সময়ের চেয়ে বড় সান্ত্বনাদাতা আর নেই। কিছুদিনের ছুটি নাও।

—ছুটি নিয়ে? এখানে? ওরে বাবা!

—অন্য কোথাও যাও।

—একা কোথায় যেতে পারি? দাদা সঙ্গে গেলে পারি। কিন্তু তার হাইকোর্ট খোলা রয়েছে।

সুচরিতা আবার যেন চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গেল।

তারপর দুটি করতল যুক্ত করে করুণভাবে বললে, তোমাকেও অনেক দুঃখ দিয়েছি। তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।

প্রণব ব্যস্ত হয়ে উঠলঃ তুমি? দুঃখ দিয়েছ? আমাকে? কী যে বল, সুচরিতা!

—না। আমাকে ক্ষমা কর। প্রথম যৌবনের দম্ভে অন্ধ না হলে আজ মা-বাপকেও দুঃখ দিতাম না, নিজেও দুঃখ পেতাম না।

এমন করুণ স্বীকারোক্তি প্রণব স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেনি। সে অবাক হয়ে গেল।

সুচরিতা আপন মনেই বলে চলল, অসবর্ণ বিবাহে আমার মা-বাপ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত সম্মত হতেন।

প্রণব বাধা দিলেঃ কিন্তু আমার মা-বাবাকে তো ভালো করে জান না। তাঁরা কখনই রাজী হতেন না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সুচরিতা, তোমার দম্ভও কোনোদিন চোখে পড়েনি, অন্ধতাও না। আমার বাপ-মার কথা ভেবেই আমি নিরস্ত হয়েছিলাম। ভুল আমিই করেছি, সুচরিতা। এ ভুলের মার্জনা নেই।

তাই বটে। সুচরিতা কোনোদিনই প্রণবকে প্রত্যাখ্যান করেনি। তার কোনো দোষ নেই। কী এলোমেলো ভাবছে সে! তার কি মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই?

প্রণবের তেমনি সন্দেহ হল। বললে, আমি বলি তুমি বরিশালেই ফিরে যাও। ছুটি নিও না।

—কেন বল তো?

—ছুটি তুমি সইতে পারবে না, সু। একলা কেবলই এলোমেলো ভাববে। তার চেয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে হয়ত আরও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতে পারবে।

—তুমি তাই আদেশ কর?

—আদেশ? আদেশ কেন করব, সু। বন্ধু হিসাবে আমি তোমাকে পরামর্শ দিই।

—তার মানে আমার দায়িত্ব তুমি নিতে চাও না, না? বেশ!

সুচরিতা নিঃশব্দে গুম হয়ে বসে রইল।

প্রণব বিস্ময়ে হতবাক।

বাড়ি ফিরে প্রণব তার অফিস-ঘরে মামলার কাগজপত্র নিয়ে বসল। কিন্তু মন বসে না। সুচরিতা তার মনের উপর যেন একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। না পারছে কাজে মন দিতে, না ভালো লাগছে নিষ্কর্ম বসে থাকা।

অরুণার সঙ্গে দেখা হল খাবার টেবিলে। মনে হল, তার চোখের তারায় একটুকরো শীতল ঘৃণা যেন ঈশানের মেঘের মতো থমকে রয়েছে। ভয়ে এবং সংকোচে সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

একবার সে কথা আরম্ভ করবার চেষ্টা করলেঃ

—বড্ড আঘাত পেয়েছে সুচরিতা।

কিন্তু অরুণার কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলে না।

সময় দরকার। প্রণব জানে কিছু সময় পেলেই ভালো মেয়েদের রাগ জল হলে আসে। তার মধ্যে ঘাঁটাতে নেই।

খেয়ে-দেয়ে সে আবার নিচে চলে গেল। তার অফিস-ঘরে দু'জোড়া চোখ,—একজোড়া বেদনায় পাংশু, আর-একজোড়া ঘৃণায় কঠিন,—পালা করে তার সামনে ঘুরতে লাগল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে রইল সে নিচে। অন্য মনে ব্রীফের পাতা উলটে যায়, আর ভাবে। ভাবনারও কোনো কূল-কিনারা নেই যেন।

তারপর একসময় শুতে গেল। অরুণা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

পরদিন সকালে সুচরিতা এসে উপস্থিত। যে-মানুষ নিশীথ রাত্রে ঘুমের ঘোরে বাইরে বেরিয়ে আসে তারই দৃষ্টি ওর চোখে। ঈষৎ আরক্ত এবং অস্পষ্ট।

অরুণা এবং প্রণব নিঃশব্দে চা-পান করছিল। কালকের গুমোটের জের যায়নি যেন। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে অরুণার মনের আকাশ কিছুটা স্বচ্ছ এবং শীতল হত হয়তো। কিন্তু তা তো হয়নি। তাই পরদিন সকালেও চা-পান পর্ব নিঃশব্দেই চলছিল।

হঠাৎ সুচরিতাকে দেখে অরুণা অস্ফুট একটা শব্দ করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে। ধীরে ধীরে নিয়ে এসে অপূর্ব মমতায় নিজের পাশের চেয়ারটায় বসালে। তাড়াতাড়ি একটা কাপে চা ঢেলে ওর সামনে ধরলে। প্লেটে করে কিছু খাবারও দিলে।

সুচরিতাকে এ বাড়িতে এই আবহাওয়ার মধ্যে উপস্থিত হতে দেখে প্রণবের সমস্ত দেহ যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে তাতে রক্ত-চলাচল শুরু হল। অরুণা তার নিজের ব্যক্তিত্বে ফিরে এসেছে।

অরুণার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে সুচরিতা প্রণবকে বললে, চতুর্থী-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এলাম। বিশেষ কিছু নয়, আমাদের পরিবারের কয়েকটি বন্ধু, দু-চারজন নিকট আত্মীয় এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণ। তা তুমি তো একাধারে আত্মীয়, বন্ধু, ব্রাহ্মণ। তাই তোমার কাছেই প্রথমে এলাম।

সুচরিতার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত। তবু কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে। এবারে অরুণার দিকে চেয়ে বললে, তোমরা দুইজনেই যাবে ভাই, কেমন?

ওরা উভয়েই সাগ্রহে সম্মতি জানালে।

প্রণবের দিকে চেয়ে সুচরিতা আবার বললে, ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক। কাজের মধ্যেই আমাকে ডুবে থাকতে হবে। তাই স্থির করেছি, শনিবারেই বরিশাল চলে যাব।

প্রণব বললে, সেই ভালো।

অরুণা প্রথমে প্রণবের দিকে তারপর সুচরিতার দিকে চেয়ে বললে, আর দু'এক দিন বিশ্রাম করে গেলে ভালো হত না?

সুচরিতা বললে, না অরুণাদি। এখানে মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত সর্বত্র তাঁদের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। এখানে আমি কিছুতে শান্ত হতে পারছি না। দেখি, কাজের মধ্যে ডুবে থেকে যদি শান্তি পাই।

সুচরিতা উঠল। অরুণার দুটি হাত ধরে বললে, আজকে আমি উঠি, ভাই। আরও কয়েকটা বাড়ি যেতে হবে। তোমরা দুজনে যেন যাবে। না গেলে খুবই দুঃখ পাব।

—যাব বইকি। নিশ্চয় যাব।

বলতে বলতে ফটক পর্যন্ত অরুণা ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল। সুচরিতার দুঃখে ওরও মন ভরে উঠেছে।

আরও কয়েকটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল—যেমন করে সাধারণত কেটে যায়। অরুণার কোলে একটি মেয়ে এসেছে, মাধুরী। বিমান সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে। পড়াশুনায় খুবই সে ভালো, প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে অনেক প্রাইজ নিয়ে আসে।

'বারে' প্রণব এখন বেশ নাম করেছে। ভালো রোজগার করছে। চেহারার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। কেবল একটু মোটা হয়েছে, মুখখানা আর একটু ভারিক্কি, এবং খুব লক্ষ্য করলে কানের কাছে দু-চারটে পাকা চুলও দেখা যায়।

তখন ফাল্গুন মাস। শীতের আমেজ রয়েছে। কোর্ট থেকেই প্রণব অরুণাকে টেলিফোন করলে, তার বাইরে যাবার জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে ঠিক করে রাখতে। কোর্ট থেকে ফিরেই তাকে চিটাগাং মেল ধরতে হবে।

একটা দুরূহ ফৌজদারী মামলা আর কি! শরীরটা তার ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু একে মোটা টাকা ফী, তার উপর মক্কেলের সনির্বন্ধ অনুরোধ, সর্বশেষে সুচরিতা—এই ত্র্যহস্পর্শ এই অসুস্থ শরীরেও তাকে সুদূর চট্টগ্রামে টেনে নিয়ে চলল।

কোর্ট থেকে ফিরে প্রণব দেখলে গোছগাছের নামগন্ধ নেই। অরুণা মুখ ভার করে বসে।

—কি ব্যাপার!

—আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না।

—সে কি! কেন?

—কাল তোমার জ্বর হয়েছিল মনে নেই? দু'খানা টোস্ট খেয়ে কোর্টে গিয়েছিলে। এই অবস্থায় তোমাকে বাইরে যেতে দোব না।

অরুণার এমনিতর জেদের সঙ্গে প্রণব পরিচিত। সে বোঝাতে বসল : দেখ, মামলা বলে কথা। একটা লোকের সর্বস্ব এর সঙ্গে জড়িত। আমি যদি না যাই, লোকটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফী'টাও এখানে বড় কথা নয়। তাছাড়া কাল রাত্রে অল্প একটু উত্তাপ উঠেছিল। আজ তো ভালোই আছি।

অরুণা বললে, না। তোমাকে যদি নিতান্তই যেতে হয়, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এই অবস্থায় একলা তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না—তা জ্বর অল্পই হোক আর বেশিই হোক।

—বেশ চল। কিন্তু বিমানের যে কি একটা পরীক্ষা আছে। ওর কি করবে?

কি করা যায় অরুণা ভাবতে বসল।

ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে প্রণব বললে, তারপরে মাধুরীর দাঁত উঠছে। ওকে তো আর ট্রেনে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না।

সে কথাও মিথ্যা নয়।

প্রণব বোঝাতে লাগল, এবারে আরও জোরের সঙ্গেঃ কটা দিনের তো ব্যাপার। একটা সকালে পেঁছুব। সেই দিনটা, বড় জোর পরের দিন। এর জন্যে যদি একটা দম্পট নিয়ে যেতে হয়, তাহলে মক্কেলের ওপর বড় বেশি অত্যাচার করা হবে।

—কোথায় উঠবে?—অরুণা জিজ্ঞাসা করলে।

—সম্ভবত কোনো ভালো হোটেলে।

—না।

—অথবা মক্কেল কোনো বাড়িও ঠিক করে রাখতে পারে। ঠিক জানি না। সেখানে খুব ভালো হোটেল নাও থাকতে পারে।

অরুণা আবারও বললে, না।

—তবে? —বিব্রতভাবে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে।

একটা ঢোঁক গিলে অরুণা জিজ্ঞাসা করলে, সুচরিতাদি এখন সেখানে না?

প্রশ্নটা করতে লজ্জায় অরুণার মাথা কাটা যাচ্ছিল। মা-বাবার মৃত্যুকালে সেই যে সুচরিতা কলকাতা এসেছিল, তারপর আর আসেনি। কিছুটা হয়ত কাজের চাপে, কিছুটা বা ইচ্ছার অভাবে। সেই থেকে তার সঙ্গে এদের দেখা নেই। প্রথম প্রথম এক আধখানা চিঠি আসত-যেত। ইদানিং তাও বন্ধ। সুচরিতার দিক থেকে এর কারণ যাই হোক, এদের দিক থেকে অনেকখানি কারণ যে অরুণা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অরুণা কলহ করে না। কিন্তু সুচরিতার প্রসঙ্গে প্রণবের বিরুদ্ধে তার চোখে যে শীতল, উপেক্ষাভরা ঘৃণা জমে ওঠে, প্রণবের কাছে তার চেয়ে অসহ্য আর কিছুই নেই।

পুনরায় সুচরিতার প্রসঙ্গে প্রণব ঠিক বুঝতে পারলে না, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এবং যা-কিছু ঘটুক তারই জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, তাই তো শুনেছি।

—তোমাকে সেইখানে উঠতে হবে। আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।

প্রণব নির্বাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু সেই দৃষ্টি অরুণা যেন দেখেও দেখলে না। বললে, তোমার এই শরীরে, আমি যদি সঙ্গে না থাকি, তাহলে চট্টগ্রামে ওই একটি জায়গাতেই তোমাকে পাঠাতে পারি।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিসের?

প্রণব সুচরিতার ব্যাপারে অরুণার কাছ থেকে শুধু নির্বাক আঘাতই এতদিন খেয়ে এসেছে। কোনদিনই প্রত্যাঘাত করেনি। আজ কিন্তু এই প্রলোভন সামলাতে পারলে না।

বললে, শুনেছি মেয়েরা স্বচ্ছন্দে যমকে স্বামী দান করতে পারে, কিন্তু অন্য মেয়েকে নয়! আশ্চর্য সেইজন্যেই।

এবার অরুণা ঘাড় বেঁকিয়ে ওর দিকে চাইলে। বললে, সব মেয়ের মনের কথা জান তুমি?

—না।

—তবে ওকথা বললে কেন? সুচরিতাকে আমি কত শ্রদ্ধা করি জান? জানলে ও খোঁটা দিতে না। যাকগে, এ প্রসঙ্গ মুলতুবি রইল। আমি বলছি, ঝগড়ু তোমার সঙ্গে যাক। ওটা চালাক-চতুর আছে, বিশ্বাসীও। ওর উপর নির্ভর করা যায়।

তখনই অরুণা টেলিগ্রামে সুচরিতাকে প্রণবের যাওয়ার সময়, তারিখ, ট্রেন এবং প্রয়োজনটা জানিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে তার স্বাস্থ্যের অবস্থাটাও। এবং তাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানালে, প্রণবকে তার নিজের বাসায়, নিজের চোখের সামনে রাখবার জন্যে। তাহলে অরুণা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

ঝগড়ুকেও বলে দিলে, চট্টগ্রাম পেঁৗছেই সে যেন সাহেবের শরীরের অবস্থা জানিয়ে কলকাতায় জরুরী তার করে।

এখন চিন্তার কথা সুচরিতা চট্টগ্রামে থাকলে হয়। সে না স্কুল পরিদর্শনে মফঃস্বলে বেরিয়ে গিয়ে থাকে। তা যদি হয়, তাহলে ওর অফিসের কেউ কি ওর টেলিগ্রাম খুলবে? খুলে যেখানে ও গেছে সেখানে লোক দিয়ে হোক, টেলিগ্রাম করে হোক, ওকে কি খবর দেবে? এত বুদ্ধি কি ওর অফিসের লোকদের হবে? সুচরিতার মায়ের মৃত্যুকালে তো এইরকম বিভ্রাটই হয়েছিল।

প্রণবকে একলা পাঠিয়ে এইসব নানা চিন্তায় অরুণা সারারাত্রি এক

ফোঁটা ঘুমুতেই পারলে না।

সকালে উঠেই পোস্টাফিসে জানিয়ে দিলে চট্টগ্রাম থেকে তার নামে কোন টেলিগ্রাম এলে সেটা যেন তৎক্ষণাৎ বিশেষ লোক দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর জন্যে তাকে বখশিশ দেওয়া হবে।

এবং তারপরেও বিমানকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে বিশবার শুধু ঘর-বার করতে লাগল। কিছুতে যেন আর শান্তি পায় না।

সকালে সুচরিতা যখন চট্টগ্রাম স্টেশনে প্রণবকে আনতে গেল, প্রণব তখন বেহুঁস। কিন্তু জ্বরে নয়, মদে। মক্কেলের মুখ শুকিয়ে আমসি! এত টাকা খরচ করে বড় ব্যারিস্টার নিয়ে আসা হল। সকালেই মামলা উঠবে। এবং এই যদি মূল্যবান ব্যারিস্টারের অবস্থা হয়, তাহলে এঁকে কোর্টে নিয়েই বা যাওয়া যায় কি করে? আর নিয়ে গিয়েই বা হবে কি!

এই অবস্থায় সুচরিতা যখন প্রস্তাব করলে প্রণব তার বাড়িতে উঠবে, তখন মক্কেলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মামলার অবস্থা যা হবার হোক, এখন এই অর্ধ-অচৈতন্য মূল্যবান দেহটার দায়িত্ব যে তাকে নিতে হবে না. এইতেই সে কৃতার্থ হয়ে গেল।

সেলাম করে সবিনয়ে বললে, ঠিক দশটায় মামলা আরম্ভ হবে মেমসাব।

সুচরিতা নিজের ঠিকানা দিয়ে বললে, ঠিক আছে। এই ঠিকানায় সাড়ে ন'টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসবেন। সাহেব তৈরি থাকবেন।

মক্কেলটি এই অপ্রত্যাশিত আশ্বাসের পরে প্রণবের সমস্ত দায়িত্ব সুচরিতার ঘাড়ে চাপিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঝগড়ু শুষ্ক মুখে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখে সুচরিতা তবু খানিকটা আশ্বস্ত হল : তুই এসেছিস! তবু ভালো।

কিন্তু ভালো যে কোথাও আছে, এমন সম্ভাবনার চিহ্নমাত্রও ঝগড়ুর মুখ-চোখের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বরং শুষ্ক মুখ শুষ্কতর করে ঝগড়ু আরও জানালে, সাহেবের একটু জ্বরও আছে বোধ হয়।

—এর ওপর জ্বরও আছে! বাঃ! কিন্তু তোমার সাহেবের মক্কেলটিও কি সরে পড়লেন?

এদিক ওদিক চেয়ে ঝগড়ু বললে, তাই তো মনে হচ্ছে।

—হুঁ।

কিন্তু এই স্টেশন এবং এখানকার লোকজন সুচরিতার কিছু কিছু পরিচিত, বিশেষ করে তার আরদালিটার। সে কোথা থেকে একটা 'ইনভ্যালিড চেয়ার' নিয়ে এল এবং কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে কতকগুলি কুলির সাহায্যে প্রণবকে বাইরে অপেক্ষমান মোটর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললে।

সুচরিতার বাসাটা চমৎকার! একটা টিলার উপর, অনেকখানি হাতাওয়ালা, ছবির মতো মনোরম একটা বাংলো।

আশ্চর্য! সেইখানে পৌঁছেই প্রণব চোখ মেললে এবং কারও সাহায্য না নিয়েই টলতে টলতে নেমে পড়ল। বললে, বাঃ! চমৎকার বাংলোটি পেয়েছ তো? নাইস নাইস!

সুচরিতা অবাক।

ঝগড়ুর দিকে চেয়ে প্রণব বললে, সেই মক্কেলটি কোথায় গেল?

সুচরিতা বললে, ভেগেছে।

—ভাগবে কি! তার টিকি যে আমার হাতে!

—তাহলে টিকি রেখেই ভেগেছে। সাড়ে ন'টায় আসবে বলে গেছে। তুমি কি করবে বলতো? এখনই ব্রেকফাস্ট করবে, না স্নান করে এসে?

—স্নানটা করা দরকার, সু।

সুচরিতা হেসে বললে, সে তো আমিও বুঝছি। কিন্তু ঝগড়ু বলছে কাল তোমার একটু জ্বরের মতো হয়েছিল। অরুণাদিও সেই মর্মে টেলিগ্রাম করেছে।

—করেছে নাকি? ওই এক ব্যস্তবাগীশ!

তারপরে ঢোঁক গিলে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললে, কিন্তু দশটায় মামলা, স্নান না করলে তো দাঁড়াতে পারব না।

—তা হলে যা থাকে অদৃষ্টে, গরম জলে স্নানটা করে নাও। মক্কেলের অতগুলো টাকা নষ্ট করা ঠিক হবে না।

—না। তাতে বদনাম হবে। তার চেয়ে জ্বর ভালো। তারপরে তুমি তো আছই। জলে তো আর পড়িনি! ওরে ঝগড়ু!

ঝগড়ু সেলাম করে এসে দাঁড়ালো।

তার দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে প্রণব বললে, না। তোকে দিয়ে হবে না। তুই তো এখানকার কিছুই জানিস না।

—কেন? কি দরকার? চুরুট? তাও আনিয়ে রেখেছি।—সুচরিতা হাসতে হাসতে বললে।

—রেখেছ নাকি? না, চুরুটে আমারও কখনও ভুল হয় না, অরুণারও না। চুরুট নয়।

—তবে?

—একটা টেলিগ্রাম করতে হত অরুণার কাছে। তোমার চাপরাশিটাকে

বাধা দিয়ে সুচরিতা বললে, সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তুমি শুধু তাড়াতাড়ি স্নানটা করে ব্রেকফাস্ট সেরে নাও দেখি। মক্কেল এসে দেখুক, তুমি সুস্থ, তার মামলা নিরাপদ। স্টেশনে বেচারার শুকনো মুখখানা দেখে পর্যন্ত মন ভালো নেই।

প্রণব হো হো করে হেসে উঠল : সব ঠিক হয়ে যাবে। সারা রাত্রি ওর মামলার কাগজপত্র পড়তে পড়তেই এসেছি। মামলা ভালো। ও জিতে যাবে।

—তাই নাকি! কিন্তু সারারাত্রি মামলার কাগজপত্র পড়বার মতো অবস্থা ছিল তোমার? মনে তো হয় না।

—সেটা যে ভ্রান্তি, মামলার ফলেই তা টের পাবে। এখন কোথায় তোমার বাথরুমটা দেখিয়ে দিতে বল তো। হয়তো, এখানকার উকিল মামলাটা বোঝাবার জন্যে এখনই এসে হাজির হবে।

প্রণব ব্যস্তভাবে চলে গেল।

ন'টার মধ্যে প্রণব তৈরি হয়ে গেল। উকিল বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। পোশাক পরেই প্রণব সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল এবং উকিলকে কুশল-প্রশ্নের অবকাশমাত্র না দিয়ে মামলার মধ্যে ডুবে গেল।

সাড়ে ন'টায় মক্কেল এসে এই দৃশ্য দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠলো! সেলাম করে বললে, গাড়ি তৈরি সাহেব।

—চলুন।

গাড়িতে উঠে প্রণব উকিলকে দু'টি একটি প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তরে উকিল যখন অনর্গল বকতে লাগল, প্রণব তখন চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করছে। উকিলের সব কথা তার কানে গেল বলে মনে হল না।

কলকাতা থেকে বড় ব্যারিস্টার এসেছে। সুতরাং কোর্ট বসতে এক

মিনিটও বিলম্ব হল না। আদালত লোকে লোকারণ্য। ঠিক দশটায় আরম্ভ হল মামলা।

সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা।

প্রণবের জেরায় দেখতে দেখতে সাক্ষীদের চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলতে লাগল আর তারই মধ্যে জোনাকি পোকার মতো উড়তে লাগল কোটি কোটি সরিষার ফুল। তাদের মুখ থেকে তখন কত হ্যাঁ না হয়ে গেল আর কত না হ্যাঁ, তার সীমা-সংখ্যা রইল না।

লাঞ্চের আগেই এ পর্ব শেষ করে দিয়ে প্রণব ছুটলো সুচরিতার বাড়ি লাঞ্চে। তার মুখ তখন রক্তাভ।

সুচরিতা ভয় পেয়ে গেল : তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—খুব ভালো।—প্রণব জবাব দিলে,—কিন্তু খুব হালকা খেতে হবে, এত নয়। গিয়ে আবার সওয়াল আছে। ভরপেটে সুবিধা হবে না। কেবল,—প্রণব একটু হাসলে,—কিছু মনে কর না। অভ্যাসটা এমন হয়ে গেছে...ঝগড়ু!

সে যেন তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস পানীয় ঠক করে ডিনার টেবিলে রেখে গেল।

কোনমতে লাঞ্চ সেরেই প্রণব আবার ছুটল কোর্টে। মক্কেল সব সময়েই তার পিছনে পিছনে গরুড় পক্ষীর মতো ঘুরছে। সওয়াল শুরু করেই প্রণব কোর্টকে বললে, সে আজ রাত্রেই ফিরতে চায়। কোর্ট যদি দয়া করে এক ঘণ্টা বেশি সময় বসে তাহলে ফেরা সম্ভব! ছ'টার মধ্যে সওয়াল-জবাব শেষ হয়ে যাবে।

ব্যারিস্টারের সময়, যা মুহূর্তে মুহূর্তে টাকা প্রসব করে, তার মূল্য জজসাহেব বোঝেন। স্বচ্ছন্দ চিত্তে তিনি এক ঘণ্টা সময় দিতে সম্মত হলেন।

তখন আরম্ভ হল প্রণবের বাগ্মিতা।

যেন বাক্যের তুবড়ি-বাজি। কখনও ফরিয়াদির প্রতি কঠোর মন্তব্যে কটু, কখনও আসামীর প্রতি করুণায় কোমল, কখনও বা পরিহাসে চটুল। বাক্যের পর বাক্য, যুক্তির পর যুক্তি, বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ চলছে খরবেগা স্রোতস্বিনীর মত তরঙ্গভঙ্গে। কণ্ঠে কখনও বীণার ঝঙ্কার, কখনও বা কামানের গর্জন।

জনতা স্তব্ধ, আদালত স্তব্ধ।

ঠিক ছ'টায় উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব যখন শেষ হল, তখন রায় কোন্

পক্ষে যাবে সে নিয়ে কারও মনে আর সংশয় রইল না।

ধীরে ধীরে জনতার কণ্ঠে জাগল স্তূয়মান গুঞ্জন। বিচারক কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে কোর্ট বন্ধ করে উঠে গেলেন। একটু একটু করে ভিড় হালকা হতে লাগল।

প্রণব তখন চেয়ারে বসে ছটফট করছে। ডাকলে, ঝগড়ু।

ঝগড়ু ছুটে এল।

—জল!

ঝগড়ু জলের মানেও জানে, পরিমাণও জানে। কিন্তু প্রণবের মুখ দেখে ভয় পেয়ে সে যেন দ্বিধা করতে লাগল।

—জল!—অস্থিরভাবে প্রণব আবার হাঁকলে।

ঝগড়ু ছুটে নিয়ে এল পানীয়।

এক নিশ্বাসে সেটা পান করে প্রণব বললে, গাড়ি কোথায়?

তখন ছুটে এল মক্কেল, এল উকিল। প্রণব তখন কাঁপছে। বললে, শিগগির বাড়ি নিয়ে চলুন। শরীরটা ভাল লাগছে না, ভিড় সইতে পারছি না।

ওর মুখ আরক্ত। শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। হেঁটে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য নেই। 'ইনভ্যালিড চেয়ার' ছিল। তাইতে বসিয়ে বহু কষ্টে পুলিশের সাহায্যে ভিড় সরিয়ে ওকে মোটরে তোলা হল।

পথে হাওয়ায় একটু সে সুস্থ বোধ করলে।

উকিল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার হার্টে কোনো

প্রণব বললে, না। বোধ হয় জ্বর। কলকাতা থেকে একটু জ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলাম। সেইটে বোধ হয় উত্তেজনায় এবং ভ্রমণে কিছু বেড়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু সেটা যে নিতান্তই স্তোক, গাড়ি থেকে প্রণবকে নামাবার সময় সকলেই তা টের পেল। ওর সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। গা পুড়ে যাচ্ছে।

অবস্থা দেখে সুচরিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঝগড়ুরও অবস্থা একই রকম। তার সাহেবকে সে চেনে। এখন বোধ করি জ্বরে বেহুঁস, তাই সাড়া নেই। আর একটু জ্বর কমলেই গান এবং বক্তৃতা আরম্ভ হবে। কোথায় থাকবে লেপ, কোথায় বালিশ, কোথায় বা বিছানা। এ-বাড়িতে কারও আর আহার-নিদ্রার উপায় থাকবে না। সে কথা ভাবতেই ভয়ে তার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

মুখটি শুকিয়ে সুচরিতার কাছে এসে দাঁড়াল।

—মা!

ঝগড়ু ওস্তাদ চাকর। বিমানের মত সেও সুচরিতাকে মাসিমা বলে ডাকে। কিন্তু সাহেবের এই অবস্থায় তার মনে সংশয় এসেছে এখন মাসিমাতে কুলোবে কি না। সুতরাং করুণ কণ্ঠে মাতৃসম্বোধন করলে।

—কি রে! —সুচরিতা সাড়া দিলে।

—এ অবস্থায় সাহেবকে তো কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায় না। জ্বর যে দু'এক দিনে ছাড়বে, তাও মনে হয় না। ওঁদের আসবার জন্যে কি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দেওয়া হবে?

—তুই কি বলিস?

—সেখানে খোকাবাবুর পরীক্ষা। খুকুমণির জ্বর। নইলে মা কি আর সাহেবকে একলা ছেড়ে দিতেন? সঙ্গে আসতেন। অথচ একটু অসুখ হলে সাহেব বাড়িসুদ্ধ লোককে পাগল করে তোলেন। তাই ভাবছি

ঝগড়ু কথাটা শেষ না করেই বিজ্ঞের মত ভাবতে লাগল।

সুচরিতা হেসে বললে, তোকে কিছুই ভাবতে হবে না ঝগড়ু। তোর সাহেব তো আর সত্যি সত্যি লাটসাহেব নয়। দেখি না, কেমন করে সব-সুদ্ধ আমাদের পাগল করে!

সুচরিতা হাসলে। আবার বললে, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনিও এখনই এসে পড়বেন। তিনি কি বলেন দেখা যাক। এখন থেকেই ব্যস্ত হবার কি আছে?

—কিন্তু কালকে ফিরে না গেলে মা ভাবতে পারেন।

—তা পারেন। সেজন্যে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক বরং যে, মামলার জন্যে সাহেবের ফিরতে আরও দু-তিন দিন দেরি হতে পারে।

এই কথাটা ঝগড়ুর মাথায় আসেনি। উল্লসিত হয়ে বললে, সেইটেই সব চেয়ে ভাল।

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেলেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাবার আগে সুচরিতা ঝগড়ুকে বলে গেল, তুই কিন্তু সব সময় কাছাকাছি থাকবি ঝগড়ু। তোকে হয়তো সাহেব খুঁজবেন।

সেকথা বলা অনাবশ্যক। ঘরের বাইরে দরজার পাশে ঝগড়ু একটা

টুল নিয়ে এসে বসল। জানে, সাহেব সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার ঘুমের দফা রফা!

ঝগড়ুর কথায় বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন ছিল না। সে রাত্রিটা প্রণব একরকম বেঘোরে কাটাল। সুচরিতা সকল সময় তার বিছানার পাশে। ঝগড়ু বারান্দায় টুলের উপর। কারও চোখে ঘুম নেই।

কিন্তু ভোর থেকে যেই জ্বরটা কমতে আরম্ভ করল অমনি সঙ্গীত, অভিনয় এবং আনুষঙ্গিক কারুকলা সম্বন্ধে প্রণবের অনুরাগ সশব্দে প্রকাশ পেতে লাগল। তার মধ্যে বাংলা আছে, ইংরিজিও আছে। একই নিশ্বাসে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত এবং নিধুবাবুর টপ্পা গীত হতে লাগল। অনেক সময় পরস্পরের লাইন পর্যন্ত মিশে যেতে লাগল। সে যে কি অপূর্ব বস্তু, কানে না শুনলে রসগ্রহণ সম্ভব নয়।

তার সঙ্গে চলে অভিনয়। যাঁরা বলেন, 'পূর্ব পূর্ব, পশ্চিম পশ্চিম এবং এই দুইএর মধ্যে মিলন সম্ভব নয়'—প্রণবের অভিনয় শুনলে তাঁদের ভ্রান্তি নিরসন হবে। এই দেখা গেল সেক্সপীয়রের আলিঙ্গনে আবন্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, পরক্ষণেই দেখা গেল গিরিশচন্দ্রের বজ্র-হুংকারে সেক্সপীয়র ধরাশায়ী। আর পূর্ব ও পশ্চিমে মিলন? দুপুর নাগাদ ম্যাকবেথ ও জনার মধ্যে দু দুবার পরিণয় আসন্ন হয়ে উঠেছিল!

সমস্ত দিন অভিনয় ও সঙ্গীতসুধা বিতরণের পর সন্ধ্যার মুখে জ্বরটা ছাড়ল। সমস্ত দিন ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছগুলোর যে অবস্থা হয়, প্রণবের অবস্থাও তখন সেই রকম। অবসাদে তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল।

সাহেবের সম্বন্ধে ঝগড়ুকে বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। এই অবস্থা দেখে খুশিতে তার চোখ চকচক করে উঠল।

ফিস ফিস করে বললে, এইবার সাহেব ঘুমোবেন। আর ভয় নেই।

সুচরিতা হেসে বললে, যা কাণ্ড দেখলাম, তোমার সাহেবের ভয় আমার জীবনে ঘুচবে না বাবা। তা সে তুমি যতই ভরসা দাও।

কথাটা মিথ্যা নয়।

ঝগড়ু হেসে বললে, না আর ভয় নেই মাসিমা। জ্বরটা ছেড়ে গেছে।

এবং জ্বরটা ছাড়া মাত্রই ঝগড়ু সুচরিতাকে আবার 'মাসিমা' বলতে শুরু করেছে!

সুচরিতা কিন্তু এত লক্ষ্য করলে না। বললে, ভয় তো জ্বরের জন্যে নয় বাবা। তার ডাক্তার আছে, ওষুধ আছে। কিন্তু গান-বক্তৃতার ডাক্তারই বা কোথায়, ওষুধই বা কোথায়?

এই অভিযোগ ঝগড়ু অস্বীকার করতে না পেরে লজ্জিত ভাবে হাসলে। বললে, কিন্তু আপনার মতো সেবা করতে আমি কাউকে কখনও দেখিনি। সারারাত্রি চোখের দুই পাতা এক করেন নি।

সুচরিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তুই কি করে জানলি?

—আমারও তো চোখে ঘুম ছিল না। রাত্রে যখনই ঘরে এসেছি দেখেছি, হয় মাথায় বরফ দিচ্ছেন, নয়তো আর কিছু করছেন।

—যাক, বাঁচা গেল! তাহলে তোর মায়ের কাছে আমার নিন্দে করবি না।

হাত কচলে অপরাধীর মত ঝগড়ু বললে, কী যে বলেন মাসীমা! আমি করব আপনার নিন্দা! চোখে দেখেও?

তারপরে হেসে বললে, জানেন মাসিমা, গেলবারে ঠিক এমনি হয়েছিল। মা পর্যন্ত ভয়ে কাছে যেতে পারতেন না। নার্স ডাকতে হয়েছিল। এবারেও ভেবেছিলাম, তাই বুঝি করতে হয়।

ঝগড়ু হাসতে লাগল। লোকটা তোয়াজ করতে জানে।

সুচরিতা সভয়ে বললে, দাঁড়া বাবা, হাসিস না। জ্বরটা রাত্রে আবার না আসে!

ঝগড়ু তৎক্ষণাৎ বললে, না মাসিমা, আর আসবে না।

—কি করে জানলি?

—সেবারও আসেনি কি না। সাহেবের জ্বর ছেড়ে গেলে আর আসে না।

সুচরিতা হাসলে ঃ তাই নাকি! তুই এসব ছেড়ে দিয়ে এবার ডাক্তারি কর ঝগড়ু। সাহেবের সঙ্গে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি কতকগুলো শিশি-বোতল কিনে দিচ্ছি। এইখানে প্র্যাকটিসে বসে পড়।

সারারাত্রি দুজনেরই স্নায়ুর উপর অসম্ভব টান গেছে। দুজনেরই মধ্যে এখন যেন খোশগল্পের মৌজ এসেছে।

ঝগড়ু বললে, তা আমি পারি মাসিমা। আসলে মানুষ ভয় পায়

বলেই না ডাক্তার ডাকে। নইলে জ্বরে সত্যি সত্যি কিছু হয় না। খালি দুদিন একটু কষ্ট দেয়।

—বলিস কি রে! জ্বরে কিছুই হয় না?

—কি আর হবে মাসিমা! আমাদেরও তো জ্বর হয়। ডাক্তারও ডাকতে পারি না। কী আর হয় আমাদের? দু'দিন ভুগে সেরে উঠি।

—সবাই কি সেরে ওঠে রে?

—না ওঠে না। তারা ডাক্তার ডাকলেও বাঁচে না। তাহলে কি আর রাজা-মহারাজারা মরত? বলুন।

—নিশ্চয়।

একটু ভেবে ঝগড়ু আবার বললে, ডাক্তারে জীবন দিতে পারে না মাসিমা। শুধু সন্ন্যাসীরা পারেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। মরা মানুষ বাঁচাতে পারে, এমন সন্ন্যাসী আমি জানি।

—তাই নাকি রে! তাহলে যাওয়ার আগে তার ঠিকানাটা রেখে যাস। একা থাকি, হঠাৎ যদি মরবার মতো হই তাঁর কাছে গিয়ে পড়তে পারি।

ঝগড়ু মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল ঃ অত সহজ নয় মাসিমা। তাঁরা পারেন, কিন্তু বাঁচান না।

—তাহলে আর কি সুবিধা হল?

—কিছুই সুবিধা হল না। ওইটেই মজা!

ঝগড়ু সগর্বে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

পুরো তিন ঘণ্টা প্রণব একনাগাড়ে অবসন্নের মতো ঘুমুলে। যখন চোখ মেললে তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে। সুচরিতাকে দেখে ওর চোখে একটা শ্রান্ত হাসি শীতের শেষ অপরাহ্ণের রোদের মতো ভেসে উঠল।

বললে, কি রকম ভয় দেখিয়েছিলাম!

ওর হাসি দেখে সুচরিতার মুখে হাসি ফুটল। বললে, অতীত কালটা কি বিনয়ে ব্যবহার করলে? নইলে ভয় আমার এখনও ঘোচেনি।

প্রণব লজ্জিতভাবে হাসলে। একখানা অবশ হাত সুচরিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমাকে কত কষ্ট দিলাম।

সুচরিতা ওর হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে নিঃশব্দে বসে

রইল। একটু পরে ওর ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটুখানি হাসির রেখা ঈষৎ ঝিলিক দিয়েই মুহূর্ত মধ্যে মিলিয়ে গেল।

প্রণব নির্নিমেষে ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সেই কিশোরী মেয়ের কাঁচ মুখ আর নেই। এখন অনেক গম্ভীর, অনেক পরিণত হয়েছে। ওর হাসিটা তার দৃষ্টি এড়াল না।

জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ?

শাড়ির প্রান্ত দিয়ে যেন ঠোঁটের হাসিটাই মুছে ফেলে সুচরিতা বললে, না হাসিনি।

—দেখলাম হাসলে।

—এমনি হাসলাম।

—এমনি কখনও মানুষ হাসে?

—পাগলে হাসে বই কি।

প্রণব ছাড়লে না। বললে, তুমি তো পাগল নও। কেন হাসলে বলতে হবে।

—কি হবে শুনে?

—হবে। তুমি বল।

সুচরিতা বললে, কষ্টের কথা বলছিলে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে আরাম আমি কোনোদিন চেয়েছি?

—কোনোদিন চাওনি, না সুচরিতা?

প্রণব চোখ বন্ধ করে কি যেন ডুবে ডুবে খুঁজতে লাগল।

বললে, তোমাকে দেখলে আমার কি মনে হয় জান?

সুচরিতা নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

প্রণব বললে, মনে হয় তুমি যেন মহাশ্বেতা। তোমরা জন্ম জন্ম শুধু তপস্যাই করে যাও, না সুচরিতা? তপস্যার আনন্দেই তপস্যা, ফলের প্রত্যাশায় নয়।

সুচরিতা ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেল। বললে, আঃ! কি বাজে বকছ?

প্রণব করুণভাবে হাসলে ঃ আশ্চর্য। বাজে কথা বলার অবসর বড় পাই না। যে কথা মক্কেলের পকেট থেকে অর্থ টেনে আনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সেই কথাই বলি। কিন্তু আজ সেই সব মূল্যবান কথাই তুচ্ছ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অনর্গল অর্থহীন বাজে কথার মালা গেঁথে যাই শুধু।

সুচরিতা হেসে বললে, এই অবেলায়? সে কি ভালো লাগবে?

প্রণব যেন মুষড়ে গেল। সুচরিতার দিকে চেয়ে দেখলে, ওর ভীরু

চোখে সেই চঞ্চলতা আর নেই। পরিণত মুখ গাম্ভীর্যে ভরন্ত। নিজের কানের পাশেও একবার হাত দিলে, যেখানে গুটি কয়েক পাকা চুল চিকচিক করতে দেখেছে।

তবু বললে, অবেলা কি সকল ক্ষেত্রে বেলার দিকে চেয়েই ঠিক করতে হয় সুচরিতা? তোমার ভরন্ত মুখের দিকে আর আমার পাকা চুলের দিকে চেয়ে?

—তাই তো সবাই করে থাকে।

তা বটে। কিন্তু প্রণবের মনটা কোন্ পথে পাক খাচ্ছে কে জানে। সে হঠাৎ বললে, আচ্ছা আমরা যদি তা না করি? আমরা যদি গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে দিই?

—লোকে হাসবে।

—হাসলেই বা।

—লোকের হাসিকে তুমি ভয় পাও না?

—পাই। কিন্তু যদি স্থির করি ভয় কিছুতেই পাব না, তাহলে?

সুচরিতা অবাক হয়ে ওর কঠিন চোখের দিকে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে সেই কাঠিন্য যেন গলে যেতে লাগল। প্রণব ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সুচরিতা আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে। বুঝলে, প্রণব ঘুমিয়ে গেছে।

একটু পরে ঝগড়ু আর সুচরিতার চাপরাশি দুজনে মিলে একখানা লোহার খাট ওদিকের দেওয়ালের দিকে পাতলে। তাদের পিছনে সুচরিতা। সেই শব্দে প্রণব চোখ মেলে চাইলে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, খাট কি হবে?

সুচরিতা হাসলে। চাপরাশিকে বললে, বিছানাটা নিয়ে আয়।

ওরা দুজন চলে যেতে বললে, শোব।

—তুমি! এই ঘরে!—বিস্ময়ে প্রণবের চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে।

—উপায় কি, বল। হঠাৎ যদি তোমার কিছু দরকার হয়।

—কেন, ঝগড়ু তো ছিল সুচরিতা।

সুচরিতা উপেক্ষার একটা চুমকুড়ি কাটলে। জবাব দিলে না।

বোধ করি আগের রাত্রে জাগরণের জন্যেই সুচরিতার যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য না উঠলেও চারিদিক অনেকখানি ফরসা হয়ে এসেছে। দেখে

প্রণব খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত। ঝগড়ুটা এসে বোধ হয় ওর পিঠের নিচে বালিশটা দিয়ে গেছে।

ওর চোখের তারায় ক্ষুধার আগুন যেন দুখানা ছোরার মত ঝকঝক করছে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই সুচরিতা উঠে বসল। বললে, ঘুম ভেঙে গেছে তো আমাকে ডাকনি কেন?

উত্তরে বিড় বিড় করে প্রণব কি যে বললে, ঠিক বোঝা গেল না।

সুচরিতা উঠতে উঠতে বললে, ঝগড়ুকে বলি, তোমার মুখ ধোবার জল-টল দিক।

প্রণব বললে, দরকার নেই। আমি বাথরুম থেকে এসেছি।

—নিজেই? বাঃ! খুব বাহাদুর ছেলে হয়েছ তো?

হাসতে হাসতে সুচরিতা বেরিয়ে গেল। বলে গেল, ঝগড়ু তোমাকে পথ্য দিচ্ছে। আমি স্নান সেরে এসে ওষুধ দোব।

ওর ফিরতে দেরি হল না। পিঠের উপর ভিজে এলোচুল, পরনে একখানি সাদা আটপৌরে শাড়ি। সদ্যস্নানে মুখ এবং অনাবৃত বাহুযুগল সুমার্জিত।

ঔষধটা ঢালতে ঢালতে বললে, রোগের সময় যে লোকটা ওষুধ খাওয়ায় তার উপরেই রাগ সবচেয়ে বেশি হয়, না?

প্রণব হেসে ঔষধটা খেয়ে মুখটা বিকৃত করলে। তারপরে সে ধাক্কাটা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে কলকাতা ফেরবার দিনে কোন গাড়ি নেই?

—কেন বল তো?

—সোমবারে একটা বড় মামলা আছে। রবিবারে পৌঁছতে পারলেই সুবিধা হয়।

প্রণব ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চাইলে।

সুচরিতা নতমুখে টিপয়ের ঢাকাটা ঝাড়ছিল। কিন্তু প্রণব যেমন আশঙ্কা করছিল, এ প্রস্তাবে মোটেই সে বিরক্ত হল না। বললে, কাজের মানুষ, যাওয়া নিতান্ত দরকার হলে যেতেই হবে। তার একটা ব্যবস্থাও করতে হয়। কিন্তু দিনের গাড়িতে অসুবিধা আছে। তোমাকে রাত্রের গাড়িতেই যেতে হবে।

—ডাক্তারের একটা অনুমতিও নিতে হবে।

—তা হবে। কিন্তু জরুরী কাজ যদি থাকে, যাওয়া যদি নিতান্তই

আবশ্যক হয়, তাহলে ডাক্তার সঙ্গে করেও যেতে হবে। উপায় তো নেই।

প্রণব চুপ করে রইল।

সুচরিতা বললে, তোমাকে জোর করে আটকাবার ইচ্ছে আমার নেই। তবু আমি বলি, অত্যন্ত খেটেছ, শরীর তোমার ভাল নয়। নিতান্ত জরুরী কাজ না থাকলে দু একদিন থেকে যাও। এ জায়গাটা ভাল। বিশ্রামও হবে, চিকিৎসাও হবে।

বিশ্রাম এবং চিকিৎসার নামে প্রণব হেসে বলল, আমরা দিনমজুরি খাটতে এসেছি সুচরিতা। আমাদের জীবনে মৃত্যুর আগে বিশ্রাম নেই।

—তা বললে কি হয়?

—হতেই হয়। না হয়ে উপায় কি? ভাগ্যিস এই মামলাটা পেয়েছিলাম, তোমার এখানে এসে পড়েছিলাম আর অসুখটা হয়েছিল, নইলে এ ছুটিই বা আমাকে কে দিত বল?

করুণ ওর কণ্ঠস্বর।

সুচরিতা একখানা চেয়ার ওর খাটের একান্ত সন্নিকটে টেনে নিয়ে এসে বসল। বলল, তোমার সঙ্গে বিমান আর মাধুরীর জন্যে কিছু জিনিস দোব। বিশেষ কিছু নয়। কী-ই বা পাওয়া যায় এখানে! যাবে তো নিয়ে?

—মজুরি লাগবে।

—কত মজুরি বল।

প্রণবের ঠোঁটের কাছে উত্তরটা এসে গিয়েছিল। জোর করে আটকে ফেলল। সুচরিতার তা দৃষ্টি এড়াল না। প্রশ্নটা করে সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

তাড়াতাড়ি বলল, ওদের দেখতে ভারী ইচ্ছা করে।

—চল না একবার কলকাতায়। আমার সঙ্গেই চল।

অন্যমনস্কভাবে সুচরিতা বলল, এখন হয় না। অন্য এক সময় যাব বরং।

তারপর বলল, এসে পর্যন্ত তো নাচিয়ে বেড়ালে। অরুণাদির কথাটাও জিগ্যেস করবার ফুরসত পাইনি। কেমন আছে সে?

—খুব ভাল নয় বোধ হয়।

—কেন?

—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখি শুয়ে আছে। মনে হয়, ওর শরীরটা খুব সুস্থ নয়।

একটু থেমে প্রণব আবার বলল,—ভাবি জিগ্যেস করব। কিন্তু কাজের চাপে ভুলে যাই। ও নিজেও কিছু বলে না।

—খুব অন্যায়। ফিরে গিয়েই খবর নেবে এবং আমাকে জানাবে। আর টেনিস খেলে না?

—না। অসম্ভব মোটা হয়ে গেছে। পারেও না খেলতে।

মোটা হওয়ার প্রসঙ্গে সুচরিতা খুব হেসে উঠল। বললে, বল কি! খুব মোটা হয়েছে?

—মিসেস দত্তকে মনে আছে? প্রায় সেই রকম।

খুব মনে আছে। মিসেস দত্তের প্রসঙ্গে সুচরিতার হাসি যেন আর থামতে চায় না।

হাসি থামলে বলল, তাহলে কি ঠিক করলে? আজ রাত্রের মেলেই?

—হ্যাঁ। আমার মক্কেল কি ভেগে গেছে?

—না। রোজই আসছেন। মামলা জিতে খুবই খুশি হয়েছেন। এখনি আসবেন। তোমাকে একলা পাঠাতে আমার সাহস হচ্ছে না। হয় উনি নিজে তোমার সঙ্গে যান, নয় তো লোক দিন।

—দেখ কি করে। এখন তো আর গরজ নেই।

আলস্যে প্রণব একটা হাই তুলল।

প্রণব ফিরতে ওর চেহারা দেখে তো অরুণার চক্ষুস্থির!

—এ কী ব্যাপার!

অসুখের ফলে প্রণব অনেকখানি শীর্ণ হয়েছে, দুর্বলও। কিন্তু পরিহাস-প্রবণতা যায়নি।

বললে, খবর ভালোই। মামলায় জিত হয়েছে।

—সে তো তোমার মামলা। আমার মামলা তো হার করে নিয়ে এসেছ।

—কোনো উপায় ছিল না অরুণা। জ্বরটা বোধহয় গাড়িতেই এসেছিল। তবু একটা দিনেই মামলাটা সারবার জন্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত কোর্টে লড়লাম। মামলার উত্তেজনাও শেষ হল, আমিও অবসন্ন হয়ে পড়লাম। কী করে যে সুচরিতার বাসায় গেলাম মনে পড়ে না। তারপরে

বাধা দিয়ে অরুণা জিজ্ঞাসা করলে, সুচরিতাদি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিল? ছিল সে চিটাগঙেই?

—ছিল বই কি! স্টেশনে এসেছিল যে! কিন্তু যা ঠ্যালা পেয়েছে, আর কখনও তার বাসায় উঠতে দেবে কি না সন্দেহ।

প্রণব হাসতে লাগল।

—জ্বরটা কি খুব বেশি হয়েছিল?

—ভগবান জানেন, বেশি কি কম হয়েছিল। আমার কি জ্ঞান ছিল? সেকথা সুচরিতা জানে আর ঝগড়ু জানে।

অরুণা মনে মনে বললে, বুঝেছি। আমার সব দিক দিয়েই হার হয়েছে।

বললে, এত যদি অসুখ হয়েছিল, আমাকে একটা টেলিগ্রাম করলে না কেন?

—সেও ঝগড়ুকে জিগ্যেস কর। বললাম তো, সওয়াল শেষ করার পরে কে কি করেছে আর কে কি করেনি, তার কোনো কৈফিয়তই আমি দিতে পারব না।

অরুণা মনে মনে বললে, তোমাকে একা বসে সেবা করার মত সুযোগ সুচরিতাদি ছাড়তে পারে? টেলিগ্রাম করবে কেন? এত বোকা সে নয়।

সেদিন আর প্রণবকে সে হাইকোর্টে যেতে দিলে না। সে ক্ষমতাও প্রণবের ছিল না। শরীর তার বেশ দুর্বল।

দুপুরে ঝগড়ুকে নিয়ে অরুণা পড়ল। প্রণবের অসুখ সম্বন্ধে নানানতর প্রশ্ন। ঝগড়ু একে একে সে সব প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিলে।

বললে, এ রকম ভারী অসুখ সাহেবের আমি কখনও দেখিনি মা। মাসিমা ছিলেন বলেই বেঁচে গেলেন।

অরুণা শিউরে উঠলঃ তাই নাকি রে?

—হ্যাঁ মা।

—তা' আমাকে একটা টেলিগ্রাম করলি না কেন?

—টেলিগ্রাম তো করেছিলাম মা।

—সে তো জ্বরের জন্যে নয়।

—না মা। মাসিমা বললেন, অতদূরে অসুখের কথা জানালে মিছিমিছি তোর মা ভাববেন ঝগড়ু। বরং তার করে দে, মামলার জন্যে সাহেব আটকে গেছেন।

অরুণা বুঝলে, সে মিথ্যা সন্দেহ করেনি। এ-খবরটা জানাবার মতো মেয়ে সুচরিতা নয়।

জিজ্ঞাসা করলে, তোর মাসিমা খুব সেবা করেছেন, না রে?

—ওই তো বললাম মা, তেনার জন্যেই সাহেবকে আমরা ফিরে পেলাম। সে কি সোজা সেবা মা! দিনে রাত্রে চোখের পাতা এক করেন নি। সে যে কি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বলে সেই অত্যাশ্চর্য সেবার বিবরণ ঝগড়ু একটি একটি করে দিতে লাগল। শুনতে শুনতে অরুণা কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল। সুচরিতাকে সে যে শ্রদ্ধা করে এ তো সে নিজের মুখে প্রণবের কাছেই স্বীকার করেছে। শুধু বলেনি যে, সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু পরিমাণ করুণাও মেশান ছিল। যারা পায় না তাদের সম্বন্ধে যারা পায় তাদের যে করুণা স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠে, সেই করুণা। অরুণা শ্রদ্ধা করে সুচরিতার নিষ্ঠাকে, তার চরিত্রের দীপ্তি, হৃদয়ের উদারতা, মনের দৃঢ়তা এবং বুদ্ধির প্রাখর্যকে। কিন্তু সেই সঙ্গে করুণা করে ভালোবেসেও প্রণবকে পেলে না বলে। প্রণবের উপর তার বিতৃষ্ণার কারণ সুচরিতাকে ভালোবেসেও সে আবার, দ্বিতীয়বার, বিবাহ করেছে বলে।

ঝগড়ুর কথা শুনতে শুনতে অরুণার মন থেকে সুচরিতা সম্বন্ধে করুণা ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগল এবং তার জায়গায় এসে জমতে লাগল ঈর্ষা,—সাপের বিষের মতো বিন্দু বিন্দু নীল বিষ। সেই বিষ তার সর্বদেহে ধীরে ধীরে যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সুচরিতার সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে ঝগড়ুর মন ছিল ভরে। রোগের বিবরণ, সুচরিতার নিরলস সেবা, প্রণবের জ্বরের সময়কার অধৈর্য ও অস্থিরতা ঝগড়ু বলে চলেছে তো চলেছেই। কোনোদিকে খেয়াল না করে মনের আবেগেই বলে চলেছে। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতেই দেখলে, অরুণার মুখ যেন কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি শরীর খারাপ করছে মা?

কোনো উত্তর নেই। অরুণার দুই চোখের তারা নিষ্কম্প, স্থির।

ভয় পেয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল সাহেবকে ডাকতে। প্রণবের তখন ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আলস্য কাটেনি। ঝগড়ুর চীৎকারে ছুটে এল প্রণব। অরুণার গায়ে হাত দিয়ে প্রণব ডাকতেই তার অচৈতন্য দেহটা সোফায় এলিয়ে পড়ল।

প্রণব ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারকে টেলিফোন করে তখনই গাড়ি পাঠিয়ে দিল তাঁর কাছে, পাছে তাঁর আসতে বিলম্ব হয়। রোগিণীকে পরীক্ষা করে তিনি একটা ইন্‌জেক্‌শান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে অরুণার

জ্ঞান হল।

এর আগে এমন অজ্ঞান কখনও সে হয়নি। জ্ঞান হয়ে স্বামী, পুত্র, ডাক্তার, চাকর-বাকর সকলকে চারিদিকে দেখে প্রথমটা সে বিস্মিত হল। তারপর অবস্থাটা অনুমানে বুঝে নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে।

পাশের ঘরে প্রণবকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার বললেন, হার্টটা আমার খুব ভালো লাগল না। ওটা ভালো করে দেখান দরকার। এর আগে কি আর কখনও এ রকম হয়েছিল?

অবস্থা দেখে প্রণবের মুখ শুকিয়ে গেছে! শুষ্ক কণ্ঠে বললে, এর আগে অজ্ঞান কখনও হন নি। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব ক্লান্ত মনে হত। কিন্তু জিগ্যেস করলে বলতেন, ও কিছু নয়।

—এই হল আমাদের দেশের মেয়েদের দস্তুর। বিছানা না নেওয়া পর্যন্ত নিজের অসুখ যথাসাধ্য উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তার ফলে আরও খারাপ হয়। যাই হোক, এ ধাক্কা কেটে গেল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, থ্রম্বসিস। এখন অনেকদিন ও'র পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এবং অবিলম্বে একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখান।

সারারাত্রি অরুণা ক্লান্তভাবে পড়ে রইল। সকালে মুখের ভাব কিছুটা স্বাভাবিক হল। প্রণব কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসলে।

—একটু ভালো বোধ হচ্ছে?—প্রণব জিজ্ঞাসা করলে।

অরুণা ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

ওর খাটের একপ্রান্তে বসে প্রণব বললে, চিটাগঙে সুচরিতা তোমার কথা জিগ্যেস করলে। বললাম, তোমার শরীর খুব ভালো ঠেকে না। সুচরিতা বকাবকি করতে লাগল। বললে, গিয়েই তাকে ভালো করে দেখাবে। বললাম, দেখাব কাকে? নিজের শরীরের কথা সে কি কখনও বলে? তবু স্থির করে এসেছিলাম, কলকাতায় ফিরেই তোমাকে দেখাতে হবে। ইতিমধ্যে এই কাণ্ড!

—সুচরিতাদিকে লিখে দিও, ভয় নেই। এখনও অনেক দিন বাঁচব।

অরুণা হাসলে।

তার কথার পিছনে একটুখানি খোঁচা বোধ হয় ছিল! খুব সূক্ষ্ম একটুখানি খোঁচা, যা পুরুষের কান এড়িয়ে যায়, কিন্তু মেয়েদের কানকে ফাঁকি দিতে পারে না।

প্রণব গম্ভীরভাবে বললে, তাই যেন হয়! শিগগির যেন সেরে ওঠ।

একটু পরে অরুণা জিজ্ঞাসা করলে, সুচরিতাদিকে পৌঁছনো সংবাদ

দিয়েছ?

—কাল একটা টেলিগ্রাম করেছি। আজ একখানা চিঠি দিতে হবে।

—লিখে দিও, ঝগড়ুর মুখে তার সেবার বিবরণ শুনে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রণব তাড়াতাড়ি বললে, সে কথা আমি লিখতে পারবনা অরুণা। সুস্থ হয়ে তুমি নিজেই লিখ।

—তাই বটে। তোমার সেবা সুচরিতাদি করবে, এ আর আশ্চর্য কি! এ তো ঝগড়ুকে দেখিয়ে সেবা করা নয়। নিজের অন্তরের তাগিদেই করেছে। কিন্তু আমাকে তো একটা কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

—আমি বলি, তাও নাই জানালে অরুণা। আমাকে অসুস্থ শরীরেও তুমি যে পাঠালে, সে তো তারই ভরসায়। নইলে কখনই আমাকে একলা ছেড়ে দিতে না। তাতে মক্কেলের অদৃষ্টে যাই থাক। বল?

—সত্যি!—ক্লান্ত স্বরে অরুণা স্বীকার করলে।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

সুচরিতাকে অরুণা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আবার প্রশ্ন করল, তোমার চিঠিতে আমার অসুখের কথা লিখবে না কি?

—তুমি কি বল?

—লিখ না।

—কেন?

—দেখ, আমাদের অসুখ-বিসুখ নিয়ে তোমরা হৈ চৈ কর, এটা আমাদের ভালো লাগে না।

—আচ্ছা লিখব না। তুমি কিন্তু নড়াচড়া করবে না। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে গেছেন। তাছাড়া এখনই ডক্টর বোস আসছেন।

—কেন?—অরুণা বিরক্তভাবে প্রশ্ন করল।

—তোমার হার্টটা একবার পরীক্ষা করতে।

—কী হয়েছে হার্টে?

—হয়তো কিছুই হয়নি। কিন্তু সেটাও তো নিশ্চয় করে জানা দরকার।

অরুণা কিছু বললে না। শুধু বিরক্তভাবে পাশ ফিরলে। কিন্তু তখনই আবার প্রণবের দিকে ফিরে বললে, আমার মনে হয় ওটা হিস্টেরিয়া। আমার এক মাসীমার ছিল। ওর জন্যে ডাক্তার দেখাবার কি আছে?

হিস্টেরিয়া সংক্রামক কি না, হলেও মাসীমার ফিট বোনঝিতে সংক্রামিত হয় কি না, তা নিয়ে রোগীর সঙ্গে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। প্রণব সে তর্কের ধার দিয়েও গেল না। এমন কি ডাক্তারে যে আশঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন তাও অরুণাকে শোনান আবশ্যক মনে করলে না।

শুধু বললে, খুব সম্ভব হিস্টেরিয়াই। কিন্তু অন্ধকারে বসে না থেকে সেটাও তো নিশ্চয় করে জানা দরকার। সেই জন্যেই ডক্টর বোসকে কল দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ।

—তবে যা মনে চায় কর।

বলে অরুণা আবার বিরক্তভাবে পাশ ফিরে শুল।

জরিপের লোকেরা জমি মাপ করার জন্যে একটা শিকল টেনে টেনে নিয়ে যায়। চাকুরি-জীবনও তেমনি একটানা একটা শিকল টেনে নিয়ে যাওয়া,—এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে। এর মধ্যে যেটুকু বৈচিত্র্য, তা শিকল টেনে নিয়ে যাওয়ায় নয়,—এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়ায়।

সুচরিতাও তেমনি একটা শিকল টেনে নিয়ে চলেছে। জলপাইগুড়ি থেকে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে মালদহ, তারপরে রাজসাহী, বাঁকুড়া। কোথাও দু বৎসর, কোথাও তিন বৎসর, কোথাও বা আরও বেশি। এর মধ্যে ক্বচিৎ-কখনও দু একদিনের ছুটিতে কলকাতায় এলে কখনও বা প্রণবের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনও বা হয়নি।

বাঁকুড়া থেকে দিনাজপুরে বদলি হবার সময় সুচরিতা খবর পেলে, বিমান তার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। বদলির পথে কলকাতা হয়েই ওকে আসতে হবে।

সুতরাং স্থির করলে, কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা থেকে বিমানকে অভিনন্দন জানিয়ে যাবে।

সকালের ট্রেনে সুচরিতা হাওড়া পৌঁছল। বদলীর হুকুমটা এত আকস্মিক এসেছিল যে কলকাতায় কাকেও খবর দেওয়ার সময় পায়নি। আর্দালিটার সাহায্যে নিজেই জিনিসপত্র গুছিয়ে দাদার বাড়িতে এসে উঠল। দুপুরে বিমানের জন্যে কতকগুলো ইংরিজি এবং বাংলা বই কিনে প্রণবের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত।

সেদিনটা রবিবার। প্রণব বাড়িতেই ছিল। ওকে দেখে প্রণব এবং অরুণা উভয়েই অবাক্! উভয়েই আনন্দে কলরব করে উঠল:

—কী আশ্চর্য! তুমি আসবে একটা খবর পর্যন্ত দাওনি তো?

—সময় পেলাম কই? বদলির খবর জানতাম। কিন্তু সোমবারে জয়েন করতে হবে, সে টেলিগ্রাম কাল পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোছগাছ করে সন্ধ্যের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়লাম। বিমান কোথায়?

—কোথায় বেরিয়েছে। ফিরবে এখনই। কিন্তু সোমবারে তোমার জয়েন করা তো হবেনা সুচরিতাদি।

—কেন?

—হাতের বইগুলো দেখে বোধ হচ্ছে, বিমানের পাশের খবর পেয়েছ। কালকে তাই নিয়ে একটু সামান্য আয়োজন করেছি। দু'চারজন বন্ধুবান্ধব আসবেন। আর তুমি থাকবে না? কেন, আমার চিঠি পাওনি?

—পেয়েছি। কিন্তু আমার তো কোন উপায় নেই ভাই। সোমবার কাজে যোগ দিতেই হবে। আর উৎসবে আমি নাই-বা থাকলাম। আমি বিমানকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। তাহলেই তো হল।

প্রণব এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। নিঃশব্দে ওদের আলাপচারি শুনছিল। কিন্তু আর সে নির্বাক থাকতে পারলে না।

বললে, তাহলেই হল না। তুমি বোঝ না কেন সু।

বলে অরুণার দিকে চাইলে। অভিপ্রায় তার অতি স্থূল চেহারার দিকে সুচরিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সুচরিতা ইঙ্গিতটা ধরতে পারলে না।

—এতে বোঝবার কি আছে বল।

প্রণব গম্ভীরভাবে বললে, শুধু আশীর্বাদেই কুলোবে না, দায় উদ্ধার করে দিয়ে যেতে হবে। আয়োজন অবশ্য বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু যেটুকুও করা হচ্ছে, তা তোমার ভরসাতেই।

অরুণা লজ্জিতভাবে ধমক দিলে: আঃ! কি বাজে বকছ?

সুচরিতা প্রণবকে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে?

অরুণার ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করেই প্রণব জবাব দিলে, তার মানে অরুণা যতবার খুশি একতলায় নামতে পারে, কিন্তু একবারের বেশি দোতলায় উঠতে পারে না। সুতরাং

এতক্ষণে সুচরিতা বুঝতে পারলে। কিন্তু হাসি চেপে সভয়ে

জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি, কি ভীষণ মুটিয়েছে অরুণাদি!

লজ্জিত হাস্যে অরুণা জবাব দিলে, কি করি বল তো? খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবু দিন দিন মোটা হচ্ছি।

—হাঁট।

অরুণার হয়ে প্রণব জবাব দিলে, রোজ। এই চাকরীটা মাস কয়েক হল পেয়েছি। কোর্ট থেকে ফিরে পোশাক বদলেই দুজনে গাড়ি করে গঙ্গার ধারে যাই। সেখানে ঘণ্টা খানেক হেঁটে আবার ফিরে আসি।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, কিছু উপকার বুঝছ?

অরুণা বললে, কিছুমাত্র না।

প্রণব বললে, বরাবর খেলাধুলো করেছে। সেইটি ছাড়ার জন্যেই বোধহয় এমন হচ্ছে।

—খেলা তো আমিও ছেড়েছি।—সুচরিতা বললে।

—কিন্তু তুমি তো বসে থাক না। কাজকর্ম, ঘোরাফেরা আছে। ওর তো কিছুই নেই।

—তুমি ফের টেনিস ধর অরুণাদি।

—আর পারি না ভাই! হাঁপিয়ে উঠি। বুকের ভিতরটা কি রকম করে ওঠে। তারপরে এখন তো ডাক্তারেরও নিষেধ।

—তুমি আমার কাছে চল অরুণাদি। আমি তোমাকে সারিয়ে দোব।

—তা তুমি পার সুচরিতাদি।—অরুণা বললে,—সেবারে যে সেবাটা তুমি ওঁর করেছিলে, ঝগড়ুর কাছে শুনে কী লোভই যে হয়েছিল।

—মনের লোভ মনেই চেপে না রেখে চলই না আমার সঙ্গে!

অরুণা হাসলে। বললে, আজ নয়, কিন্তু তাই যাব। ছেলে মেয়ে আর একটু বড় হোক তারপরে। বিরক্ত হবে না তো?

বাধা দিয়ে সুচরিতা বললে, না ভাই, অতদিন পরে তোমার আমার কাছে গিয়ে সেবা নিতে যেন না হয়। তার মধ্যে যেন তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।

—সে ভরসা কম।—কিন্তু তখনই কথার মোড় ঘুরিয়ে বললে,—আচ্ছা যাক সে কথা। এখন কাল থাকতে হবে। সেই কথাটা দাও।

সুচরিতা হাত জোড় করলে। বললে, কোনো উপায় নেই অরুণাদি। গরিব মানুষ, উদয়াস্ত খেটে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই। সোমবার কাজে যোগ না দিলে খাওয়া বন্ধ হবে।

অরুণা ওর কথাটা ভাবলে। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার গাড়ি কখন?

—রাত্রি দশটায়।

—বেশ, চা হচ্ছে! খেয়ে ওবাড়ি থেকে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এস। এখান থেকে উনি নিজে গিয়ে তোমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসবেন।

—কিন্তু দাদা বৌদি হয়তো কিছু মনে করবেন।

প্রণবের দিকে চেয়ে অরুণা বললে, বেশ! তাহলে তুমি সুচরিতাদির সঙ্গে গিয়ে বরদাবাবুর মত নিয়ে এস। না, পারবে না?

অভিনয়ের ভঙ্গীতে প্রণব সুমুখের দিকে একটা হাত প্রসারিত করে বললে, অকৃতজ্ঞ নারী! তোমার আদেশ আমি কবে অমান্য করেছি?

অরুণা হেসে বললে, না। খুব বিশ্বস্ত স্বামী তুমি।

তাই হল। সুচরিতার জন্যে ওরা সেই সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়ার একটা বিশেষ ব্যবস্থা করলে। রাত্রে প্রণব নিজে গিয়ে ওকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এল।

বিমানের ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার খবর সুচরিতা আদৌ পেয়েছিল কি না, পেলে কোথায় পেয়েছিল ঠিক মনে পড়ে না। ও তখন প্রোমোশনের জন্যে তদ্বিরে খুব ব্যস্ত ছিল। চিঠি যদি পেয়ে থাকে তাহলে আনন্দজ্ঞাপন করে একটা উত্তরও নিশ্চয়ই দিয়ে থাকবে।

এই প্রোমোশনটা ওকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। ভুল করেছিল, একবার বিলেত না গিয়ে। সেখান থেকে শিক্ষা সম্পর্কে যে কোনো একটা শস্তা ডিগ্রী নিয়ে এলে এত তদ্বিরের দরকার হত না। এখনও এইজন্যে এত দৌড়-ঝাঁপ, ধরাধরির উৎসাহ সে দেখাত না, যদি তার অবসর নেওয়ার আরও অনেক বিলম্ব থাকত। কিন্তু অবসর নিতে আর মাত্র কয়েকটি বৎসর। তারপরেও অবশ্য আরও কিছুদিন চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সুচরিতার নেই। দীর্ঘকালীন চাকুরির এক-ঘেয়েমিতে সে ক্লান্ত। আর ভাল লাগে না চাকুরি। একলা প্রাণী। চাকুরি হলও অনেক দিন। যে টাকা এই দীর্ঘ দিনে সে জমিয়েছে, তাতে কলকাতায় ছোট একখানা বাড়ি তৈরি করে শেষ জীবনটা চমৎকার কেটে যাবে।

এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় বিমানের ইণ্টারমিডিয়েট পাশের খবর সে পেয়েছিল কি না ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু দিনাজপুর থেকে

যখন সে বহরমপুরে বদলি হয়ে এল, তার কয়েক মাস পরেই একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র তার হাতে এল। তাতে সই আছে দুজনেরই,--প্রণবের এবং অরুণার।

সেটা হচ্ছে বিমানের বি-এ পাশের খবর। একসঙ্গে বি-এ পাশের এবং বিলাত যাওয়ারও।

বিমান বি-এ'তে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে এবং বিলেত যাচ্ছে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে। মফঃস্বল থেকে কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করে সুচরিতা সবেমাত্র ফিরেছে, এমন সময় চিঠিখানা তার হাতে এল।

সুচরিতা তখন চুল খুলেছে স্নান করতে যাবার জন্যে।

কিন্তু স্নান করতে যাওয়া হল না। বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে বসে কত কী সে ভাবতে বসলঃ

সেই সৌদামিনীর ছেলে! সৌদামিনীকে সে চোখে দেখেনি। কিন্তু কল্পনা করতে পারে। ফুটফুটে দীর্ঘাবগুণ্ঠিতা একটি মেয়ে যার পদ্মফুলের মত দুটি পায়ে বিশ্বের লজ্জা জড়িয়ে ছিল। সমস্ত দিন সে থাকত আকাশের তারার মত অনেক দূরে,—অনেক দূরে। তাকে ছোঁয়া যেত না, ধরা যেত না—পৃথিবীর নাগালের বাইরে। রাত্রের অন্ধকারে সব কিছু যখন আবছায়া, সব কিছু রহস্যময়,—এক ফোঁটা যুঁইফুলের মত সে তখন প্রণবের বিছানায় এসে টুপ করে পড়ত। ভোরের আলো ফুটতেই সে আলোতে আবার সে মিলিয়ে যেত। গন্ধ ছাড়া কোনো চিহ্নই রেখে যেত না।

তারপরে একদিন থেকে রাত্রেও আর সে এল না। দিন এবং রাত্রির কোনো সময়েই প্রণব আর তাকে খুঁজে পেলে না। কিন্তু যাওয়ার সময় ওই মেয়েটিই প্রণবকে কতখানি ধাক্কা দিয়ে গেল, তা আর কেউ না জানলেও সুচরিতা জানে।

তারই চিহ্ন বিমান। সে চলল বিলেত, দেবদুর্লভ সিভিল সার্ভিস চাকুরির জন্যে।

এতদিন চাকুরি করেছে, ছুটি সুচরিতা নেয়নি বললে চলে। অনেক ছুটি তার জমে গেছে। সাতদিনের ছুটির দরখাস্ত করে তখনই সুচরিতা অরুণাকে টেলিগ্রাম করে আনন্দ এবং পার্টিতে যোগদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করল। এবং বসে বসে যাওয়ার দিন গুণতে লাগল। আর এই বালিকাসুলভ আগ্রহে তার নিজের মনেই হাসি আসতে লাগল। এতদিন

কোথায় ছিল এই আগ্রহ? অফিসে বসে ফাইলের পর ফাইল আর ট্যুরে বেরিয়ে গ্রামের পর গ্রাম, ধুলোভরা মেঠো রাস্তা আর সোনালী ফসল,—তার মধ্যে কবার মনে পড়েছে প্রণবের কথা? মনে প'ড়ে কবার মন ছুটে যাবার জন্যে পাখা ঝাপ্‌টেছে?

আশ্চর্য মেয়েদের জীবন!

যেন একখানা শাড়ি। কোনোটা রঙিন, লতা-পাতা-নকশা-কাটা, কোনোটা বা স্রেফ সাদা। আর বয়সগুলো পাড়। চারিদিকে ঘিরে ঘিরে বাঁধতে চায়,—পারে না। মাঝখানের জমির উপর কিছুতে ওর ছায়া পড়ে না। বাঁধনের মধ্যে থেকেও জীবন সেখানে মুক্ত, মহাকালের রাজত্বের বাইরে।

প্রণবদের পার্টিতে বাইরের নিমন্ত্রিত একমাত্র সুচরিতা। আর সবাই কলকাতাতেই থাকে। অরুণা বললে, সুচরিতাকে ওদের বাড়িতেই তুলতে হবে।

অরুণার প্রস্তাব শুনে প্রণব তো অবাক্!

কুণ্ঠিতভাবে বললে, কী দরকার অরুণা! ওদের নিজেদের বাড়ি যখন রয়েছে তখন সেইখানে ওঠাই তো ভালো।

অরুণার দৃষ্টি জেদে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, না। সেবারে তোমার অসুখে যা সেবা করেছিল, সে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তাকে দিনকয়েকের জন্যে আমার কাছে রাখবার লোভ আমার বহুদিনের। তুমি বাধা দিও না।

প্রণব বললে, তা যেন না দিলাম। কিন্তু বরদা রয়েছে। তার বোন তার কাছে না উঠে এখানে উঠবে, সেটা সে পছন্দ করবে কেন?

—না করবার কি আছে? বিমানের পরীক্ষা পাশ এবং বিলেত যাওয়ার জন্যেই এই অনুষ্ঠান। সে আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের কাছে এই উপলক্ষ্যে এসে উঠবে। এমন কি দোষের? বন্ধু কি বন্ধুর বাড়িতে ওঠে না? তুমি তো সুচরিতাদির বাড়িতেই উঠেছিলে।

প্রণব হাসলে। বললে, সেখানে তো আর আমার দাদার বাড়ি ছিল না।

—নাই থাকল। হোটেল তো ছিল। সেখানেও তো উঠতে পারতে। কিন্তু ওঠনি তো। আমি বলছি বরদাবাবু কিছু মনে করবেন না। না হয়, তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসব। সেই ভালো। না?

—সে না হয় হল। কিন্তু আরও তো কথা আছে।—প্রণব আবার ক্যাঁকড়া তুললে।

—কি কথা বল।—অরুণার চোখে সেই জেদের কাঠিন্য।

প্রণব একটু দ্বিধা করতে লাগল।

—বল কি কথা?—অরুণা আবার জিজ্ঞাসা করলে।

একটা ঢোঁক গিলে প্রণব বলতে বাধ্য হল : তার মর্যাদা রাখতে পারবে তো?

—মর্যাদাটা কি?—মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে অরুণা জবাব দিলে,—তার জন্যে সিংহাসনও পাততে হবে না, কিছুই না। বন্ধুর বাড়ি আসবে নিজের লোকের মতই থাকবে। তার আর মর্যাদা-অমর্যাদা কি?

—কিন্তু

প্রণব আবার থামলে।

—কিন্তু?—অরুণার চোখে জিজ্ঞাসা।

প্রণবকে বলতে হল : কিন্তু তোমার মন তো ওর ওপর খুব প্রসন্ন নয়।

—কে বললে!—অরুণা চট্ করে জবাব দিলে,—সুচরিতাদির ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা।

—কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার মন ওর ওপর খুব কঠিন হয়ে ওঠে দেখেছি।

—ভুল দেখেছ।—অরুণা তরল কণ্ঠে হেসে উঠল,—কঠিন হবে কেন? তুমি ওকে ভালোবাস বলে?

এর আগে কোনোদিন অরুণা এমন স্পষ্ট করে এ প্রসঙ্গ তোলেনি। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে প্রণব ওর দিকে চেয়ে রইল।

অরুণা বলতে লাগল : তোমাদের কথা অনেকদিন ধরে অনেক রকম করে ভেবেছি। মনে খুবই কষ্ট পেয়েছি সেটা অস্বীকার করি না। কিন্তু আজ আর এ নিয়ে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। সুচরিতাদির সম্বন্ধে তো নয়ই, তোমার সম্বন্ধেও না।

প্রণবের মুখে এল জিজ্ঞাসা করে, কেন? কিন্তু কথা ফুটল না। হতবাক হয়ে সে ওর মুখের দিকে চেয়েই রইল।

নিজের মনের খেয়ালেই অরুণা বলতে লাগল : হয়ত জিগ্যেস করবে কেন? কেন তোমার উপর রাগ নেই, তার উপর ঈর্ষা নেই? কারণটা আমি ঠিক গুছিয়ে হয়তো বলতে পারবো না। ঠিক গুছিয়ে বলার মতো বিষয়ও নয়। তবু কেন নেই জান?

প্রশ্নটা করলে বটে, কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাইলে না। তার উত্তরের অপেক্ষাও করলে না। একটুখানি থেমে নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিতে লাগলঃ

তোমার উপর রাগ নেই, কারণ তুমি কোনো অপরাধ করনি। ভালো কেউ বিচার করে বাসে না। তোমার উপর রাগ হত যখন ভাবতাম, এর পরে তুমি সুচরিতাদিকে বিয়ে না করে, আমাকে বিয়ে করলে কেন, কি জন্যে। কিন্তু তারও জবাব পেয়ে গেছি।

—কি জবাব পেলে!—কোনোমতে কথা-কটি যেন প্রণবের শুষ্ক কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল।

অরুণা হেসে বললে, সে শুনে কি করবে? কিন্তু পেয়ে গেছি।

হাসির একটা সংক্রামকতা আছে। প্রণবও যেন ধীরে ধীরে সহজ হতে লাগল। সেও হেসে বললে, তাতে রাগটা যেতে পারে। কিন্তু আমার ওপর শ্রদ্ধা তো আসবে না?

—কী যে বল তুমি! তোমার ওপর শ্রদ্ধা আসবে না?

কোমল আদরের একখানি হাত প্রণবের কাঁধের উপর রেখে অরুণা বললে, কত পুণ্যে মহাদেবের মতো তোমাকে পেয়েছি। তুমি তো কোনোদিন আমার ওপর অবিচার করনি। কত বড় তোমার হৃদয়! সেই হৃদয়ে কত স্নেহ, কত ক্ষমা, কত করুণা! তোমাকে অশ্রদ্ধা করব! তুমি কারও ওপর অন্যায় করতে পার না।

প্রণবের সমস্ত দেহে যেন একটা রোমাঞ্চ বয়ে গেল। সুগভীর অনুভূতিতে সে কতক্ষণ আবিষ্টের মতো বসে রইল। ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করলে, আর সুচরিতা?

অরুণাও যেন অন্য লোকে ছিল। সুচরিতা সম্বন্ধে কি যে বলেছে তার কিছুই মনে নেই। বললে, কি সুচরিতা?

—তার ওপর ঈর্ষা নেই কেন, বললে না তো?

—তার ওপর?

এতক্ষণে মনে পড়ল আগের কথা। অরুণার চোখের উপর যেন স্বপ্নের পাতলা একটা পর্দা পড়ল।

কি যেন একটু ভেবে বললে, সুচরিতাদি ঈর্ষা-দ্বেষের ঊর্ধ্বে। তাকে ঈর্ষা করা যায় না।

গভীর শ্রদ্ধায় দুটি করতল যুক্ত করে অরুণা বোধ করি তারই উদ্দেশে নমস্কার জানালে।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল আর দেরি কোরো না। বরদা-বাবুর অনুমতিটা নিয়ে আসা যাক।

উঠতে উঠতে প্রণব বললে, চল।

প্রণব আর অরুণা গিয়ে বরদা আর তার স্ত্রীর সম্মতিও নিয়ে এল। কিন্তু সেকথা ওরা সুচরিতাকে জানাল না। সুচরিতার টেলিগ্রাম পেয়ে ওরা তখনই প্রি-পেড টেলিগ্রাম করলে তার ট্রেন এবং পোঁছবার সময়টা জানাবার জন্যে।

সুতরাং শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেই সুচরিতা দেখলে প্রণব এবং অরুণা তার জন্যে প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে।

ওর দিকে চেয়েই প্রণব হো হো করে হেসে উঠল,—দেখছ অরুণা, সুচরিতারও মাথার চুলে পাক ধরেছে।

অরুণা হেসে বললে, তা আর ধরবে না কেন? আমার ধরেছে আর ওর ধরবে না? বয়স তো হচ্ছে সবারই।

প্রণব বলল, তা নয়। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, একরাশ কালো চুল নিয়ে সুচরিতা গাড়ি থেকে নেমেই আমার এই দুগ্ধধবল মাথার দিকে চাইবে, সে অসহ্য!

এতক্ষণে সুচরিতা কথা বললে,—তার আর অসহ্য কি! ছেলে বিলেত যাচ্ছে। দুদিন পরে বউ আসবে, জামাই আসবে। এখন চুল কাঁচা থাকলেই অসহ্য।. বল অরুণাদি?

—নিশ্চয়। তোমার জিনিস সব নেমেছে?

সুচরিতা চেয়ে দেখে বললে, হ্যাঁ।

চাপরাশিটাও সায় দিলে। একটা কুলির মাথায় সেগুলো চাপিয়ে ওরা বেরুল। বাইরেই প্রণবের প্রকাণ্ড বড় গাড়িখানা অপেক্ষা করছিল। তাইতে গিয়ে বসল।

অরুণা হেসে বললে, কোথায় যাচ্ছ জান তো?

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—আমাদের বাড়ি। এ কটা দিন সেখানেই কষ্ট করে থাকতে হবে।

—কষ্ট করে?—সুচরিতা হাসলে—থাকা যাবে। কিন্তু দাদা রাগ করবে না তো?

—তাঁদের অনুমতি নিয়ে রেখেছি।

প্রণবের দিকে চেয়ে সুচরিতা বললে, ভালোই হল। তোমার সঙ্গে কতকগুলো বৈষয়িক আলোচনাও আছে। পার্টির ঝামেলা মিটলে সুস্থ হয়ে করা যাবে। আমি সাত দিনের ছুটি নিয়েছি।

—সর্বনাশ!—প্রণব বললে—সত্যি সত্যি বৈষয়িক আলোচনা? না, নাপিত দেখলেই চুল কাটার কথা মনে পড়ে?

—কেন? আমি কি মানুষ নই? আমার কি বৈষয়িক আলোচনা থাকতে নেই? না, ফী দোব না বলে পাশ কাটাতে চাইছ?

সুচরিতা হাসলে।

অরুণা বললে, ও ওইরকমই হয়েছে। টাকা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

—তাই নাকি?—সুচরিতার কণ্ঠে হাসির লহর।

—হ্যাঁ। খালি হাইকোর্ট চেনে, আর মক্কেল চেনে। আর সব ভুলে গেছে। চুল যত পাকছে, টাকার লোভও ততই বাড়ছে।

প্রণব বললে, বলে যাও। আমি পুত্তলিকা,—চক্ষু আছে দেখিতে পাই না, কর্ণ আছে শুনিতে পাই না। যা খুশি বলে যাও।

ঘাড় বেঁকিয়ে অরুণা বললে, হ্যাঁ, তুমি সেই লোক! পুত্তলিকা! তোমার সম্বন্ধে বরং বলা যেতে পারে, তোমার চক্ষু নাই তবু দেখিতে পাও, কর্ণ নাই তবু শুনিতে পাও!

অরুণা এবং সুচরিতা দুজনেই হেসে উঠল।

বিকেলে এক সময় সুচরিতা প্রণবকে বললে, দেখ, আমার তো অবসর নেবার সময় প্রায় হয়ে এল।

—বল কি! এরই মধ্যে?

—এরই মধ্যে কি গো! চাকরিতে ঢুকেছি কি আজ! মনে পড়ে না কবে।

—তারপরে?

—এইবার তো একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় দরকার।

—এইটেই কি তোমার সেই বৈষয়িক ব্যাপারটা?

—হ্যাঁ, এইটেই।

—তারপরে বল।

—এখন আমার জন্যে তোমাদের কাছাকাছি কোথাও একটুখানি জায়গা কিনে একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় বানিয়ে দাও।

অরুণা বললে, হরিশ বাগচীর বাড়ির পাশের জায়গাটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?

প্রণব বললে, হয়নি বোধ হয়। হলে জানতে পারতাম। নেবে ও জায়গাটা? কাঠা পাঁচেক হবে।

সুচরিতা বললে, তুমি বললে নিতে পারি।

প্রণব উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক আছে। ভদ্রলোক আমারই মক্কেল। তুমি ফিরে যাবার আগেই ওটা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর বাড়ির ব্যবস্থা করার অসুবিধা হবে না।

সুচরিতা বললে, দেখ আমি একলা মানুষ। বড় বাড়ির কোনো দরকার নেই। ছোট্ট বাড়ি হবে। চারপাশে খানিকটা করে জায়গা থাকবে পড়ে। চিরজীবন খেটে এলাম। অবসর নিয়েও নিষ্কর্মা বসে থাকতে পারব না। একটু বাগান করব। তাই নিয়ে সকাল সন্ধ্যা কাটবে।

—টেনিস লন চাই না?

সুচরিতা হেসে বললে, না। ওসব ভুলে গেছি।

অরুণা বললে, তুমি কিন্তু এখনও খেলতে পারবে। আমার মত মোটা তো হওনি।

সুচরিতা বললে, না না। ও আর ভালো লাগে না। একটুখানি বাগান হলেই চলবে।

প্রণব বললে, আচ্ছা, তোমার জমি আর বাড়ির জন্যে নিশ্চিন্ত থেক। ও ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বেশ ধুমধাম এবং আনন্দের সঙ্গে পার্টি শেষ হয়ে গেছে। অরুণা কিছুক্ষণ হল বিমানকে নিয়ে বেরিয়েছে, কি সব কেনাকাটি করতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার নিয়ে সুচরিতা একাই বসে ছিল, দূরে একটা পামগাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে, সেইদিকে তাকিয়ে।

প্রণব আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখছ? চাঁদ?

হেসে ঘাড় নেড়ে সুচরিতা জানালে, হ্যাঁ।

—গ্লোরিয়াস্! না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুচরিতা বললে, আসলে কলকাতায় চাঁদ

ওঠে না, জান?

—কলকাতায় চাঁদ কি করে তবে?

—কোনোমতে রাত্রিগত পাপক্ষয়। চাঁদ ওঠে কলকাতার বাইরে। এক একটা রাত্রে এমন চমৎকার চাঁদ ওঠে যে, মানুষ ঘুমুতে পারে না,—পাগল হয়ে যায়!

প্রণব গম্ভীরভাবে বললে, তার চেয়ে আমাদের কলকাতার এই চাঁদ ভদ্র। আর কিছু না পারুক, পাগল করে না। বেশ নিরীহ বোকা-বোকা চাঁদ!

সুচরিতা বললে, যে যেমন তার চাঁদও তেমনি। কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

—নিচে।

—কাজ করছিলে?

—না ভাবছিলাম। তোমার জমিটার কথা চালাচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করি। ভাবছিলাম, তোমার ছুটি হয়ে যাবে। আমার ছুটি পেতে কত দেরি!

সুচরিতা হেসে উঠল ঃ তোমার এর মধ্যে ছুটি কি? বিমান ফিরে আসুক, মাধুরীর পড়াশুনো শেষ হক, ওদের বিয়ে হক, তারপর

—তারপরেও না, সুচরিতা। ছুটি সবারই জীবনে আসে না। দেখনি, কত লোক রেকাবে পা রেখেই মরে!

—পুরুষে তেমনি মৃত্যুই তো কামনা করে।

—কখনও না। পুরুষ কি যাত্রার দলের সেনাপতি যে সকল সময়ই যুদ্ধ করবে, সকল সময়ই চেঁচাবে? তারাও অবসর চায়। অপরাহ্ন বেলায় একটু বিশ্রাম। কেউ পায়, কেউ পায় না।

—কেন পায় না?

—যারা মধ্যাহ্নকে মারে, তাদের অপরাহ্ণ বিষিয়ে ওঠে।

এতক্ষণ সুচরিতা খেয়াল করেনি। এখন ওর মুখে সে যেন মদের গন্ধ পেলে।

বললে, তার মানে কি?

—তার মানে কি তোমার জীবনের আয়নাতে কোনোদিন দেখতে পাওনি? তোমার সদুকে মনে পড়ে?

—তাঁকে তো দেখিনি কখনও।—সুচরিতা ইতস্তত করে বললে।

—তাই বটে। তুমি তাকে দেখনি। আজ আমি তাকে দেখলাম

সুচরিতা।

সুচরিতা অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

প্রণব যেন মনের ঝোঁকেই বলতে লাগল ঃ আমার মদের প্লাসে হঠাৎ তার মুখ ভেসে উঠল।

—সত্যি?—সুচরিতা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—সত্যি।—প্রণব বলতে লাগল,—অবিকল সৌদামিনী, শুধু চোখ দুটো যেন বিমানের।

হঠাৎ প্রণব বললে, আচ্ছা এমন তো হতে পারে সুচরিতা, যে মানুষ সত্যি সত্যি মরে না। তার সন্তানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

সুচরিতার বিস্ময়ের আর শেষ নেই। এ সব কী বলছে প্রণব? এ কি সুরার প্রসাদে? না, ওর মস্তিষ্ক সুস্থ নেই? অস্ফুট স্বরে কোন মতে বলল, পারেই তো।

প্রণব আরও কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গে সুচরিতার মনে পড়ে গেল প্রসন্নবাবু ও তরঙ্গিণীর কথা।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা তোমার বাবা-মা সেই যে কোন্ আশ্রমে গিয়েছিলেন, তাঁদের খবর কি?

—সে তো অনেক দিনের কথা, সুচরিতা। তাঁরা তো অনেক দিন গত হয়েছেন।

শুনে সুচরিতা দুঃখিত হল। বলল, তাই নাকি! মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—কয়েক ঘণ্টার জন্যে হয়েছিল। স্বামীজির মৃত্যুর পর বাবাই আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি যখন আশ্রমে গিয়ে পৌঁছুলাম তখন মায়ের জীবনের সামান্যই আর বাকি। বাবা আশ্রমে নেই, মাধুকরীতে বেরিয়েছেন। আশ্রমের লোকদের জিগ্যেস করলাম, চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? তাঁরা বললেন, ঠাকুরের পাদোদক। আশ্রমে নাকি ঠাকুরই একমাত্র চিকিৎসক এবং পাদোদকই তাঁর একমাত্র ওষুধ।

—ঠাকুর কে?

—শ্রীভগবান স্বয়ং। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্তি।

—আর বাবা?

—তাঁর সঙ্গে মৃত্যুকালে আমার দেখা হয়নি। একেবারে মৃত্যুর খবরই এল টেলিগ্রামে।

প্রণব চুপ করলে। তারপর বললে, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহও নাকি শেষ বয়সে পায়ে হেঁটে বৃন্দাবনে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আমারও মাঝে মাঝে সংসার ত্যাগের বাসনা হয়। এটা বোধ হয় আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে।

সুচরিতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার পরে?

—তার পরে আর কি? মক্কেলরা টাই চেপে ধরে আটকে রাখে। যেতে দেয় না।

প্রণব হাসতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার কখনও ও রকম ইচ্ছা হয় না?

সুচরিতা গম্ভীরভাবে বলল, তোমার কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে হয় বই কি।

প্রণব এবং অরুণা যেদিন বিমানকে জাহাজে তুলে দেবার জন্যে বম্বে যাত্রা করল, সুচরিতাও সেই দিনই বহরমপুরে ফিরে এল।। সুচরিতাকেও ওরা বম্বে নিয়ে যাবার জন্যে জেদ করেছিল। ওর নিতান্ত অনিচ্ছাও ছিল না। কিন্তু তাহলে কাজে যোগ দেবার দিনে ফিরতে পারবে না বলে যায়নি।

বিমানকে জাহাজে তুলে দিয়েই ওরা বম্বে থেকে সুচরিতাকে তারে সেকথা জানিয়েছিল।

প্রণব ফিরে এসে সুচরিতার জন্যে জমি কেনা এবং তার পরে বাড়ি তৈরি করায় মন দিলে। বাড়ির যে নকশা সে পাঠাল তা সুচরিতার খুব পছন্দ হয়েছে।

বাড়ি তৈরি আরম্ভ হতে প্রণব এবং অরুণা তাকে কয়েকখানিই চিঠি দিলে নিজের চোখে একবার দেখে যাবার জন্যে। দূরের পথ তো নয়। সুচরিতা শনিবার অফিসের পর বেরিয়ে সোমবার সকালে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু সুচরিতার কেমন স্বভাব, সে ইঁটকাঠের কাঠামোটা একেবারেই সইতে পারে না। লিখলে, বাড়ি সম্পূর্ণ না হলে ও কিছুতেই যাবে না।

ইতিমধ্যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে মধ্যপথেই সমস্ত বন্ধ হয়ে রইল। অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অরুণা মারা গেল।

খবরটা সে পেলে কয়েকদিন পরে। প্রণবের চিঠিতে নয়, বরদার চিঠিতে। দুপুরে হঠাৎ অরুণা মারা যায়। তখন তার কাছে প্রণব কিংবা মাধুরী, কেউই ছিল না। প্রণব হাইকোর্টে, মাধুরী স্কুলে। শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার বুকের ভিতরটা কি রকম করে ওঠে এবং খানসামা বেয়ারারা কিছু বোঝবার আগেই দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। ডাক্তার ডাকারও অবকাশ পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে প্রণব এবং মাধুরী যখন ছুটে এল, তখন সব শেষ।

চিঠি পেয়ে সুচরিতা স্তম্ভিতের মত বসে রইল।

অরুণাকে প্রণব যে কত ভালবাসত সুচরিতা জানে। সুতরাং এই নিদারুণ আঘাত যে কি করে প্রণব সহ্য করবে, তা সে ভেবেই পেলে না। এবং সেই চিন্তা সমস্তক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রইল।

আশ্চর্য এই মানুষটির ভাগ্য! বাপ-মায়ের একটিমাত্র সন্তান। দুজনের কাছ থেকেই অপর্যাপ্ত স্নেহ এবং আদর পেয়ে এসেছে। স্নেহ ছাড়া ও একটি দিন বাঁচতে পারে না। অরুণা চলে যাওয়ার পরে কি করে বাঁচবে ও? কাছে বিমান পর্যন্ত নেই। মাধুরী ছোট মেয়ে। সে বাবাকে সান্ত্বনা দেবে কি, তার নিজেরই সান্ত্বনার প্রয়োজন।

প্রণবের শুধু তো জীবন নয়, জীবনযাত্রার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল অরুণা। সেই জীবনযাত্রাকে সে রূপ দিয়েছিল। নিজের হাতে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছিল। এখন ও আশ্রয় করবে কাকে?

আশ্চর্য প্রণবের ভাগ্য! সৌদামিনী এল, চলে গেল। অরুণার হাতে প্রণবকে দিয়ে তরঙ্গিণীও একদিন সরে গেলেন। এখন সেই অরুণাও গেল চলে। ওর স্নেহপ্রবণ হৃদয় যখন যে ডালকে আশ্রয় করেছে, সেইটেই গেছে ভেঙে।

...

এমন দেখা যায় না।

সুচরিতা প্রথমে ভাবল, সান্ত্বনা দিয়ে একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু বুঝল তার কোনও অর্থ হয় না। কি নতুন সান্ত্বনা দেবে সে? কোন্ কথা তার অজ্ঞাত? ভাষার প্রলেপে শোকের কোন্ ক্ষত কবে শুকিয়েছে?

তার চেয়ে এই সময় একবার যেতে পারলে ভাল হয়,—সান্ত্বনা দিতে নয়, তার শোকের অংশ নিতে। প্রণবের কাছে এই দুর্দিনে যদি সত্য সত্যই কিছুর প্রয়োজন থাকে, তা সান্ত্বনার নয়, তার শোকের অংশ গ্রহণের।

দরখাস্ত করে ছুটি নেওয়ার সময় এখন নেই। সুচরিতা স্থির করল, সামনের শনিবার অফিসের পর সে বেরিয়ে যাবে। খবর দেবার কোনও

প্রয়োজন নেই। পরের সোমবারটা কিসের একটা ছুটি আছে। সে রবি, সোম দুটো দিন থেকে মঙ্গলবার সকালে ফিরে আসবে। অরুণার জন্যে তার নিজের মনটাও অস্থির হয়ে আছে। কাজে মন বসছে না।

বিকেলে সুচরিতা কলকাতায় পেঁছুল।

বরদার বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে স্নান সেরে তখনই সে প্রণবের বাড়ি এল। বরদা সকাল-সকাল কোর্ট থেকে ফিরেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। পথে প্রণব সম্বন্ধে কত কথাই সুচরিতা ভাবতে ভাবতে চলল। কি করছে সে, কেমন দেখবে তাকে? কি তাকে বলা যায়? সান্ত্বনার কোনও কথাই সুচরিতার মুখে আসে না যে!

কিন্তু বাড়ি ঢুকে সে অবাক্ হয়ে গেল। প্রণব বরদার সঙ্গে টেনিস খেলছে।

সুচরিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা তন্ময় হয়ে খেলছে। ওর দিকে চাইবার সময়ও কারও নেই।

একটা ফাঁকে ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বরদা এবং প্রণব উভয়েই চিৎকার করে উঠল: কখন এলে?

সুচরিতা সাড়া দিলে না। শুধু একটু হাসল। এমনটি সে প্রত্যাশা করেনি। ঝগড়ু একটা বেতের চেয়ার এনে দিলে।

খেলার শেষে ওরা দুজনেই এসে বসল।

প্রণব বলল, তোমার বাড়িটা নিয়ে এইবার লাগব সুচরিতা। নানা কারণে অনেক দেরি হয়ে গেল। চল, যাবে দেখতে? কাছেই তো।

বরদা বলল, চমৎকার হচ্ছে রে তোর বাড়িটা। প্রণবের রুচি আছে।

প্রণব খুশি হয়ে উঠল। বলল, তবু তো এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এর পরে যখন রাস্তা হবে, বাগান হবে, তখন যেতে যেতে লোকে একবার দাঁড়িয়ে দেখে যাবে। যাবে দেখতে?

সুচরিতা বললে, না। প্রতিমায় খড়ের উপর মাটি দেওয়া, আর ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকি দিয়ে বাড়ি তৈরি, বলেছি তো, ও আমি একেবারে সইতে পারি না। বাড়ি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন যাব।

—বেশ তাই যেও।—প্রণব বললে।

তারপর জিজ্ঞাসা করল, সুচরিতা, তোমার ছুটি কদিন?

—সোমবার রাত্রের ট্রেনে যাব।

—তোমার অবসর নেওয়ার দেরি কত?

—এখনও বছর দেড়েক আছে। অবশ্য, আরও কিছু দিন মেয়াদ বাড়ান যায়, কিন্তু ইচ্ছে করে না। ভাবছি, মাস ছয়েক পরেই এক বছরের ছুটি নোব। ছুটিটা পাওনা আছে। তারপরে দিন কয়েকের জন্যে কাজে যোগ দিয়েই অবসর নোব। আর পারছি না।

এতক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রণব কথা বলছিল। অরুণার প্রসঙ্গ ওঠেইনি। এখন সুচরিতার শেষ কথায় প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস যেন প্রণবের অন্তরের একেবারে অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল।

বললে, আমিও আর পারছি না সু।

সুচরিতা ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। কিন্তু আশ্বস্তও হল। এই প্রণবকেই খুঁজছিল সে।

বললে, তোমার কথা ভেবে কোনো দিশা পাই না।

প্রণব বললে, আমিও না। সেজন্যে ভাবিও না আর। সুচরিতা, কবির কাব্যে পুরুষকে সহকার তরু আর নারীকে মাধবীলতার সঙ্গে তুলনা করেছে। সেই কথাই জেনে এসেছ। আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক উল্টো। সংসারযাত্রায় পুরুষই মাধবীলতা, মেয়েরা মাচা।

প্রণব কি ভেবে হাসল। বললে, তোমরা আমাদের কত যত্ন করে মাচায় তুলে বাড়িয়ে তোল, বাঁচিয়ে রাখ। তারপরে কোনো নোটিশ না দিয়েই হঠাৎ একদিন সরে যাও। আমরা তখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাই।

প্রণব চুপ করল। বললে, আজ আমি কত অসহায়! কোথাও যেন, কিছুতে যেন জোর পাচ্ছি না।

আবার একটা সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললে, তবু কবির উপমার মতো বাকি জীবন সহকারের ভূমিকাই অভিনয় করে যেতে হবে!

সুচরিতা একটা কথাও বলতে পারল না।

বরদা বললে, তা কেন হবে মুক? বাইরের ঝড়-ঝাপটা আমরাই তো সহ্য করি। মেয়েরা আমাদের ওপর নির্ভর করেই চলে।

প্রণব বলল, হ্যাঁ। বাইরের ঝড়-ঝাপটা সম্বন্ধে তাই বটে। কিন্তু ঝড়-ঝাপটা তো শুধু বাইরেই নেই, ভিতরেও আছে। সেটা সামলায় ওরা। সে ঝড়ও যে কত প্রচণ্ড, তোমার কোনো ধারণা নেই বরদা। শুধু তাই নয়, আমরা ওদেরই হাতের সৃষ্টি, জান?

—কি রকম?—বরদা জিজ্ঞাসা করল।

প্রণব বলতে লাগলঃ পৃথিবীতে প্রথম যখন এলাম, মা আমাদের এক রকম করে সৃষ্টি করতে লাগলেন। সেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবার আগেই এল বধূ। তার হাতে আবার আমরা নতুন করে সৃষ্ট হতে আরম্ভ করলাম। আমাদের জীবনের সঙ্গে ওরা জড়িয়ে দিতে লাগল নতুন অভ্যাস, নতুন অভাববোধ। সেও এক রকমের আফিম। তারপরে ওদের ছাড়া এক মুহূর্তও আমাদের চলে না। আমাদের জীবনযাত্রায় ওরা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সে এক আশ্চর্য কৌশল বরদা। কদিনের জন্যে বাইরে কোথাও যাও। গেলেই টের পাবে।

প্রণব হাসল। বললে, তোমাকে বলি শোন, প্র্যাকটিস আমি ছেড়ে দোব স্থির করেছি বরদা।

বরদা চমকে উঠলঃ সে কি! এমন ভালো প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবে?

—হ্যাঁ। ওতে আর আমার রুচি নেই। ও আর আমি পারব না। যে কটা মামলা হাতে নিয়েছি, সেগুলো করতেই হবে। ইতিমধ্যে সুচরিতা অবসর নিয়ে এলেই আমিও অবসর নেব। আর পারছি না।

এমন সময় ঝগড়ু চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে দিয়ে গেল। সুচরিতা নিঃশব্দে ওদের চা তৈরি করতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

চা খাওয়ার পরে বরদা উঠল। সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা করল, তুই এখন যাবি না সুচরিতা?

—হ্যাঁ যাব, চল।

সুচরিতা উঠে দাঁড়াল। একবার যেন কি একটা বলবার জন্যে প্রণবের দিকে চাইল। তারপরে কিছুই না বলে বরদার আগে আগে চলতে লাগল।

পরদিন সকালে।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। বরদা নিচে তার অফিস-ঘরে চলে গেছে। কিন্তু সুচরিতা তখনও চায়ের টেবিলে বসেই তার বৌদির সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় প্রণবের কাছ থেকে ফোন এলঃ

—তুমি কি ব্যস্ত আছ সুচরিতা?

—না। এখানে আর ব্যস্ততা কি?

—তাহলে আসবে একবার? এস না?

—এখনই?

—হ্যাঁ।

—বেশ তো। যাচ্ছি।

—গাড়ি পাঠিয়ে দিই তাহলে?

—দাও।

সুচরিতা গিয়ে যখন পৌঁছুল, বেয়ারা ওকে নিয়ে গেল একেবারে শোবার-ঘরে। গিয়ে দেখে অরুণার কাপড়-জামার আলমারিটা খুলে প্রণব স্থাণুর মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোর্টে যাবে না?

—না। মামলা যেদিন থাকে না, সেদিন আর কোর্টে যাই না। কিন্তু কি মুস্কিলে পড়েছি বল তো, মাধুরী স্কুলে যাবে, কিন্তু তার জামা-কাপড় খুঁজে পাচ্ছি না।

আলমারির ভিতরে চেয়ে সুচরিতা বলল, এটা তো অরুণাদির জামা-কাপড়ের আলমারি। অন্য কোথাও আছে বোধ করি।

—অন্য কোথায় থাকতে পারে বল তো?

—মাধুরী জানে না?

—না। সে সকালে মাস্টারের কাছে পড়ে, দুপুরে স্কুলে যায় সন্ধ্যায় আবার মাস্টারের কাছে পড়ে।

—চল দেখিগে।

অন্য ঘরে, অন্য একটা আলমারি থেকে সুচরিতা মাধুরীর জামা-কাপড় বের করে দিল। মাধুরীকে ডেকে দেখিয়ে দিল আলমারিটা। বললে, আর এই আলমারি দুটোয় তোমার বাবার জামা-কাপড় থাকে। এখন থেকে শুধু তোমার নিজেরটা নয়, ওঁরটারও ভার তোমার ওপর রইল। তোমাদের ধোপা কি বারে আসে?

মাধুরী প্রথমে বললে, জানি না।

তারপরে বললে, বোধ হয় রবিবারে।

সুচরিতা ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে, কোলের কাছে টেনে, আদর করে বললে, এখন থেকে তোমার মায়ের সব কাজের ভার তোমাকেই নিতে হবে মাধু। তুমিও যদি ভেঙে পড় মা, তোমার বাবাকে কে দেখবে? তিনি বাঁচবেন কি করে? দেখবে তো?

মায়ের প্রসঙ্গে মাধুরীর চোখ ছলছল করে উঠল। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল। কোনোমতে ঘাড় নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

সুচরিতা আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে তো?

—হ্যাঁ।

—দাদার মতো ফার্স্ট হতে পারবে তো?

—ওরে বাবা!

সুচরিতা আশ্বাস দিয়ে বললে, কেন পারবে না? খুব পারবে। মন দিয়ে পড়, তাহলেই পারবে।

মাধুরীকে ছেড়ে দিয়ে সুচরিতা প্রণবের ঘরে গেল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে প্রণব দূরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল। সুচরিতা তার কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসল।

সুচরিতা বললে, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তোমার মাধুরী খুব ভাল মেয়ে। মা এতদিন ভাবতে দেয়নি, ভাবেনি। এখন থেকে তোমার এবং ওর নিজের সমস্ত কাজই ও করবে।

প্রণব চুপ করে রইল।

সুচরিতা বুঝল, প্রণবের মনটা খুব নিশ্চিন্ত হল না। বললে, তারপরে আর কটা মাস! আমি এসে পড়লে আর তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না।

—কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি আসবে তো?

ওর ভয় দেখে সুচরিতার হাসি পেল। বললে, আসব গো আসব। ভয় পেও না। দেখো, ঠিক আসব।

প্রণব কি রকম শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল। বললে, কি জানি। আমার সবেতেই কেমন যেন ভয় করে।

আপন মনে নিঃশব্দে প্রণব কি যেন ভাবতে লাগল। হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ রাত্রেই ফিরবে বলছিলে না?

—হ্যাঁ।

—গাড়ি ক'টায়?

—নটায়।

অরুণা থাকলে এবারও তোমাকে ও-বাড়িতে উঠতে দিত না কিছুতে। যাই হোক, আমি ঠিক সময়ে গাড়ি নিয়ে যাব, তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করল, বিমানকে খবরটা জানান হয়েছে?

—না। সকলে নিষেধ করছে। ও এখন সামনের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। এর ওপরে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সবাই বলল,

পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপরে জানালেই চলবে।

সুচরিতাও সায় দিলে। বললে, সে মন্দ নয়।

প্রণব বললে, আমিও বলি মন্দ নয়। কিন্তু সে কি জানতে পারবে না ভেবেছে? তার মন ডাকবে না? যখন সবাই চিঠি দেবে, শুধু তার মা দেবে না, তখন প্রশ্ন জাগবে না তার মনে?

সুচরিতা তার উত্তর দিতে পারল না।

প্রণব বললে, অনেক বড় বয়স পর্যন্ত বিমান জানতই না যে, অরুণা তার নিজের মা নয়। নিজের মাকে সে দেখেইনি। একেই নিজের মা ভাবত। বড় বয়স পর্যন্ত তার মায়ের কাছেই খাওয়া, মায়ের কাছেই শোওয়া। ও বিলেত যাবে, অরুণা ভেবেই অস্থির, মাকে ছেড়ে বিমান থাকবে কি করে! অথচ নিতান্ত শিশুকালটা বিমানের বাইরেই কেটেছে স্কুলের মেমসাহেবদের কাছে। সেও অরুণারই ব্যবস্থা। কিন্তু যেটুকু চরিত্রের পরিবর্তন বিমানের হয়েছিল, পরে অরুণা নিজেই আবার তা চুনকাম করে দিয়েছিল।

সুচরিতা বললে, অনেক তো দেখলাম। বাঙালীর ছেলে সাহেব হয় না। গোড়ায় গোড়ায় সাহেব হবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোটাকতক কদভ্যাস ছাড়া আর কিছুই রাখতে পারে না।

—সত্যি। প্রত্যেক জাত পৃথক ধাতুতে গড়া। তুমি উঠছ সুচরিতা?

—উঠি। বেলা হল।

—আচ্ছা। ঠিক সাড়ে আটটায় গাড়ি নিয়ে হাজির হব।

সুচরিতা উঠল।

মাস আষ্টেক পরে সুচরিতার বাড়ি তৈরি হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সেই সময়ে উপর থেকে তার ঢাকায় বদলীর হুকুম এল। হুকুমটা প্রায় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত। সে এক রকম করে নিজের মনকে তৈরি করেছিল এবং সেই অনুযায়ী একটা কর্মসূচীও তৈরি করছিল। এমন সময় এই আদেশ!

সরকারী নিয়ম-কানুনে এই আদেশ অমান্য করবার ফাঁকির অভাব হয়তো ছিল না। কিন্তু তার অসুবিধা ছিল এই যে, এর সঙ্গে একটা প্রোমোশনও গাঁথা ছিল,—তার প্রাক্-অবসর শেষ প্রোমোশন। চাকুরির

নৌকা প্রায় ঘাটে আসার মুখে সেটা হারাতে তার মন চাইছিল না।

ঢাকা যাওয়ার পথে এই কথাটা প্রণবকে বুঝিয়ে সে ঢাকা চলে গেল। কলকাতায় নিশ্চিন্তভাবে ফিরতে তার মাস-ছয়েকের বেশি দেরি হবে না।

প্রণব হাসল। বললে, বুঝলাম। এই কুটোগাছটার উপর নির্ভর করে এখনও ছ' মাস আমাকে ভাসতে হবে!

সুচরিতা দুঃখ পেল। বললে, উপায় কি বল? না গেলে যদি চলত, বিশ্বাস কর, আমি কখনই যেতাম না। আমার মন এখানেই পড়ে রইল।

প্রণবও বোঝে তা। সুতরাং আর কিছু বললে না। বললে, বিমান কেব্‌ল্‌ করেছে, পরীক্ষা সে ভালই দিয়েছে। ফল বেরুতেও দেরি নেই।

সুচরিতা বললে, ভাল খবর এলে তখনই আমাকে জানাবে। অরুণার কথা লেখে না?

—লেখে না! সে সন্দেহ করেছে, অরুণার খুব অসুখ হয়তো। সে যে নেই, একথা এখনও ভাবেনি। এসে শুনবে।

—তার ফেরারও তো দেরি নেই?

—এই পরীক্ষায় যদি সফল হয়, তাহলে বেশি দেরি নেই। নইলে ব্যারিস্টারী পাশ করেই ফিরবে। তাতে দেরি হবে।

—ভগবান করুন যেন সফলই হয়।

তারপরে সুচরিতা মাধুরীকে বললে, প্রণবের দিকে দৃষ্টি রাখতে। শেষে ঝগড়ুকে।

বললে, ঝগড়ু, সাহেব যেখানে যখন গেছেন, তুমিই সঙ্গে গেছ। তোমার মত করে সাহেবকে কেউ চেনে না। সাহেবের ভার তোমার মা-ও তোমার ওপরই দিয়ে গেছেন, আমিও তাই দিয়ে গেলাম। মাধুরী ছেলেমানুষ, তাতে পড়ায় ব্যস্ত। তুমি সমস্ত কাজের মধ্যেও একটি চোখ আর একটি কান ওঁর দিকে রাখবে।

অরুণার প্রসঙ্গে ঝগড়ু হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

গাড়িতে উঠবার সময় সুচরিতা প্রণবকে বললে, আমার বাড়িটার জন্যে একটা চাকর আর একটা মালী এখনই দরকার হবে বোধ হয়।

—হ্যাঁ, দরকার হবে।

—তাহলে দুজন লোক এখনই ঠিক করবে। তাদের কি মাইনে লাগবে জানিও, আমি মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব। আর বাগানটা

সুচরিতা হাসলে।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, বাগানটার কি বলছিলে বল।

—এখন অন্তত ছ'মাস সময় পেলে তুমি। ফিরে এসে যেন দেখি বাগানটা অনেকখানি তৈরি হয়েছে।

—চেষ্টা করব সুচরিতা।

—আমি কি কি ফুল ভালোবাসি মনে আছে তো? আমাদের ও-বাড়ির বাগানটা আমারই তৈরি।

প্রণব বললে, তার জন্যে তো ছ'মাস সময়ই দিলে সুচরিতা। এই ছ'মাস সেই কথা মনে করবারই চেষ্টা করব।

—দেখি কেমন মনে করতে পার কি না। না পারলে আমাদের বুড়ো মালীকে জিগ্যেস ক'র। সে হয়তো বলতে পারবে।

এবারে প্রণব হাসলে। বললে, বুড়ো মালীর সাধ্য কি সুচরিতা! পারলে আমিই পারব। না পারলে, তোমাকেই এসে করতে হবে। এর মধ্যে আর বুড়ো মালীর কোনো জায়গা নেই। ওই তোমার গাড়ির ঘণ্টা পড়ল। যতো শীঘ্র পার, ফিরে আসার চেষ্টা করবে।

ঢাকা মেল চলতে আরম্ভ করল।

ঢাকা গিয়ে সুচরিতার কিছুতে কাজে মন বসে না। অফিসের মামুলী কাজ অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয়। তার চেয়ে বরং ভালো লাগে মফস্বলে ঘুরতে। ভালো লাগে সবুজ ক্ষেত, জল-থৈ-থৈ বিল, বিলে শাপলা-ফুলের সমারোহ। মন খানিকটা ভুলে থাকে, বালিহাঁসের সঙ্গে সঙ্গে অবারিত আকাশে মেঘের পিছু পিছু ঘুরতে পারে।

ঢাকায় ফিরে এলে আবার যেন খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে প্রথমে খবর এল মাধুরীর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়েদের একটা স্কলারশিপ পেলেও পেতে পারে। কলেজে ভর্তি হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

সুচরিতা প্রণবকে লিখলে, মাধুরী পড়তে চায় পড়ুক। কিন্তু এখন থেকেই ওর বিয়ের চেষ্টাও যেন চলে। ভালো পাত্র পেলে যেন হাতছাড়া না করে।

প্রণব জবাব দিলে, সে কি সহজ কাজ! ও-সব মেয়েরাই পারে। সুতরাং সুচরিতা ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই হবে না।

সুচরিতা হাসলে মনে মনে। প্রণব তার সংসারের সঙ্গে সুচরিতাকে

জড়াতে চায়! কিন্তু সমস্ত জীবন যে সংসার এবং সমাজের বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং এখনও বেড়াচ্ছে, তাকে সংসারে জড়াবার চেষ্টা নিতান্তই দুশ্চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর কিছুকাল পরে খবর এল বিমানের সাফল্যের। এখন সে কিছুদিন শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা নেবে। তারপর জানা যাবে কোন্‌খানে তাকে চাকুরি করতে হবে।

এটা সত্যই একটা সুখবর। বিমান ভালো ছেলে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে এদেশের এবং বিলেতের যত ভালো ছেলের সঙ্গেই। সুতরাং ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা একটা ছিলই। সুচরিতা তৎক্ষণাৎ আনন্দজ্ঞাপন করে তার করে দিলে। বিমানের পরবর্তী খবর জানবার জন্যেও যে সে উৎসুক হয়ে রইল, তাও টেলিগ্রামে জানিয়ে দিলে।

আরও কয়েক মাস পরে খবর এল, বিমান বিলেত থেকে জাহাজে যাত্রা করেছে। সঙ্গে নবপরিণীতা ইংরেজ-দুহিতা। সে বিহার-উড়িষ্যা চাকুরিতে গেছে এবং তার প্রথম চাকুরিস্থল মজঃফরপুর।

সুচরিতা বাঙালী মেয়ে। সুতরাং বাংলাদেশে এত উপযুক্ত মেয়ে থাকতে বিমানের মতো একটি সুপাত্র যে ইংরেজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করলে, এটা তার খুব ভালো লাগল না। তবু যখন বিবাহ হয়েই গেছে. তখন কি আর করা যায়! সে এর জন্যেও আনন্দ জানালে।

এর পরের খবর, বিমান কলকাতায় কয়েকদিন থেকে মজঃফরপুর চলে গেছে এলেনকে নিয়ে। চমৎকার মেয়ে এই এলেন! প্রণব তার ব্যবহারে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় এবং কর্মিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে গেছে।

এরও পরের খবর হচ্ছে. মাধুরীর বিবাহ। মাধুরীর মাসিমার জয় হোক, তিনি একটি সুপাত্র সংগ্রহ করেছেন। ছেলেটি বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এসে টাটায় একটি ভালো চাকুরি করছে। মাধুরীর মাসিমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে নিকট আত্মীয়। কী যেন একটা উপলক্ষ্যে কলকাতা এসেছিল। মাসি সেইসূত্রে একদিকে ছেলে, ছেলের বাপ-মা এবং অন্যদিকে মেয়ে, মেয়ের বাপকে নিমন্ত্রণ করে দুই পারের মধ্যে সেতুবন্ধন করে দিয়েছেন এবং স্বয়ং ও-পক্ষের সম্মতি-সংগ্রহের ভার নিয়ে নিয়েছেন। ভাবী বৈবাহিক ও বৈবাহিকার সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছে তাতে প্রণবের মনে হয়, সম্মতি-সংগ্রহ কঠিন হবে না। কারণ মাসির কাছে যতদূর জানা গেল, ছেলেটির নাকি মাধুরীকে খুবই পছন্দ হয়েছে। সেরকম ক্ষেত্রে

অগ্রহায়ণের প্রথম দিকেই দুই হাত এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

উপসংহারে প্রণব জানতে চেয়েছে, যদি তাই হয় তাহলে সুচরিতার তৎপূর্বেই আসা একান্ত প্রয়োজন। নইলে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করবে কে? প্রণব এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ, এলেন হিন্দু-বিবাহের কিছুই জানে না এবং বিমান ছেলেমানুষ।

চিঠি পেয়ে সুচরিতা খুব একচোট হাসলে। বাংলাতে লিখলে ঃ

"সংবাদে শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু তুমি দুই দুই বার বিবাহ করিয়াও যদি বিবাহের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাক, আমি একবারও বিবাহ না করিয়া সে-সম্পর্কে পরিপক্ক হইয়াছি, এ কথা তোমার মস্তিষ্কে কিরূপে আসিল? শুনিয়াছি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এইপ্রকার অসম্ভব এবং উদ্ভট বিশ্বাস মাঝে মাঝে আসে। তুমিও কি প্রতিভাশালী হইবার চেষ্টা করিতেছ?

"যাহা হউক, আমি এইমাত্র প্রাক্-অবসর ছুটির দরখাস্ত করিলাম। দরখাস্তের অদৃষ্টে কী আছে জানি না। যদি ছুটি পাই, অবশ্যই যাইব। না পাইলে তুমি যেন বুদ্ধি করিয়া বিবাহ পিছাইয়া দিবার চেষ্টা করিও না। ঐ মাসিকে আনাইয়াও নির্দিষ্ট দিনে শুভকার্য সুসম্পন্ন করিও। আমি বড় ভয়ে-ভয়ে রহিলাম।"

সুচরিতার ভয় নিতান্ত অমূলক নয়। যখন তার বাঁধা-ছাঁদা প্রায় তৈরি, তখন তার দরখাস্তের উত্তর এল, এ সময়ে তাকে ছুটি দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এবং সেই খবর শুনেই নিজের একান্ত অক্ষমতা স্মরণ করে প্রণব এ-বিয়েতে দাঁড়াতে অস্বীকার করে বসল। কিন্তু বরদা তাতে প্রবল বাধা দিলে এবং মাসি ও তাঁর পুত্রকন্যাদের আগে থেকেই নিয়ে এসে একপ্রকার জোর করেই নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ সুসম্পন্ন করলে।

সুচরিতা এই বিবাহে জামাইকে একটি হীরার আংটি এবং মাধুরীকে একটা হীরা ও পান্না-বসানো ব্রেসলেট উপহার দিলে।

কিন্তু প্রণব রেগে তার প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করলে না।

জানুয়ারির গোড়ায় কর্তৃপক্ষ জানালেন, পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে সুচরিতাকে দেড় বৎসরের ছুটি দেওয়া হল। খবরটা তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করে সুচরিতা বরদা আর প্রণবকে জানালে।

বরদার জবাব এল, কিন্তু প্রণব নিঃশব্দ।

সুচরিতা বরদাকে চিঠি লিখলে, প্রণব কি কলকাতায় নেই? সে টেলিগ্রামের জবাব দিলেনা কেন?

বরদা জানালে কলকাতায় থাকবে না কেন? সুচরিতার উপর থেকে তার রাগ এখনও যায় নি, তাই জবাব দেয় নি।

সুচরিতা তখন প্রণবকে লিখলে, "তোমার কাছে বাড়ির চাবি বলিয়া ভয় পাইতেছি না। দাদার বাড়ি আছে, না-হয় তোমার বাড়ির গেটে গিয়াও মোট-পোঁটলা লইয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু তুমি রাগ করিলে কলিকাতা তাহার সহস্র বিজলী-বাতি লইয়াও আমার কাছে অন্ধকার। তোমার রাগ যদি নিতান্তই না পড়িতে চায়, তাহা হইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিও। আমি বরং কাশী চলিয়া যাইব। এ বয়সে সেখানে যাওয়াই তো উচিত।"

প্রণবের রাগ অনেকটা এই চিঠি পাওয়ার পর গেল বটে, কিন্তু ঝাঁঝ গেল না। উত্তরে সে লিখলে, "তোমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিব না, তুমি সত্যই আসিতেছ,—এত কষ্ট তুমি আমাকে দিয়াছ। কাশী যাইবার ভয় দেখাইয়াছ, কিন্তু তুমি কী দুঃখে কাশী যাইবে? বলি নাই, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ পদব্রজে বৃন্দাবন গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমার পিতামাতার কথা তো জানই। সন্দেহ হইতেছে, তোমার উৎপাতে আমাকেই না শেষ পর্যন্ত কাশী গিয়া সন্ন্যাস লইতে হয়!"

সুচরিতা হাসলে। লিখলে, "তোমাকে দোষ দিব কি, শিয়ালদহ না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিব না যে, সত্যই কলিকাতা আসিলাম। তবে ছুটি পাইয়াছি, তাহাতে আর ভুল নাই। এখন যদি ট্রেন-স্টিমার বন্ধ হইয়াও যায়, ভাসিতে-ভাসিতে গড়াইতে-গড়াইতেও তোমার পায়ের কাছে গিয়া ঠেকিব, ইহাই মনকে বুঝাইতেছি। একত্রিশে জানুয়ারি ঢাকা হইতে আমি বাহির হইবই। আমি তোমাকে ঢাকা হইতে একটি এবং গোয়ালন্দ হইতে আর একটি টেলিগ্রাম করিব। এত কষ্টের ছুটি, একটু সমারোহ না হইলে মানাইবে কেন?"

এ বিষয়ে প্রণব সুচরিতার সঙ্গে একমত। এত কষ্টের ছুটি এবং এত প্রত্যাশার আসা, সুতরাং সমারোহ করা দরকার বইকি!

পয়লা ফেব্রুয়ারীর আর যখন মাত্র দশটা দিন দেরি, প্রণব বরদার স্ত্রীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। বললে, সুচরিতার বাড়ির জন্যে খাট-পালঙ্ক, আসবাব-পত্র, একপ্রস্থ বিলিতী এবং একপ্রস্থ দিশী বাসনপত্র

—সমস্ত কিনেছি। এখন চাল. ডাল, নুন, তেল, ঘি, ময়দা, মশলাপাতির একটা ফর্দ করে দিন তো। কিনে রেখে দোব। মায় কয়লা পর্যন্ত। ঠাকুরও একটা ঠিক করেছি। এসেই যেন ও দেখে, ওর বাড়ি ওকে অভ্যর্থনা করার জন্যে সর্বরকমে প্রস্তুত।

বরদার স্ত্রী হেসেই অস্থির!

বরদা বললে, ওহে, যে-সে দিনে ও-বাড়িতে ওঠা হবে না। গৃহপ্রবেশের দিন দেখে তবে যাবে।

প্রণব সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কী!

—হ্যাঁ। গুরুদেবকে বলেছি, তিনি একটা ভালো দিন দেখে দেবেন।

প্রণব তো অবাক্।

—গুরুদেব! গুরুদেব কি? তোমার আবার গুরুদেব আছেন নাকি?

—আছেন বইকি! ষাট বচ্ছর বয়স হল, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

—সর্বনাশ! —বরদার স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করলে,—আপনিও মন্ত্র নিয়েছেন নাকি?

বরদার স্ত্রী হেসে সায় দিলে।

বরদা বললে, সুতরাং তাড়াতাড়ি করে এখনই ও-বাড়িতে তুলো না। সুচরিতা ঢাকা থেকে এখানেই এসে উঠবে। তারপর কাছাকাছি একটা ভালো দিন দেখে, যাগ-যজ্ঞ করে ও-বাড়িতে সে যাবে। সুচরিতাকেও সে-কথা আমি লিখে দিয়েছি।

—যাগ-যজ্ঞ! —প্রণব যেন আকাশ থেকে পড়ল,—ওসব তুমি বিশ্বাস কর নাকি?

—করি বইকি!—বরদা বললে।

—হায়, হায়! আমিই শুধু পরলোকের পাথেয় সংগ্রহে পিছিয়ে রইলাম!—কৃত্রিম দুঃখে প্রণব কপালে করাঘাত করলে।

বরদার স্ত্রী বললে, আপনার এখনও দেরি আছে মুখার্জি সাহেব।

—কেন? আমার বয়স কি ষাট হয়নি?

—যে রকম যৌবনসুলভ উদ্যম-উৎসাহ দেখছি, মনে তো হয় না। বরদার স্ত্রী পরিহাস করে জবাব দিলে।

—তা বলতে পারেন।

প্রণব চলে গেল। কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িতে বিমান নেই; মাধুরীও শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বেয়ারা-খানসামার সংসার। বাইরেই বা কে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কী যেন তার হয়েছে!

৩১শে জানুয়ারি, সকালবেলা।

বাঁধা-ছাঁদা করার আর কিছুই বাকি নেই। এ কদিন শুধু বাঁধা-ছাঁদাই সুচরিতা করলে। যেগুলো মালগাড়িতে যাবার, তা আগেই চলে গেছে। যেগুলো তার সঙ্গে যাবে, সেইগুলোই রয়েছে শুধু। বাকি ছিল শুধু বিছানা, কাল রাত্রেও যাতে শুতে হয়েছে। চাকরটা এসে জানালে, তা-ও হোল্ডঅলে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে সে ভিতরের দিকের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। এমন সময় পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে দেখে মূর্তিমান প্রণবকৃষ্ণ!

—হ্যাল্লো!

বলেই প্রণব সুচরিতাকে জাপটে ধরলে। চাকরগুলো পর্যন্ত অবাক্।

সুচরিতা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। তার বিস্ময়ের আর শেষ নেই। বললে, তুমি! কী ব্যাপার! মামলা নাকি?

প্রণব ধপ করে বসল। বললে, হায় ভগবান! ব্যারিস্টার পি, কে, মুখার্জি কবে প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছে। তবু তাকে দেখলে বন্ধুজনেরও মামলা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না!

সুচরিতা হেসে বললে, তাহলে হঠাৎ আবির্ভাব কেন?

প্রণব বললে, তোমাকে নিতে। বিশ্বাস করতে পারছ না, না? কিন্তু সত্যিই তাই। সকালে হঠাৎ মনে হল, তুমি তো সাক্ষাৎ বিঘ্নেশ্বরী। বেরুবার মুখে আবার যদি কোনো বিঘ্ন হয়, তাহলে পাগল হয়ে যাব। তার চেয়ে নিজেই গিয়ে নিয়ে আসি না কেন? সুনিশ্চিত হওয়া যাবে।

—তাই এলে?

—বাধা কোথায়? তোমার কর্তৃবাচ্য আছে, কর্মবাচ্য আছে। আমার তো শুধু ভাববাচ্য। স্যুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল।

সুচরিতা চাকরটাকে ইঙ্গিত করলে সাহেবের জুতো খুলে দেবার জন্যে। নিজের হাতে ওর কোট-টাই খুলে ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে এল। বললে, ভালোই করেছ। এতদিন কাটালাম, কিন্তু ভয় হচ্ছিল, আজকের দিনটা বুঝি আর কাটাতে পারব না। তোমাকে দেখে ভরসা

হচ্ছে দিনটাও কাটবে। কিন্তু বেশি বুদ্ধি করতে গিয়ে একটা অসুবিধা করেছি।

—নেভার মাইণ্ড। কী অসুবিধা বল, আমি সুরাহা করে দিচ্ছি।

সুচরিতা হেসে বললে, তা ছাড়া উপায়ও নেই। এইটেকে রেখে অন্য দুটো চাকরকে ক'দিন আগেই মাইনে মিটিয়ে বিদায় দিয়েছি। আজকে আর রান্নাবাড়া করব না ঠিক করে রাত্রে ঠাকুরটাকেও বিদায় দিলাম। এখন তুমি এলে, সুতরাং রান্না দুটি করতেই হবে। আমি রাঁধব, আর তুমি আমাকে সাহায্য করবে, কেমন?

—চমৎকার!

—তাহলে স্নান করে এস। আমি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি। কিন্তু জামা-কাপড় এনেছ তো? নইলে আমার শাড়ি পরতে হবে কিন্তু।

প্রস্তাব শুনে প্রণব অট্টহাস্য করে উঠল ঃ বাঃ! ঝগড়ু আছে যে সঙ্গে!

—ওঃ! সেও এসেছে সঙ্গে! তাহলে আর চিন্তা কি! যাও, আর দেরি কোর না।

চারিদিকে চাইতে চাইতে প্রণব বললে, না, আর দেরি কিসের? কিন্তু তোমার টেবিল-চেয়ার, আসবাবপত্র কোথায়? কিছু দেখছি না যে!

—তার কিছু মালগাড়িতে কলকাতা যাত্রা করেছে। বাকি বন্ধু-বান্ধবকে বিলিয়ে দিয়েছি।

প্রণব যেন উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রাণের আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না।

চিৎকার করে উঠলঃ হুর্‌রে! কী ভালোই যে লাগছে আমার, সুচরিতা! আমার সমস্ত জীবন যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে, বহুকাল পরে সম্পূর্ণ অভাবিতরূপে তোমার সঙ্গে যেন দেখা হয়ে গেছে, পথের ধারে জীর্ণ একটি স্টেশনের বিশ্রামঘরে। আজ দুপুরটা আমরা কি করে কাটাব জান?

প্রণবের চোখের স্বপ্ন ধীরে ধীরে যেন সুচরিতার চোখেও সঞ্চারিত হচ্ছে। বললে, কি করে?

প্রণব বললে, গল্প করে। তুমি বসবে ওই স্যুটকেসটার উপর, আর আমি এই বিছানাটার ওপর। আর এই হতশ্রী ঘর। দেখবে কতকালের কত হারিয়ে-যাওয়া গল্প আবার ফিরে আসবে। আমরা

নতুন করে আবার সেই পুরনো জীবন ফিরে পাব। সে যে কত ভাগ্যের কথা, তা আর বলবার নয়।

যেন নাচতে নাচতে প্রণব বাথরুমে চলে গেল।

বরদা শক্ত লোক। দিন দেখা-দেখিতে প্রণব আর সুচরিতা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, সে করে। এবং শেষ পর্যন্ত ওর ইচ্ছাই জয়ী হল। তারপরে একদিন ভালো পণ্ডিত এনে যাগ-যজ্ঞ করে সুচরিতা তার নতুন বাড়িতে গেল।

প্রণব বাধা দিলে না। কিন্তু খুব কৌতুক বোধ করলে।

এর পরে সুচরিতা একটা বাঁধা কার্যক্রমের মধ্যে পড়ল। প্রণবের সংসার সে সহজেই একটা বন্দোবস্তের মধ্যে এনে ফেললে। যার জন্যে সেখানে রোজ সকালে যাওয়ার দরকার হয় না। হঠাৎ কোনো কারণে দরকার হলেও ঝগড়ু এসে নির্দেশ নিয়ে যায়।

সুতরাং সুচরিতার কাজের মধ্যে দাঁড়াল সকালে বাগান করা, দুপুরে নিদ্রা এবং বই পড়া। বিকেলে প্রণবের সঙ্গে একটু টেনিস খেলা। আবার সে প্রণবের পাল্লায় পড়ে টেনিস খেলা আরম্ভ করেছে। তা ছাড়া করবেই বা কি? সময় তো কাটাতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে ফিরে এসে আবার বই-টই কিছু পড়ে।

সেদিন সকালে একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সুচরিতা কাদায় নিজে আর বাগানে নামতে পারেনি। মালিটা কাজ করছিল, আর সে নিজে বারান্দায় বসে মাঝে মাঝে খবরের কাগজখানা ওল্টাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে মালির কাজ দেখছিল।

খবরের কাগজ সম্বন্ধে সুচরিতার ঔৎসুক্য বরাবরই কম। খবরের কাগজ একখানা রাখতে হয়, তাই রাখে। মাঝে মাঝে পাতা ওল্টায়। খুব যে পড়ে, তা নয়। শুধু একটি জায়গা নির্দিষ্ট দিনে মন দিয়ে পড়ে, নিয়োগ-বদলির জায়গাটা। তার চেনা-জানা লোকেরা কে কোথায় বদলি হচ্ছে দেখে।

এইভাবেই সে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় প্রণব এসে পিছন থেকে তার চোখ টিপে ধরলে।

বিরক্তভাবে সুচরিতা বললে, আঃ! চোখ ছাড়! এখনই চাকর-বাকরে দেখে ফেলবে!

প্রণব চোখ ছেড়ে দিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসতে সুচরিতা বললে, তোমার বয়স কি দিন দিন কমছে? কী যে কর!

প্রণব গম্ভীরভাবে বললে, দেখ, সু, মানুষের বয়স একটা নয়।

—ক'টা তবে?

—দুটো। একটা মনের, একটা দেহের।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দুটোর তালও এক নয়, মাপও এক নয়।

প্রণব মাঝে মাঝে এরকম দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে। সুচরিতার খুব কৌতুক বোধ হয়।

বললে, কি রকম শুনি?

প্রণব বললে, কারও মনের বয়স দ্রুত তালে চলে, দেহেরটা ঢিমে তালে। আবার কারও দেহেরটাই দ্রুত তালে চলে, মনেরটা ঢিমে তালে।

—তার ফলে কি হয়?

—তার ফলে কোথাও দেখা যায়, ত্রিশ বছরের ছেলে মনের দিক দিয়ে তেষট্টি বছরের হয়ে গেছে। আবার হয়তো তেষট্টি বছরের বুড়ো মনের দিক দিয়ে ত্রিশ বছরের হয়ে রয়েছে।

—শেষেরটির দৃষ্টান্ত তুমি?

—তা বলতে পার। তার জন্যে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু যে-কথাটা তোমাকে বলতে এসেছিলাম, সেইটে বলি।

—বল।

—কাল সৌদামিনীর মৃত্যুদিন। অরুণাতে আমাতে এই দিনটি বরাবর শ্রদ্ধার সঙ্গে শান্তভাবে পালন করে এসেছি। এবারে অরুণা নেই, তুমি আছ। আসবে কাল সকালে?

—আসব বইকি! নিশ্চয় আসব।

কী কথা ভাবতে ভাবতে প্রণব বললে, অরুণা যখন নতুন এসেছে, —খুব নতুন অবশ্য নয়,—তখন তার সঙ্গে একদিন টেনিস খেলেছিলে। মনে আছে?

—আছে।

—সেদিন তুমি জিততে পারতে, কিন্তু ইচ্ছে করে জেতনি। মনে আছে?

দুষ্টুমি করে সুচরিতা বললে, তা মনে নেই।

—হ্যাঁ। কিন্তু সৌদামিনীর কাছে তুমি তেমন করতে পারতে না।

—তার মানে?

—তার মানে, সর্বত্র তার ইচ্ছেটাই জয়ী হত। অন্যেরটা নয়।

—কি করে?

—কি জানি, কী একটা আশ্চর্য উপায়ে। দেখেছি কি না।

প্রণব চুপ করে গেল। তারপরে হঠাৎ বললে, কিন্তু একটা আশ্চর্য কথা জানো, কী সৌদামিনী, কী অরুণা, কেউ-ই আমাকে সম্পূর্ণ পায়নি।

রুদ্ধশ্বাসে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—সকল সময়ই শেষ বেঞ্চের একটা কোণে একটুখানি জায়গা তুমি দখল করে বসে ছিলে। সেই ফাঁকটুকু ওরা কেউ-ই ভরাতে পারেনি। সে যে আমার পক্ষে কী ভয়ানক অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল, তা আর বলবার নয়।

সুচরিতা নিরুত্তরে শুনে যেতে লাগল।

প্রণব বলে চলল, তোমার কথা কত যে ভেবেছি, কতরকম করে যে ভেবেছি, তার আর শেষ নেই। কেবলই মনে হয়, তুমি আমাকেও ফাঁকি দিলে, নিজেও ফাঁকি পড়লে।

এতক্ষণে সুচরিতা যেন নাড়া দিয়ে উঠল। বললে, তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি, এ কথা কি করে বল?

—তা-ই, সুচরিতা। তুমি ভেবেছ ভালোবাসলেই পাওয়া সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তা নয়। না পেলে ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না।

সুচরিতা কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, পাওয়া তুমি কাকে বল?

—কাকে বলি, তুমি জান না! কিন্তু তোমার অন্তর জানে। তাই সেদিন জিততে গিয়েও তুমি ইচ্ছে করে জিততে পারোনি। যখন দ্বিধা থাকে না, শঙ্কা থাকে না, এমন কি, সঙ্কোচের আবরণও ফিকে হয়ে আসে, একজন আর-একজনকে তখনই পায়।

—ওটা হয় বোধ হয় দেহটার জন্যে।

—দেহটার জন্যেই তো। কিন্তু শুধু ভালোবাসলেই দেহের ঊর্ধ্বে ওঠা যায় না। তার জন্যেই পেতে হয়। পাওয়া সম্পূর্ণ হলে দেহ তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন ছেলের সামনেই মা অসঙ্কোচে স্বামীর পাশে শুয়ে থাকতে পারে। নইলে চোখ টিপে ধরলেও মালির ভয়ে সঙ্কোচে শিউরে

উঠতে হয়। আমার কথাটা বুঝতে পারছ?

সুচরিতা সাড়া দিলে না।

অনেকক্ষণ পরে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, পাওয়া সম্পূর্ণ হয় কখন?

—যখন একজনকে নইলে আর-একজনের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে, তখনই।

—তখনই?

সুচরিতা নিঃশব্দে ভাবতে লাগল। সে যা বুঝে এসেছে, যা ভেবে এসেছে, একেবারে তার শিকড়ে যেন নাড়া পড়েছে। কতক্ষণ ধরে সে ভাবলে। ভাবতে ভাবতে আপন-মনেই হঠাৎ একসময় শিউরে উঠল।

প্রণব তখন অন্যমনস্ক। এটা তার চোখেই পড়ল না।

যে ঘরটিতে তরঙ্গিণীর ঠাকুরঘর ছিল, তিনি চলে যাওয়ার পরে সেইটিতেই ছিল অরুণার ফক্স-টেরিয়ার। কিন্তু কুকুর সম্বন্ধে প্রণবের কোনদিনই অনুরাগ বিশেষ ছিল না। পরের কুকুরটি ছিল মাধুরীর অনুগত। সুতরাং মাধুরীর বিবাহের পরে সে তাকে নিজের সঙ্গে টাটানগর নিয়ে গেছে।

এখন সে ঘরটা খালি। তারই একদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি প্রসন্নবাবু এবং তরঙ্গিণীর দুটি অয়েল-পেন্টিং,—সন্ন্যাস-জীবনের নয়, গৃহী-জীবনের। আর, তারই সামনের দিকের দেওয়ালে পাশাপাশি সৌদামিনী ও অরুণার দুটি অয়েল-পেন্টিং। সব ক'টি ছবির গলাতেই বড় বড় মালা ঝুলছে। আর তার নিচে দুখানি জলচৌকির উপরে ধূপদানিতে অনেকগুলি করে ধূপকাঠি পুড়ছে।

প্রণব সুচরিতাকে সেই ঘরে নিয়ে এল। দুজনে নিঃশব্দে শান্তভাবে বসে একে একে সকলের জন্যেই প্রার্থনা করলে, অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে ওরা পাশের ঘরে এসে বসল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, বাবার স্বামীজিকে তুমি দেখনি, না সুচরিতা?

—না।

—আশ্চর্য মানুষ! আমি জানি না সাধনমার্গে তিনি কতদূর উন্নতি করেছিলেন। ওসব আমি বুঝিও না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ দর্শন ছিল, সেটা আমার ভালো লেগেছিল।

—কি সেটা?

—সব আমার মনে নেই। এতদিন পরে মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু একটি কথা বেশ মনে আছে এবং সেই উদ্ধত যৌবনেও ভালো লেগেছিল। সেটি হচ্ছে ঃ সে-ই তোমার যথার্থ আত্মীয়, যে তোমাকে তোমার চরিতার্থতার পথে চলতে সাহায্য করে। বাপ-মাই বল আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাই বল, সমস্ত সম্পর্কের সার্থকতা এই মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে।

—আর হৃদয়? হৃদয় কিছু নয়?

—স্বামীজির মতে ওটা কিছুই নয়,—বিলাস মাত্র।

—এইটে তোমার ভালো লাগল?

—নরনারীর সম্পর্কে ওটাও একটা দিক, সুচরিতা। এই মুহূর্তে যখন সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করে হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি কি প্রীতি নিবেদন করছিলাম, তখন এই দিকটা বেশ লাগছিল।

—এটা তো পারস্পরিক?

—নিশ্চয়ই। পরস্পর পরস্পরকে তার চরিতার্থতার পথে সাহায্য করে বলেই এটা পবিত্র। হিন্দু-বিবাহের মূল কথা নাকি এই।

সুচরিতার এটা খুব ভালো লাগল না। হৃদয়কে বাদ দিয়ে কোনো সম্পর্কের কথা ভাবলে, সে আর রস পায় না। অথচ স্বামীজি বলেন, হৃদয়টা বিলাস,—ওটা শুধু বাঁধে আর কিছু করে না।

সুচরিতা বললে, ওটা সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের নয়।

—না। আমার কিন্তু কোনো-কিছু সম্বন্ধেই একটা চূড়ান্ত মত নেই সুচরিতা। এক-একটা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ একটা দৃষ্টিভঙ্গি ভালো লাগে। আজ এই দর্শনটি ভালো লাগল কেন জান?

—ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং প্রীতি জানাবার সুবিধা হল বলে।

—হ্যাঁ। কিন্তু কৃতজ্ঞতা আমার ওইখানেই শেষ হয়ে গেল না।

—তবে?

—আমার পাশে সশরীরে যে বসে ছিল তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছল। ওদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। অন্তরের মধ্যে খুব স্পষ্ট যে অনুভব করতে পারছিলাম, তাও নয়। কিন্তু এই তৃতীয়টিকে বাহির এবং অন্তরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছিলাম। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি!

প্রণব হাসতে লাগল।

কিন্তু সুচরিতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে। বললে, আমি এবার উঠি।

—যদি উঠতে না দিই? যদি বেঁধে রেখে দিই?

সুচরিতা জানে প্রণবের মাথায় কী কথা ঘুরছে। জানে, এই কথার সবটাই পরিহাস নয়। জানে, একটা প্রচণ্ড শক্তি নিরন্তর প্রণবকে যেন ঠেলছে। তাকেও যে ঠেলছে না, তা নয়। কিন্তু তাকে অমন ব্যস্ত করতে পারে না। মনকে সে বুঝিয়েছে, এই সমাজে এই বয়সে ওটা সম্ভব নয়। তাতে করে ভুল করাই হবে।

বললে, আচ্ছা এই বসলাম। বল তোমার কী কথা।

—আমার একটিই কথা, তোমাকে বেঁধে রেখে দেওয়া। যে ভুল অতীতে করেছি, তার সংশোধন করা।

—তার সংশোধন করতে গিয়ে আর-একটা ভুল করবে?

—ভুল নয়, সেইটেই সত্যি। সৌদামিনীর মৃত্যুর পরে এই সত্যকেই গ্রহণ করা আমার উচিত ছিল। ভয়ে পারিনি। সুচরিতা, আমি স্থির করেছি, কোনো ভয়েই এই সত্যকে আর অস্বীকার করব না।

—কি করবে?

—তোমাকে বিবাহ করব।

—জোর করে?—অস্বস্তির সঙ্গে সুচরিতা হো-হো করে হেসে উঠল।

প্রণব একমুহূর্ত কী যেন ভাবলে। বললে, হ্যাঁ সুচরিতা, দরকার হলে জোরও করব। তুমি জানো সে জোর আমার মধ্যে আছে।

—লোকে কি বলবে?

—তাদের যা খুশি।

—ছেলেমেয়েরা কি ভাববে?

—তাদের যা খুশি। সুচরিতা, তোমাকে পেতে গেলে সমস্ত দ্বিধা, সংকোচ এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে আমাকে উঠতে হবে। সমস্ত জীবন তোমাকে পেলাম না। কিন্তু আর হারাতে পারব না।

—কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসে আমাকে কেন পেতে চাও? কি হবে পেয়ে?

প্রণব একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, এ প্রশ্ন আমার মনেও যে ওঠেনি তা নয়। দুজনেই জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি, তবু পরস্পরকে চাই কেন? না, কোনো জবাব পাইনি। বোধ করি তোমাকে পাওয়ার জন্যেই পেতে চাই। পেয়ে ধন্য হতে চাই। এ ছাড়া

কোনো জবাব দিতে পারব না।

সুচরিতা স্থাণুর মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি ভাবতে সময় চাও, সুচরিতা?

সুচরিতা তথাপি নিরুত্তর।

এবারে প্রণব ভয় পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে ওর পাশে বসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম, সুচরিতা?

ওর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। শান্ত, সংযত কণ্ঠে বললে, তাহলে থাক, সুচরিতা।

এবারে সুচরিতা ভেঙে পড়ল।

—অমন করে আমাকে লোভ দেখিওনা গো, অমন করে আমাকে লোভ দেখিও না।

হাতখানি টেনে নিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সুচরিতা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য মানুষ এই প্রণব। মনের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। বয়সের ব্যবধানও মানে না। দিনের বেলায় যদি বা একটু অর্গল থাকে, সন্ধ্যার পরে দোতলার দক্ষিণের খোলা বারান্দায় মদের গ্লাসের সামনে বসলে তাও আর থাকে না। তখন 'সকল মানুষ আমার ভাই, তিন ভুবন আমার স্বদেশ'। বিমান, মাধুরী কিংবা জামাতা বনবিলাসের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাও ঠিক সন্তানের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

সুতরাং বিবাহ সম্পর্কে মনঃস্থির করামাত্র প্রণব অকপটে সে কথা তাদের লিখে জানাল।

বিমান তখন মজঃফরপুর থেকে পুরীতে বদলি হয়ে এসেছে। খবর পেয়ে সে তো স্তম্ভিত। স্ত্রীকে ডেকে বললে, শুনেছ এলেন, বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন!

ও-ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন এল। বিমানের হাতের মধ্যে চিঠিখানা তখনও কাঁপছিল। কিন্তু সেদিকে না চেয়েই বললে, তাই নাকি! কবে? আমরা সবাই যাচ্ছি তো?

তার মুখে-চোখে খুশি যেন উপচে উঠছে।

গম্ভীরভাবে বিমান বললে, ছিঃ এলেন! বাবার বিয়ে, একি ঠাট্টার কথা!

এখানকার সমাজ এবং সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এলেনের এই অল্পদিনে বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি।

থতমত খেয়ে এলেন বললে, কিন্তু এদেশেও বুড়োরা বিয়ে করে তো।

—করে। কিন্তু তা নিন্দনীয়। বাবা বিয়ে করবেন কি! বড় বড় ছেলেমেয়ে রয়েছে। লোকে বলবে কি!

সত্যি। এদেশে বৃদ্ধের বিবাহ যদি সমাজে নিন্দনীয়ই হয়, তাহলে লোকে তো নিন্দা করবেই।

—কিন্তু—এলেন বললে,—তিনি যদি বিয়ে করতেই চান, তোমরা কি করে আটকাতে পার বল?

—যে করে হোক, আটকাতেই হবে। আমি ভাবছি,

বিমান একটু থেমে এলেনের দিকে চাইলে।

এলেন জিজ্ঞাসা করলে, কী ভাবছ বল।

বিমান সোফা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কিছুই ভাবতে পারছি না। মোট কথা, বাবার সঙ্গে একটা কথা হওয়া দরকার। সামনের ছুটিতে আমি নিজে একবার কলকাতা যেতে পারি। কিংবা

এলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। খুব মনোযোগের সঙ্গে ওর কথা শুনছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কিংবা?

—সব চেয়ে ভালো হয়, এলেন, যদি ওঁকেই এখানে আনা যায়।

একটু পরে বললে, সেই সঙ্গে মাধুরীকেও। সে বাবার অত্যন্ত প্রিয়। ওর কথা বাবা কোনোদিন ঠেলতে পারেন না।

মতলবটা মাথায় আসতেই বিমান উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, দাঁড়াও, এখুনি দুখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিই,—বাবাকে আর মাধুরীকে। দেখা যাক, কী দাঁড়ায়।

বলেই বিমান লেখবার ঘরে চলে গেল। এবং টেলিগ্রাম দুখানা পাঠিয়ে দিয়ে মিনিট পনেরো পরে আবার ফিরে এল।

এলেন তখন বাইরের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কী যেন ভাবছিল।

—কি ভাবছ?—বিমান জিজ্ঞাসা করলে।

এলেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, কিছুই ভাবিনি।

তারপর বলল, আমাদের দেশে এরকম হয়। তোমাদের দেশে হয় না। আচ্ছা, যাঁকে বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন—তাঁকে চেন, দেখেছ কখনও?

—দেখেছি বইকি! আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু।

—কত বয়স?

বিমান একটু ভেবে বলল, তা চাকরি থেকে যখন অবসর নিতে যাচ্ছেন তখন পঞ্চাশের ওদিকেই হবে।

এলেন সোজা হয়ে বসে বললে, তবে?

বিমান বিস্মিতভাবে বললে, কি তবে?

—কিছু নয়।—বলেই এলেন চুপ করল।

বিমান কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে, এই বিয়েতে তুমি যেন বাধা দিতে চাও না, মনে হচ্ছে।

—সত্যি।

—কেন চাও না?

এলেন গম্ভীরভাবে বলল, কেননা বুড়ো মানুষদের আমরা ঠিক চিনি না। তাঁদের মনের কথাও জানি না। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাবা এবং সেই ভদ্রমহিলা উভয়েরই ছেলেমি করার বয়স পার হয়ে গেছে, উভয়েরই অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিস্তর,—তাহলে ছুটে বাধা দিতে যাওয়ার আগে শান্তভাবে একটু চিন্তা করা দরকার নয় কি?

বিস্ময়ে বিমানের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

এলেন বলতে লাগল, তুমি জিগ্যেস করলে, কী ভাবছিলাম। কি ভাবছিলাম জানো? এই কথাই। ভাবছিলাম, ভালোবাসা শুধু আমাদের বয়সের একচেটিয়া কিনা। কিন্তু জবাব পেলাম না।

—কার কাছ থেকে?

—নিজের মনের কাছ থেকেই।

বিমান অসহিষ্ণুভাবে বললে, কিন্তু আমাদের সমাজে এ-ব্যাপার যে কতখানি হাস্যকর, তোমার ধারণা নেই।

এলেন শান্তভাবে বলল, না। সেইজন্যেই তোমাকে বাধা দিতে পারছি না। চুপ করে রয়েছি।

অনেকক্ষণ পরে আপন-মনেই বিমান বললে, মাধুরী এ খবর পেয়েছে কিনা কে জানে।

—তুমি তাকেও টেলিগ্রাম করলে না?

হাই তুলে বিমান বলল, করলাম তো। এখানে আসতেও লিখেছি। ভাবছি, আমার মতো বাবা তাকেও চিঠি লিখেছেন কিনা। তাহলে এতক্ষণ হয়তো সে কেঁদে কেটে রসাতল করছে।

বিমানের অনুমান মিথ্যা নয়। মাধুরীও তারই সঙ্গে প্রণবের চিঠি পেয়েছিল এবং কেঁদে-কেটে রসাতলই করছিল।

বনবিলাস তখন অফিসে।

সে সকালে অফিসে যায়। দুপুরে খেতে আসে, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে আবার অফিস চলে যায়।

প্রণবের চিঠিটা এল সে অফিস চলে যাবার পরেই।

সমস্ত বিকেলটা সে ছটফট করে কাটাল। কী সর্বনেশে চিঠি! বনবিলাস ফিরে না আসা পর্যন্ত সে এই চিঠির মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না। তার সব গোলমাল লাগছে।

বনবিলাস ফিরে আসতেই মাধুরী তাকে পোশাক ছাড়বারও ফুরসত দিলে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, শুনেছ, শুনেছ, বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন!

—বাঁচা গেল! অনেকদিন পরে একটা বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ পাওয়া যাবে!

বনবিলাস কোটটা খুলে হ্যাঙ্গারে রাখল।

—বাবার বিয়ে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ?—মাধুরীর বড় বড় চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বিব্রত হয়ে বনবিলাস বললে, ঠাট্টা আমি করছি, না তুমি করছ?

—আমি করছি? —মাধুরীর জলভরা চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

—না তো কি? বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন, একথা তো তুমিই বললে।

—সে তো সত্যি কথা। এই দেখ বাবার চিঠি।

মাধুরী প্রণবের চিঠিখানা বনবিলাসকে দিলে।

বনবিলাসের বাঁ হাতটা তখনও টাই-এর উপর। কিন্তু টাই আর খোলা হল না। পাশের চেয়ারে বসে পড়ে এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ফেলল। তারপর শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

অবশেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, বাবা রসিকতা করেননি তো? তিনি তা পারেন।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মাধুরী বললে, কখ্‌খনো না। বাবা না লিখলেও আমি ঠিক বুঝতে পারছি, এ নিশ্চয় সেই সুচরিতা মিত্তিরের কাণ্ড!

—তিনি কে?

ঘৃণার সঙ্গে মাধুরী বলল, কে জানে, কোথাকার ইন্সপেক্‌ট্রেস অব্‌ স্কুল্‌স, না, কী যেন ছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি করেছেন।

মা থাকতেই আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা ছিল। এখন হয়তো আরও বেড়েছে।

—তুমি জানতে এঁকে?

—জানতাম। কিন্তু এরকম ভাবিনি। মাসিমা বলতাম, মাসিমার মতোই দেখতাম। নইলে কি ঢুকতে দিতাম বাড়িতে!

মাধুরীর চোখে একটা হিংস্র আগুন জ্বলে উঠল।

বনবিলাস মনে মনে হাসল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, কিরকম লোক?

—মন্দ নয়। স্পষ্টাস্পষ্টি ভালো বলতে মাধুরীর বাধল।

বনবিলাস বললে, তবে আর কি? লাগিয়ে দাও।

তপ্ত-কড়ায়-ফেলা মাছের মতো মাধুরী যেন জ্বলে উঠল। বললে, হ্যাঁ। লাগিয়ে দোব। কি জানো? আগুন। আমি কালই কলকাতা যাচ্ছি।

ওর অবস্থা দেখে বনবিলাস ভয় পেয়ে গেল। বললে, কালই! সর্বনাশ! এই রাগের মাথায় যেও না। বরং পরশু যেও। শনিবার আছে, আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ক্রোধের জ্বালায় মাধুরী তখন ছটফট করছে। বললে, তুমি শনিবারেই এস। আমি আর একটা দিনও থাকব না। আমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। রাত্রে গাড়ি থাকলে আজ রাত্রেই চলে যেতাম।

মাধুরীর মনের অবস্থা সেইরকমই।

তবু পরদিনই মাধুরীর যাওয়া হল না।

বাঁধা-ছাঁদা সমস্ত তৈরি। সন্ধ্যা ছটায় গাড়ি। একটু পরেই টিকেট এবং বার্থ রিজার্ভ করবার জন্যে লোক যাবে। এমন সময় বিমানের টেলিগ্রাম এল, অবিলম্বে পুরী চলে আসার জন্যে।

বনবিলাস বললে, তাহলে আজ থাক। আমিও বরং এই সুযোগে ক'দিনের ছুটি নিই। দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তোমরা যতক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটি কান্নাকাটি করবে, আমি ততক্ষণ সমুদ্রের হাওয়ায় শরীরটা একটু সারাবার চেষ্টা করব।

বনবিলাস এমনিতেই বিশালকায়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এরকম চেহারা এবং এই স্বাস্থ্য সাধারণত বাঙালীর ঘরে বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং

সেই শরীর সারাবার কথায় মাধুরী হেসে ফেললে। তারও মনোগত অভিপ্রায় বনবিলাসের সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ছুটি পেতে ক'দিন দেরি হবে?

—কিছুমাত্র দেরি হবেনা। শনিবার আমরা বেরুতে পারব।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দৌড়টা দেখতে হবে না?

—দৌড় কিসের?

—বুঝতে পারলে না?

বনবিলাস ওকে বিমানের মতলবটা বোঝাতে বসল: শ্বশুরমশায়ের বিবাহের কথা শুনে তোমরা সবাই হৈ-হৈ করে কলকাতা যেতে পারতে। কিন্তু সেখানে বৃদ্ধ তাঁর নিজের দুর্গে সমাসীন। কাছে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি সুচরিতা মিত্তির। অর্থাৎ যাকে বলে: "Bearding the lion in his own den"! ম্যাজিস্ট্রেট দেখলে, সে বড় সুবিধা হবে না। তার চেয়ে ঢের ভালো বৃদ্ধকে তাঁর নিজের দুর্গ থেকে অরক্ষিত এবং নিরস্ত্র অবস্থায় নিজের কোর্টে বার করে এনে চাপ দেওয়া। সুতরাং এই ব্যবস্থা। বুঝলে?

মাধুরী আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল। বললে, তাই তো! আমি তো এত কথা ভাবিনি। কিন্তু তুমিও যাচ্ছ তো?

—যাচ্ছি বটে। কিন্তু সেদিকেও কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি-কে মুকার্জি। দুর্গ ছেড়ে তিনি যে বার হবেন এমন তো মনে হয় না।

বনবিলাস টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—তখন কি হবে?

—তখন তোমরাই,—অর্থাৎ তোমার ম্যাজিস্ট্রেট দাদা, শ্বেতাঙ্গিনী বৌদি এবং তুমি,—কামান-বন্দুক নিয়ে কলকাতায় মার্চ করবে।

—আর তুমি?

—আমি মনের দুঃখে এখানে ফিরে এসে লোহা ঠ্যাঙাব।

চোখ নাচিয়ে মাধুরী বললে, হুঁ। তাই বইকে! তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে আমি তো কাঁদছি!

বনবিলাস হাসলে। বললে, আচ্ছা, সে তো পরের কথা। আপাতত শনিবার সন্ধ্যায় আমরা পুরী যাত্রা করছি, এতে আর ভুল নেই।

কিন্তু যার বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র, সে তখন শয্যাগত।

দিন তিনেক আগে টেনিস খেলতে গিয়ে প্রণবের ডান পা'টা মচকে যায়। সেই থেকেই বৃদ্ধ শয্যাগত। দুদিন তো উঠতেই পারেনি। আজ উঠে বসেছে এবং একটু একটু হাঁটবারও চেষ্টা করছে।

তখন আষাঢ়ের সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের উপর রঙের সমারোহ শেষ হয়নি।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় একটা টিপয়ের উপর পা তুলে দিয়ে প্রণব একখানা ইজিচেয়ারে শুয়েছিল। মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে সুচরিতা তার আহত স্থানে কি-একটা ঔষধ পেণ্ট করে দিচ্ছিল। আরামে প্রণবের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল।

পেণ্ট শেষ করে সুচরিতা তার দিকে চাইলে।

কী মুখ!

প্রশস্ত ললাটে, নিমীলিত নেত্রে, মাথার বিরল পক্ককেশে রক্তমেঘের আভা লেগেছে!

কী মুখের ডৌল! বৃদ্ধের এই রূপ আর কারও চোখে হয়তো পড়বে না, কিন্তু সুচরিতা এই রূপের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল! চোখ যেন আর ফেরাতে পারে না।

ধীরে ধীরে প্রণব চোখ মেলতেই লজ্জিত হাস্যে সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে।

ঈষৎ হেসে ডান হাতখানি প্রণব ওর মাথায় স্পর্শ করল। সে-স্পর্শে সুচরিতা যেন কেঁপে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, কেমন বোধ হচ্ছে?

—একটু ভালো। তার মানে এখনও অনেকখানি খারাপ।

প্রণব হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর বলল, বোস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। এসেই মালিশের জন্যে এমন তাড়া দিলে যে, আসল কথাটাই বলা হয়নি।

পাশের কুশন-দেওয়া মোড়ায় বসে সুচরিতা নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে চাইল।

প্রণব একটু থেমে গলাটা ঝেড়ে বললে, বিয়ের সংবাদ জানিয়ে বিমানকে আমি একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। বলেছি তোমায়?

সুচরিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

প্রণব বলল, দিয়েছিলাম। তার উত্তরে বিমান একটা টেলিগ্রাম করেছে।

সুচরিতা নিঃশব্দে তেমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল।

প্রণব বলল, আমাকে পুরী যাবার জন্যে লিখেছে। কেন, কে জানে। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না লিখেছিলাম। বোধ করি সেইজন্যে। কিন্তু এই ভাঙা পায়ে কি এখন যাওয়া সম্ভব হবে? অবশ্য পা এখন অনেকটা সেরে আসছে। কাল-পরশু থেকে হয়তো মোটামুটি হাঁটতে পারব। তবু

পশ্চিমের দিগন্ত থেকে সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। সেই দিকে চেয়ে প্রণব অনর্গল বকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সুচরিতার দিকে চেয়ে থমকে গেল।

তার ঠোঁটের ফাঁকে অতিসূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

প্রণব থমকে গিয়ে প্রশ্ন করল, হাসছ যে!

—না, হাসিনি। বোধ হয় তোমার শরীরের জন্যেই পুরী যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করে থাকবে। তাই হবে।

হাসি গোপন করবার জন্যে সুচরিতা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রণবের মনে ধোঁকা লাগল। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মনে কর বল তো?

এর পর সুচরিতার পক্ষে হাস্যসম্বরণ করা দুরূহ হয়ে উঠল। সে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল।

বললে, তুমি না একদিন বক্তৃতায় হাইকোর্ট কাঁপিয়ে দিতে? জটিল মামলা জলের মতো সোজা, আর সোজা মামলা দুশ্ছেদ্য জটিল করে তুলতে?

প্রণব সবিনয়ে স্বীকার করল, সে বদনাম তার ছিল। নইলে মক্কেল টাকা দিত না।

—তবু কি তুমি এই টেলিগ্রামের অর্থ সত্যিই বুঝতে পারছ না?

—যা বুঝেছি সে তো তোমায় বললাম।

সুচরিতা অবাক্ হয়ে ওর শান্তসুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তার পরে ওর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, সংসারে অনেক লোক দেখলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।

—ঠাট্টা করছ?

—না গো, ঠাট্টা করিনি।—সুচরিতা গম্ভীরভাবে বলতে লাগল—সাধারণ মানুষের থেকে তুমি স্বতন্ত্র। তুমি অতুলনীয়। তোমাকে যতই

দেখছি, এই ধারণা ততই দৃঢ় হচ্ছে।

তারপর কথাটা ফেরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কবে যাচ্ছ তুমি?

—তুমি বলে দাও।

সুচরিতা একটু ভেবে বললে, বিমান যখন লিখেছে, তখন তোমার বেশি দেরি করা উচিত হবে না। আমি বলি, তুমি সোমবার যাও বরং। আমি সরকার-মশাইকে বলে দিচ্ছি, তিনি কালকে তোমার বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করবেন। ঝগড়ু তোমার সঙ্গে যাবে।

—আর তুমি? তুমি যাবে না?

সুচরিতার মুখে কিসের যেন একটা কালো ছায়া পড়ল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সে সামলে নিলে। সহজ কণ্ঠে বললে, আমার যাওয়া সম্ভবপর হবে না। ঝগড়ু সঙ্গে থাকলে, আমার মনে হয়, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না।

তার কথার তাৎপর্য প্রণব বুঝল কি বুঝল না বোঝা গেল না। সে চুপ করে রইল।

রবিবার সুচরিতা এল প্রণবের খবর নিতে। দেখে প্রণব সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ এবং নিরাসক্তভাবে ঈজিচেয়ারটায় শুয়ে।

—কেমন আছ?—সুচরিতা জিজ্ঞাসা করল।

—ভালো।—সংক্ষিপ্ত জবাব।

—বার্থ পাওয়া গেছে?

—গেছে।

—পুরী এক্সপ্রেসে?

—হ্যাঁ। কিন্তু টিকিটটা ফেরত দিতে হবে কালকে।

—কেন?

—স্থির করেছি যাবনা।

—যাবে না? সে কি?

—হ্যাঁ। আমি ভেবে দেখলাম, সুচরিতা, না যাওয়াই ভালো।

—নিজেকে দুর্বল বোধ হচ্ছে?—সুচরিতার সুরে যেন ব্যঙ্গের আমেজ।

প্রণব এবারে সোজা হয়ে বসল। বললে, দুর্বলতার চিহ্নও আমার

মধ্যে নেই। কিন্তু আমি যে বলিষ্ঠ শুধু সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই এই শরীরে পুরী যেতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করছি না।

একটু চুপ করে থেকে সুচরিতা বললে, কাল অত উৎসাহ দেখলাম, আজ তার কিছুই নেই?

—সুচরিতা, উৎসাহ বোধ করেছিলাম অনেক দিন পরে ওদের দেখব বলে। ওদের দেখবার জন্যে আমার মনটা খুবই ব্যাকুল হয়েছিল। অনেক দিন দেখিনি কিনা।

—সেই ব্যাকুলতা নষ্ট হয়ে গেল কি করে?

—ব্যাকুলতা তেমনি আছে, সুচরিতা। যেতে পারছি না বলে মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছি!

ওর দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সুচরিতা বললে, তাহলে যাও। না-যাওয়ার কোনো কারণ নেই।

—তুমি তাই মনে কর?—প্রণবের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ উদ্দীপনার সঞ্চার হল।

—করি। সরকার-মশাইকে টিকিট ফেরত দিতে বলে দাওনি তো?

—দিইনি। দোব ভাবছিলাম।

—তাহলে আর দিওনা। তোমার মনের মধ্যে জোরের অভাব যদি না থাকে, তাহলে যাও।

—জোরের অভাব কিছুমাত্র নেই।—দৃঢ়কণ্ঠে প্রণব বললে,—এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

নিশ্চিন্ত হওয়ার কথায় সুচরিতা হেসে ফেলল। বললে, আমার মনে খুব চিন্তা জমেছে, তোমার কি এই সন্দেহ?

—চিন্তা তো হওয়ারই কথা, সু।

—না, আমার পক্ষ থেকে কোনো চিন্তা নেই। তুমি জান বিবাহ সম্বন্ধে খুব উৎসাহ আমার নেই। এই যে তোমার কাছাকাছি রয়েছি, তোমার সঙ্গ পাচ্ছি, তোমার সেবা করবার সুযোগ পাচ্ছি, এও কোনদিন আমার প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না।

বাধা দিয়ে প্রণব বলল, আবার সেইসব কথা!

—না। এই চুপ করলাম। আর বলব না। শুধু তোমার যাওয়াটা সহজ করে দিচ্ছিলাম।

—আর তোমায় সহজ করতে হবে না।

—না, আর করব না। কিন্তু তুমি যেও। নইলে আমি খুব লজ্জা পাব।

প্রণব বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, লজ্জা পাবে কেন?

—পাব। সে তুমি বুঝবে না।

বলে সুচরিতা বোধ করি রান্নাঘরটা তদারক করবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

সোমবার সকালে সুচরিতা আর একবার প্রণবের খবর নিতে এল। পায়ের ব্যথা অনেকখানি সেরে গেছে। নেই বললেই হয়। পুরী যাবার উৎসাহে তাকে অনেকখানি উজ্জ্বলও দেখাচ্ছে দেখে সুচরিতা কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

ওকে দেখেই প্রণব উৎসাহের সঙ্গে বললে, এস, এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম। দেখ তো, সব জিনিস নেওয়া হল কিনা?

—তোমার গোছান সব হয়নি এখনও?

—হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে। এখন তুমি একবার দেখে পাস করে দিলেই হয়।

ঝগড়ু বাঁধা-ছাঁদা করছিল।

তার দিকে চেয়ে সুচরিতা বললে, টেনিস র‍্যাকেটটা খুলে রাখ। ওটা যাবে না।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রণব বললে, ওটা নিয়ে যেতে দেবে না? বৌমা খুব ভালো টেনিস খেলেন। ইচ্ছা ছিল

—ইচ্ছা এখন থাক। ওই খোঁড়া পায়ে এখন কিছুদিন খেলা হবে না। মশারিটা নিয়েছিস তো, ঝগড়ু?

—ওই যাঃ!

ঝগড়ু জিভ কেটে উপরে ছুটছিল, তাকে থামিয়ে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, মালিশের ওষুধগুলো নিয়েছিস তো?

ঝগড়ু বললে, সেগুলো নিয়েছি, মাসিমা।

—আচ্ছা, তাহলে মশারিটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। দাঁড়া, আমিও যাচ্ছি। ওপরের ঘরটা দেখলে বোঝা যাবে, কী নিয়েছিস আর কী নিসনি।

উপরের ঘরের চারিদিকে সুচরিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলে। না,

আর কিছু ঝগড়ুর ভুল হয়েছে বলে মনে হল না।

সুচরিতা নেমে আসছে, এমন সময় ঝগড়ু বললে, সাহেব তো যাচ্ছেন মাসিমা, কিন্তু কাল রাত্তিরে ওঁর একটু জ্বর হয়েছিল।

ভয়ে সুচরিতার মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, সেকি রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে জানাতে বার বার করে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হল, আপনাকে জানানো দরকার।

প্রণবের অসুখের খবর এত লোক থাকতে কেন সুচরিতাকে জানানো ঝগড়ু দরকার মনে করেছে, এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অন্য সময় হলে হয়তো সুচরিতার দৃষ্টি এড়াত না। একটু হয়তো সে লজ্জাও পেত; কিন্তু অসুখের খবরে সে-অবসর পেলে না।

উদ্বিগ্ন মুখে বললে, কই আমি তো টের পেলাম না।

ঝগড়ু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, একটু জ্বর এখনও আছে বোধ হয়। কিন্তু আমার নাম করবেন না যেন। সাহেব ভীষণ রেগে যাবেন তাহলে।

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোকে করতে হবে না।

নিচে এসে একথা-সেকথার পর হঠাৎ সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মুখটা শুকনো লাগছে কেন? শরীর ভালো আছে তো?

—খুব ভালো আছে।

—তুমি তো ভালো বলেই খালাস!

বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে প্রণবের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করে সুচরিতা চিন্তিতভাবে বললে, হুঁ। গা'টা একটু গরমই বোধ হচ্ছে যেন। ওরে ঝগড়ু, থারমোমিটারটা একবার দে তো, বাবা!

প্রণব বহুতর আপত্তি করলে। সুচরিতা সাড়া দিলে না। শুধু ঝগড়ুর থারমোমিটারটা এনে দিলে উত্তাপটা নিলে। দেখা গেল, জ্বর একটু আছে। নিরানব্বুই-এর কাছাকাছি।

প্রণব চিৎকার করে বললে, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। দুপুর নাগাদ ওটুকু আর থাকবে না। তারপরে পুরীর মতো জায়গা!

সুচরিতা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে রইল। প্রণব চিৎকার করে বোঝাতে লাগল, নিরানব্বুইটা আসলে জ্বরই নয়। ওটুকু উত্তাপ নানা কারণেই ওঠে। হয়তো একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, নয়তো

কিন্তু সুচরিতার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল : বিমলকে দেখবার জন্যে প্রণব যেরকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাতে টিকিট কেনার

পর, আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন যাওয়া বন্ধ করলে প্রণব তো একটা ধাক্কা পাবেই, বিমানই বা কি মনে করবে কে জানে! আবার চট্টগ্রামে প্রণবের অসুখ নিয়ে যা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে তাকে একলা ছেড়েই বা দেওয়া যায় কি করে! জ্বরটা যদি বাড়েই!

কোনো দিকেই সুচরিতা কোনো কূলকিনারা পেলে না।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সরকার-মশাইকে একটা খবর দে তো, ঝগড়ু। বল এখনি বুকিং-অফিস থেকে পুরীর আর একখানা টিকিট কিনে আনতে। বার্থ পাওয়া যায় ভালোই, না যায় যে কোনো ক্লাসের একখানা হলেই চলবে। যা তো, বাবা!

প্রণব অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু সুচরিতা যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না।

একটু পরে সরকারকে খবর দিয়ে ঝগড়ু ফিরে আসতেই সুচরিতা উঠে দাঁড়াল। বললে, আয় তুই আমার সঙ্গে একবার আয় তো। বেশি কিছু আনতে হবে না, শুধু একটা সুটকেস আর বিছানা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রণব যেন লাফিয়ে উঠল। বললে, তুমি যাবে?

চলে যেতে-যেতে সুচরিতা বললে, না গিয়ে উপায় কি? তুমি তো সহজ লোক নও। আমার মুখ না হাসিয়ে ছাড়বে কেন? আয় ঝগড়ু!

এ খোঁচা প্রণব যেন গায়েই মাখলে না। বললে, ভাগ্যিস একটু জ্বরের মতো হয়েছিল!

এমন করে বললে যে, ঝগড়ুটা পর্যন্ত হাসি চাপবার জন্যে পালাল।

স্টেশনে প্রণবদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ওরা দল-কে-দল সবাই এসেছিল,—বিমান ও এলেন এবং বনবিলাস ও মাধুরী।

প্রণব ট্রেন থেকে নামল। তার মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। লজ্জা অথবা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। ওরা অবাক্ হয়ে গেল। এমন কি, একটু যেন দমেই গেল বলতে পারা যায়। কিন্তু উত্তেজনা এবং আশা সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল না। প্রণবকে সঙ্গে করে ওরা মোটরে নিয়ে গিয়ে উঠল। চাকরটাকে বলে গেল, মালপত্র নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে আসতে।

সুচরিতা একা মূঢ়ের মতো প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমান তাকে চেনে, মাধুরীও। উভয়েই তাকে তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করত। মাসিমা বলে ডাকত। কিন্তু আজ আর চিনতে পারলে না! যেন না দেখেই ওকে এমনিভাবে একা প্লাটফর্মে ফেলে রেখে শুধু বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে চলে গেল।

যাত্রীর দল যে যার গন্তব্য স্থানে চলে গেল।

প্লাটফর্ম প্রায় জনশূন্য হয়ে এল।

শুধু বিমানের চাকর আর আর্দালি মালপত্র ঘোড়ার গাড়িতে তোলবার জন্যে টানাটানি করতে লাগল।

কিন্তু সুচরিতা সেদিকে চেয়েও দেখলে না। অকস্মাৎ সে যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

—মা!

ঝগড়ু তাকে মা বলে না, মাসিমা বলে। শুধু একবার চট্টগ্রামে নিতান্ত বিপাকে পড়েই মা বলে ডেকেছিল। আবার আজ তাকে মা বলেই ডাকলে। তার সুরে জেদের জবরদস্তি।

—মা!

সুচরিতা বিহ্বলের মতো চাইলে।

ঝগড়ু বললে, পুরী আমার চেনা জায়গা, মা। অনুমতি করেন তো আমরা দুজনে একটা হোটেলে গিয়ে উঠি।

স্টেশনের প্লাটফর্মে আলো জ্বলছে। কিন্তু সুচরিতার মনে হচ্ছে, আলো যেন জ্যোতিহীন, প্লাটফর্ম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সব কিছু যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। ঝগড়ুর কথাগুলো পর্যন্ত। সবটা ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

বোঝা যদি যেত,—সুচরিতার কিছু বোধশক্তি যদি থাকত,—তাহলে এই প্রস্তাবে সে দস্তুরমতো চমকে উঠত। ঝগড়ু তার অসুস্থ সাহেবকে ছেড়ে সুচরিতার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে উঠবে! কিন্তু বোধশক্তি তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

অন্যমনস্কভাবে সে শুধু প্রতিধ্বনি করলে : হোটেলে!

ওদের পিছনে, অনতিদূরে, একটি শ্বেতবসনা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা খেয়াল করেনি। হোটেলের নাম শুনে সে সামনে এসে দাঁড়াইতেই ঝগড়ুর চিনতে বিলম্ব হল না। সে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে।

নারীমূর্তি [illegible] সামনে দাঁড়িয়ে নম্রকণ্ঠে ইংরেজিতে বললে,

আমি মিসেস মুখার্জি। আপনাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। আসুন আপনি।

ওর কণ্ঠস্বরে সুচরিতা যেন সমবেদনার আভাস পেল। কে জানে ঠিক চিনতে পারলে কিনা। ওর প্রসারিত ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলে। কিংবা হয়তো কিছুই ভাবলে না। প্রথম আঘাতের আকস্মিকতায় এবং রূঢ়তায় ভাববার শক্তিই তার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এলেন ওর অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করতে ধীরে ধীরে যেন সুচরিতার সম্বিৎ ফিরে এল।

কিছু বুঝে, কিছু না বুঝেই অস্ফুট স্বরে বললে, আমায় যেতে বলছ? চল।

বাইরে একখানা সাইক্‌ল্‌-রিক্সা দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা দুজনে তাইতে গিয়ে উঠল।

এতক্ষণে যেন ঝগড়ুর মুখ প্রসন্ন হল। সেও ওদের পিছনে পিছনে এসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

সেই রাত্রে প্রণবের জ্বর খুব বাড়ল।

ওকে বাড়ি নিয়ে এসে বিমান এবং মাধুরী আদরে-যত্নে, হাসিতে-গল্পে যেন অভিভূত করে ফেললে। কিন্তু শরীরটা তার ট্রেন থেকেই খারাপ। সুতরাং হাসি-গল্প তার বেশিক্ষণ সহ্য করবার শক্তি ছিল না। শুধু একটু বার্লি খেয়ে একটু পরেই সে শুয়ে পড়ল।

সুচরিতাদের রিক্সা সেই সময় গেটে ঢুকল। এলেনের আকর্ষণে ভূতাবিষ্টের মতো সে এসে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল।

তারপরে বাড়তে লাগল প্রণবের জ্বর, অনেক রাত্রে। সুতরাং বিমানরা তা টেরই পেলে না।

পরদিন সকালে বিমান ও তার স্ত্রী, মাধুরী ও তার স্বামী সমুদ্রের দিকের বারান্দায় একটা গোলটেবিলের চারদিকে বসে প্রণবের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

এমন সময় সুচরিতা এল, সদ্যস্নাতা।

মাধুরী এবং বিমানের সঙ্গে ওর যথেষ্ট পরিচয় আগে থেকেই ছিল।

এলেনের সঙ্গে স্টেশন থেকে আসবার পথে সামান্য কিছু আলাপ হয়েছিল। শুধু বনবিলাসের সঙ্গে পরিচয় নেই।

প্রণব একদিন সুচরিতাকে বলেছিল, তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন মহাশ্বেতা। আজ সকালে তার মুখের শান্ত গাম্ভীর্যে, অতি সাধারণ বেশে এবং উন্মুক্ত কেশভারে যেন সেই তপস্বিনীই আত্মপ্রকাশ করেছে। ওরা সকলে, বিশেষ করে বনবিলাস এবং এলেন, স্তব্ধ হয়ে সেই অপূর্ব রূপের দিকে চেয়ে রইল।

এলেন এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে তাকে নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসালে।

বিবাহের ব্যাপার নিয়ে প্রথম সুযোগেই যে তার উপর আক্রমণ আরম্ভ হবে, এ কথা সুচরিতা গোড়া থেকেই অনুমান করেছিল এবং সেজন্যে সতর্ক হয়েই চায়ের টেবিলে যোগ দিয়েছে। আক্রমণটা যে সর্বাত্মক হবে, এ বিষয়েও তার অণুমাত্র সংশয় ছিল না।

মাধুরী তার বিশেষ চেনা এবং অসীম স্নেহের পাত্রী। সুতরাং তার উপর সুচরিতার কিছু ভরসা ছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে, প্রথম আক্রমণটা অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দিক থেকেই শুরু হল।

মাধুরী অত্যন্ত নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করল, এই বয়সে বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, আপনারা কিছু শুনেছেন, মাসিমা?

কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে ধুমধামের আক্রমণ নয়। যেন হাঙরের কামড়—দাঁত বসেছে, কিন্তু বেদনা নেই।

সকলের আগে মাধুরীকে আক্রমণ করতে দেখে সুচরিতা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বললে, কিছু কিছু শুনেছি বইকি, মা।

—এ কি ঠিক হচ্ছে? আপনাদের মতো যাঁরা আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁদের কি এ বিষয়ে বাধা দেওয়া উচিত নয়?

ভাবটা এইরকম যেন প্রণবের বিয়ের খবরটাই তারা জানে। কিন্তু কার সঙ্গে তা জানে না।

সুচরিতা তেমনি সহাস্যে জবাব দিলে, আমার পক্ষে যতখানি বাধা দেওয়া সম্ভব, তার ত্রুটি হচ্ছে না, মাধু। কিন্তু উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন যদি তোল, তাহলে বলব, সে-কথা তোমরা তুলতে পার, আমি পারি না।

সুচরিতার উত্তর দেবার ভঙ্গিতে শুধু মাধুরী নয়, সকলেই স্তম্ভিত

হয়ে গেল। এবং বনবিলাস ও এলেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে ঝগড়ু এসে সাহেবের জ্বরের সংবাদ দিতেই সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল: জ্বর? খুব বেশি জ্বর? কখন থেকে হয়েছে?

উদ্বেগে ওরা উঠে দাঁড়াল।

শান্ত কণ্ঠে সুচরিতা ঝগড়ুকে বলল, সাহেবকে বোলো এঁরা চা খেয়েই যাচ্ছেন।

ঝগড়ু সেলাম করে চলে গেল। তার ব্যবহারে যেন অতিরিক্ত সম্ভ্রম। সেও কি সুচরিতার সাহায্যে যুদ্ধে নেমেছে?

ওরা আশ্বস্তভাবে বসল। এবং অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা আপাতত এইখানেই বন্ধ রইল। সকলের মন তখন প্রণবের অসুখের দিকে। নীরবে চা খেয়ে ওরা ব্যস্তভাবে প্রণবের ঘরের দিকে ছুটল।

কেবল সুচরিতা একপ্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়তে লাগল। কেন যে সে ওদের সঙ্গে গেল না, ওই জানে। ওরাও কেউ তাকে ডাকবার প্রয়োজন বোধ করলে না।

জ্বর নিতান্ত কম নয়। একশোর একটু বেশি। অর্থাৎ ঠিক সেই জ্বর, যে জ্বরে প্রণবের গীত-বাদ্য-অভিনয়ের প্রেরণা জাগে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রণবও যেন কি রকম ভড়কে গেছে! নিঃশব্দে শান্তভাবে প'ড়ে আছে। গান-অভিনয় সমস্ত বন্ধ!

বিমান ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে কতকগুলি জরুরী কাজ সেরে নেবার জন্যে তার অফিস-ঘরে এসে বসল। মাধুরী এবং বনবিলাস বেরিয়ে গেল সমুদ্রস্নানে।

এলেন তার সাংসারিক কাজগুলো একবার তদারক করে ধীরে ধীরে এসে সুচরিতার কাছে বসল।

বললে, জ্বর একশোর ওপর।

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই সুচরিতা বললে, রাত্রে দুই পর্যন্ত উঠেছিল।

এলেন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি রাত্রে টেম্পারেচার নিয়েছিলেন?

কথাটা বলেই সুচরিতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেটা কাটিয়ে শান্তভাবে বললে, ওখান থেকে অল্প জ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলেন তো। সমস্ত রাস্তায় সেটুকু ছাড়েনি। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, ট্রেনের ধকলে রাত্রে জ্বরটা বাড়তেও পারে। তাই একবার টেমপারেচার নিয়েছিলাম।

সুচরিতা আপন-মনে খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

এলেন সবিনয়ে বললে, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব?

সুচরিতা হেসে বললে, না করলেই চলবে না?

—একটি কথা শুধু।—মিনতির সুরে এলেন বললে,—আপনি এখানে এলেন কেন?

শান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে সুচরিতা ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর বললে, বুঝতে পারছ না? ওঁর জ্বর। না এসে আমার উপায় ছিল? একে ভাঙা পা, তার ওপর জ্বর। শুধু ঝগড়ুর ভরসায় ছেড়ে দিতে সাহস হল না।

সুচরিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, এখানে আমার অসম্মানের যে কোনো ত্রুটি হবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু সেই অসম্মান এড়াবারও কোনো ছিদ্র ছিল না। আমি বুঝতে পারছি, তুমি অসহায়। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস কোরো, বিয়ের প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ওঁকে নিরস্ত করতে পারিনি।

ধীরে ধীরে এলেন বললে, আমি বুঝতে পারছি।

কিন্তু সে-কথা বোধ করি সুচরিতার কানেই গেল না। হাতের খবরের কাগজগুলো মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিতভাবে সে বলতে লাগল,—বাধা দেবার কথাই তো! যাকে বিয়ের বয়স বলে, আমাদের দুজনেরই তা বহুদিন পার হয়ে গেছে। ছেলে-পুলে, ঘর-সংসারের উচ্চাশাও আর নেই। তবে আবার বিয়ে কেন? কিন্তু উনি কিছুতেই তা শুনবেন না।

এলেন নিঃশব্দে সাগ্রহে শুনে যেতে লাগল।

সুচরিতা নিঃশব্দে বলে যাচ্ছে : কেন শুনবেন না, তোমরা বুঝবে না। উনিও বোঝাতে পারবেন না। বোঝবার যদি ইচ্ছা থাকে ওঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে তোমাদেরই বুঝে নিতে হবে।

—আমাকে কিছুই বলতে হবে না, মা।—এলেন তাড়াতাড়ি সুচরিতার একখানি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললে,—আপনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সবাই কি তা বুঝবে?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সুচরিতা বললে, তাও জানি। বুঝবে না।

সুতরাং তাদের নিন্দা-উপহাস-ক্রোধ আমাদের সইতেই হবে। এ যদি না পারি তবে কিসের ভালোবাসা? কিন্তু চল, ডাক্তার এলেন মনে হচ্ছে।

ওরা উঠল।

সাত দিন সাত রাত্রি জ্বর ভোগের পর সবে কাল ভোরে প্রণবের জ্বরটা ছেড়েছে। সুচরিতা চায়ের টেবিলে আসেনি। তার চা প্রণবের শোবার ঘরে গেছে।

চায়ের টেবিলে মাধুরী বললে, কাল আমরা যাচ্ছি, দাদা।

—কাল? সেকি হয়! বাবা আর একটু সেরে উঠুন।—বাধা দিয়ে বিমান বললে।

বনবিলাস বললে, আর ভয়ের তো কিছু নেই। আমার ছুটিও এদিকে ফুরিয়ে এল।

চাকুরি-জীবনে ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার ওপরে আর কথা চলে না।

এলেন বললে, আবার কবে আসছ বল। এবারে কোনো যত্নই তোমাদের হল না।

—তার দরকার ছিল না, বৌদি।—বনবিলাস বললে,—কিন্তু ভেবে দেখুন তো, উনি না থাকলে আমাদের কি অবস্থা হত!

ক'দিন থেকে 'উনি' বলতে সবাই সুচরিতাকেই বুঝছে।

এলেন বললে, এরকম শুশ্রূষা আমি চোখে কখনও দেখিনি। সাত দিন, সাত রাত্রি ওই এক চেয়ারে উনি ঠায় বসে!

বনবিলাস উচ্ছ্বসিতভাবে বললে, সেই কথাই বলছি, বৌদি। পুরীর সমুদ্র আর ওঁর এই সেবা সব সময় আমার মনে জেগে থাকবে।

একটুখানি টোস্ট দাঁত দিয়ে কামড়ে নিয়ে মাধুরী বললে, ওঁর সবই ভালো, কেবল ওই বেহায়াপনাটা ছাড়া। গিয়ে দেখি, আঁচলে করে বাপির মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন! আমাকে দেখে একটু লজ্জাও পেলেন না! এ-বয়সে অতখানি ভালো নয়। যে বয়সের যা!

মাধুরীর মনটা এখনও প্রসন্ন হতে পারেনি।

বনবিলাস হেসে বললে, চাঁদে কলঙ্কের মতো ওটুকু থাক না, মাধুরী।

হাতের চামচটা প্লেটে ঘষতে ঘষতে মাধুরী বললে, বেশ, তা যেন রইল। কিন্তু সত্যি বল তো, এ-বয়সে বিয়ে করার কোনো মানে হয়?

—হয়তো হয়।—উত্তর দিলে এলেন,—অন্তত ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে

আমি তো মানে পেয়ে গেছি। দুজনেরই যৌবন নেই, দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তবু একজনকে নইলে আর-একজনের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে, এ যে কতবড় কথা ভেবে দেখেছ, মাধুরী?

ব্যঙ্গভরে মাধুরী বললে, ও! তুমি বুঝি তাহলে এ বিয়ের পক্ষে?

এলেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বললে, আমি পক্ষেই থাকি, আর বিপক্ষেই থাকি, তাতে কিছুই যায় আসে না, মাধুরী। তুমি কি এখনও বোঝনি, এ বিয়েতে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই?

মাধুরীও রেগে বললে, বুঝেছি। কিন্তু যাবার আগে আমরাও এইটে ও'দের জানিয়ে দিয়ে যাব যে, এই অন্যায়ে আমাদের সম্মতি নেই।

—অন্যায়!—এলেন যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল,—ন্যায়-অন্যায়ের শেষ কথা তোমার জানা হয়ে গেছে?

মাধুরীর হাত ধরে হঠাৎ এলেন হিড়হিড় করে ওকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। প্রণবের ঘরের বাইরে পরদার আড়ালে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে এলেন পরদাটা একটু সরিয়ে দিলে।

ফিসফিস করে বললে, একে তুমি অন্যায় বল, মাধুরী?

মাধুরী উঁকি দিয়ে দেখলেঃ

প্রণবের খাটের পাশে একখানা ইজিচেয়ারে শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে সুচরিতা অঘোরে ঘুমুচ্ছে! তার মাথার কাঁচা-পাকা চুল বিশৃঙ্খল। চোখের কোলে কালি পড়েছে। শ্রান্ত শুষ্ক মুখ। শীর্ণ দেহ ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়েছে। শুধু শুষ্ক দুটি ঠোঁটের ফাঁকে গভীর প্রশান্তি।

টিপয়ের উপর গরম চা কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সেই মুখের দিকে চেয়ে মাধুরীও থমকে দাঁড়িয়ে রইল।